প্রেয়সী সমাচার

উমা রায়কে

প্রেয়সী সমাচার

বেদুইন

পরিবেশক
নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রেয়সী সমাচার

এক

মন্দাকিনী বলত, পেটে ভাত পড়লেই তুমি শয্যাশ্রয়ী।

হেসে বলতাম, ঠিকই বলেছ, তবে যাদের কাজকর্ম থাকে না অর্থাৎ অর্থশাস্ত্র অনুসারে যারা বেকার তাদের শয্যায় আশ্রয় নেওয়া ভিন্ন অন্য কোন বিলাস তো থাকতে পারে না। আমার পক্ষেও এর ব্যতিক্রম তো হতে পারে না।

মন্দাকিনী বলত, যত সব সৃষ্টিছাড়া কথা।

বলতাম, সৃষ্টিকে বাদ দিয়েই তো আমি। সেই সকালবেলা থেকে তোমার কাংসকণ্ঠ তার সঙ্গে বেকার জীবনের অভিশাপ সম্পর্কে মন্তব্য আমাকে ধীরে ধীরে সৃষ্টিছাড়া করেছে। রসালাপ করব এমন সাহসও আমার নেই, তা হলেই তোমার চোপা, "ওসব ভালবাসি না" অর্থাৎ সামান্যতেই অতি সিরিয়াস। বাধ্য হয়েই দিবা-নিদ্রাকে আশ্রয় করেই এতকাল বেঁচে আছি কেবলমাত্র তোমার মাথার সিঁদুরটাকে রক্ষা করতে।

মন্দাকিনী কুপিতভাবে জবাব দিত, যত সব অনাসৃষ্টির কথা। ভাল লাগে না বাপু।

অর্থাৎ দিবানিদ্রাটা আমার মেদমজ্জায় শক্ত শেকড় বসিয়েছে বহুকাল যাবৎ। একমাত্র গার্জেন ভার্যা মন্দাকিনী দেবীর বহু চেষ্টাতেও আমি নিবৃত্ত হইনি। ভবিষ্যতের কথা বলতে পারি না। মানুষ নাকি অভ্যাসের দাস, আমিও।

তবে মাঝে মাঝে নিদ্রার ব্যাঘাত না ঘটে এমন নয়। বিশেষ করে দুটি মহিলা আমার এই বিলাসের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় মাঝে মাঝে। একজনের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছি কিছুকাল আগে। তার পরীক্ষা শেষ হয়েছে, পরীক্ষায় পাস করেছে তাই বিনামূল্যে বিদ্যাদানের কঠিন দায়িত্ব থেকে বর্তমানে মুক্ত হলেও অপরজনের হাত থেকে বাঁচিনি। সে আমার অতি স্নেহভাজন। তাই রাগ করতে পারি না। মনে যাই থাকুক বাইরে মনের ভাব কখনও প্রকাশ করিনে।

সেদিন কিন্তু ঘুমোইনি। তবে ঘুম ঘুম ভাব। খেয়ে উঠেই বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছি, তবে চোখ দুটো বুজেই শুয়েছিলাম। শ্রাবণের উষ্ণতা আর আর্দ্রতা কেমন একটা আলস্যের আবেশ সৃষ্টি করেছিল। সেই আবেশ আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে চেপে ধরেছিল। লোকে বলে তালপাকা গরম। শ্রাবণের শেষ আর ভাদ্রের মাঝামাঝি তালপাকা গরমে আমার মতো বেকারদের সবকিছুই তালগোল পাকিয়ে দেয়।

এমন আবহাওয়াতে চোখ বুজে প্রকৃতির সৌন্দর্য অনুভব না করে পারা যায় না। আমি তো ব্যতিক্রম নই। বেশ তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব। বিদ্যুৎ ঘাটতির খেসারত দিতে দিতে শুয়ে শুয়ে অনুভব করছি ঘর্মাক্ত দেহটা কতটা হালকা হতে আরম্ভ করছে।

শরৎকালে ভাঙা ভাঙা মেঘ দেখেছি শোবার আগে। আশা ছিল দুপুর না কাটতেই কালো মেঘে ঢাকবে আকাশটা। জোয়ারী বাতাসে মেঘ ঘন হবে। নামবে কালকের মত এক পশলা বৃষ্টি। সকাল বেলায় এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে তারপরই রোদ। দুপুরে দখিনের মিঠে বাতাস আশা করছিলাম গবাক্ষপথ দিয়ে। নাঃ, আবহাওয়া বড়ই নির্মম।

না পড়ল বৃষ্টি না ঘুরলো পাখা। দখিনা বাতাস তখন কল্পনা।

উত্তর ভারতের লু-এর মত মাঝে মাঝে তালপাকা গরম বাতাস জানলা দিয়ে ঢুকে বেরসিকের মত আমার মৌজটা নষ্ট করছিল। এহেন একটা কষ্টদায়ক দুপুরে কারও মৃদু কণ্ঠস্বর কানে এসে রিণরিণে বীণার ধ্বনি যদি শোনায় তা কিন্তু মোটেই অপ্রীতিকর মনে হয় না। অবশ্য এটা নির্ভর করে উভয়পক্ষের বয়সের মিটারে। যে বয়সে নারীর এই রিণরিণে কণ্ঠস্বর রোমাঞ্চ সৃষ্টি করে সে বয়স প্রায় পেরিয়ে এসেছি। বর্তমান বয়সে নিদ্রাসুখই বেশী প্রীতিকর, রিণরিণে মিঠে কণ্ঠস্বর নিদ্রাসুখে বিঘ্ন ঘটালে বরঞ্চ বিরক্তিই সৃষ্টি করে।

বোধহয় এই দার্শনিক তত্ত্বে বিশ্বাস করি সেই কারণে দ্বিপ্রহরে নিদ্রাদেবীর আরাধনায় ব্যাঘাত ঘটলে জেগে-ঘুমাতে হয়। আহ্বায়ক কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে নিষ্ক্রান্ত হলে বেশ জম্পেশ করে ঘুমোবার চেষ্টা করে থাকি। এটাও আমার অভ্যাস।

ঠিক সেদিন এমনই একটা আবহাওয়াতে যে বাক্যসুধা আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করল তা যেন ছিল অনিবার্য। প্রশ্ন শুনলাম, দাদাবাবু কি ঘুমিয়েছেন?

এই প্রচণ্ড নিদাঘের দ্বিপ্রহরে দিবানিদ্রার ব্যাঘাত ঘটার আশংকা দেখা দিলে কার না রাগ হয়! রাগ করে লাভ নেই। আগন্তুক অতি পরিচিত জন, আমার স্নেহের পাত্রী তথা নাছোড়বান্দা মহিলা। একে এড়িয়ে থাকার উপায় নেই। ঘুমের ভান করে শুয়ে থাকলেও নিষ্কৃতি নেই। কয়েক ঘণ্টা সে বসে থাকবে শিয়রে। পরীক্ষা দেবে ধৈর্যের আর আমি জাগা-ঘুমে ঘর্মাক্ত হব। তার চেয়ে জাগা-ঘুম পরিত্যাগ করে আগন্তুককে সাদর অভ্যর্থনা জানানোই মঙ্গলের ও নিরাপদের। আগন্তুক বেপরোয়া ও নাছোড়বান্দা। শেষ অবধি জাগা-ঘুম ভাঙাতে ধাক্কাধাক্কি করবে। নিরাশ হয়ে সে ফিরবে না। অগত্যা আড়মোড়া ভেঙে বারকয়েক হাই তুলে তার দিকে তাকিয়ে বললাম, কে? প্রেয়? তা কতক্ষণ এসেছ? খবর ভাল তো?

প্রেয়সী হেসে বলল, এতগুলো প্রশ্ন! বাবা! আপনার ঘুম! আচ্ছা বটে! কুম্ভকর্ণকেও জাগানো যায় কিন্তু দাদাবাবু আপনি তাকেও হার মানান।

চোখ ডলতে ডলতে তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বললাম, এইতো এক ডাকেই সাড়া দিলাম। অন্যায় অভিযোগ করে লজ্জা দিচ্ছ কেন!

এক ডাকে? তা বলতে পারেন। তবে ডাকে নয়, ভয়ে। জানেন তো প্রেয় কিছুতেই ফিরে যাবে না। ঘুম ভাঙাবে, সব কথা শোনাবে ও শুনবে তারপর ফিরবে। তাই এক ডাকে সাড়া মিলেছে। দিদি বলল যাসনে প্রেয়। তুই ঘুম ভাঙাবি তার গজবটা শুনব আমি। তোর সামনে হয়ত কিছু বলবে না কিন্তু! তার চেয়ে বিকেলে আসিস। বললাম, বিকেলে সময় পাব না দিদি। দাদাবাবুকে খুবই দরকার। দেরি করলে সবই ভেস্তে যাবে।

আমি উঠে বসে বিছানায় জায়গা করে দিয়ে বললাম, বস, বস। খুব দরকার না হলে এত চড়া রোদে কি কেউ বের হয়। মাথা নিশ্চয়ই গরম করে এসেছ। এবার ভাল হয়ে বসে মাথা ও দেহ দুটোই ঠাণ্ডা কর। এবার বল তোমার এমন কি জরুরী দরকার আছে।

প্রেয়সী মৃদু হেসে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। খোলা জানলার দিকে তাকিয়ে বলল, দরকার আছে। আমি এই রোদে কি সাধে বাইরে বেরিয়েছি! প্রেসার মাপতে গিয়েছিলাম অজিত ডাক্তারের কাছে। ফেরবার সময় আপনার কাছে এলাম।

মনে মনে বললাম, এসে স্বর্গে তুললে।

বললাম, এখন প্রেসার কত?

নীচেরটা একশ দশ, বলেই প্রেয়সী উদাসভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। কেমন একটা অব্যক্ত বেদনা তার চাহনিতে।

আমি বিস্মিত অথচ ভীতভাবে বললাম, সর্বনাশ! লক্ষণ তো ভাল নয়। এই অবস্থায় তুমি বাইরে কেন বেরিয়েছ। এখানেই শুয়ে পড়। বিশ্রাম নাও। এখন আর বেরুতে হবে না। বলেই আমি বিছানা ছেড়ে মেঝেতে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

আবার বললাম, এই অবস্থায় রাস্তায় বের হয়েছিলে কোন্ সাহসে। সঙ্গে কাউকে নিতে পারনি? যে-কোন সময় মাথা ঘুরে পড়ে গেলে আর দেখতে হবে না। সোজা তোমাদের স্বর্গে আর আমাদের সরকারী মর্গে তারপর সোজা কেওড়াতলা অথবা নিমতলা! একা কখনও বের হবে না। কাউকে সঙ্গে নিয়ে বের হবে। তোমার আক্কেল বলিহারি।

আমি বিছানা ছেড়ে দিলেও প্রেয়সী শোবার কোন চেষ্টাই না করে মৃদু হেসে

বলল, ডাক্তারবাবুও আপনার মত উপদেশ দিলেন কিন্তু আমার সঙ্গে আসার তো কেউ নেই দাদাবাবু। হয়ত কোনদিন বেঘোরেই মরতে হবে। তবে একেবারে অসাবধানে চলাফেরা করি না। সব সময় ওষুধ আঁচলে বাঁধাই থাকে। শরীরটা খারাপ মনে হলেই একটা বড়ি গলায় ফেলে দি। আজ সকালে একটা বড়ি খেয়েছি। তবুও তেমন জুতসই মনে হচ্ছে না দেহটা। ডাক্তারখানায় বসে আরেকটা বড়ি খেয়ে তবেই বেরিয়েছি।

এটাও ভাল লক্ষণ নয়। ওভার ডোজ হলে ক্ষতি হতে পারে। ডাক্তারকে না জিজ্ঞেস করে এমন কাজ আর কখনও কোরো না প্রেয়। মানুষের জীবন ছেলে-খেলার বস্তু নয়।

প্রেয়সী তেমনি উদাস ব্যথাতুর চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

বললাম, দেখি তোমার পাল্স্!

প্রেয়সী বাঁ হাতটা এগিয়ে দিল। নাড়ীর অবস্থা ভাল নয় দেখেই বললাম, আর কথা নয়। এবার শুয়ে পড়। আমি তোমাকে বাতাস করছি। আর দুঃখের কথা বোলো না। রোজ দুপুরেই লোডশেডিং, আর বাঁচা যায় না। নাও, যাও শুয়ে পড়। যতক্ষণ না সুস্থ বোধ করছ, ততক্ষণ শুয়ে থাকবে। নড়াচড়া একদম বন্ধ। তোমার দিদিকে ডেকে দিচ্ছি।

প্রেয়সী শুতে শুতে বলল, দিদি বেরিয়ে গেছে। দিদির খুড়তুতো দাদার বাড়ি গেছে। আপনি ব্যস্ত হবেন না। এখুনি সামলে নেব।

তালপাতার পাখা হাতে নিয়ে তার পাশে দাঁড়াতেই প্রেয়সী বলল, না, না। বাতাস দিতে হবে না। এমনিতে সামলে নেব।

তা বটে। মাথার বালিশটা বের করে দাও। মাথাটা যেন নীচু থাকে। কোমরটা উঁচু করে ওই বালিশটা পিঠের নীচে দিয়ে নাও।

প্রেয়সী বলল, আপনি দেখছি পাকা ডাক্তার।

সবাই কি ডাক্তার হয়। ডাক্তার না হয়েও আজকের দিনে কিছু কিছু জেনে রাখতে হয়। নইলে ফার্স্ট এড-এর অভাবেই অনেকে মারা যায়। আর কথা নয়। নো টক্। টান টান হয়ে শুয়ে পড়।

পড়লাম, তবে বাতাস দিতে হবে না।

অগত্যা।

প্রেয়সী হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল, আমি তার মাথার কাছে চেয়ার টেনে নিয়ে চুপচাপ বসে নিরীক্ষণ করতে থাকি তার অবস্থা। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে

থেকে আজকের খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে চোখের সামনে তুলে ধরলাম প্রেয়সীকে আড়াল করে। ভাবছিলাম, এর মধ্যেই যদি গৃহিণী ফিরে আসেন তা হলে প্রেয়সীর চার্জ তাঁকে বুঝিয়ে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়তে পারি। তবে আশা কম। সেই কসবায় গেছেন, ফিরতে সন্ধ্যা উৎরে যাবে।

ঘড়ির কাঁটা ঘুরছে।

প্রেয়সী চোখ বুজে শুয়ে। নিশ্বাস-প্রশ্বাস অনেকটা স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল। মিটিমিটি দেখছিলাম। চুপ করে কতক্ষণ বসে থাকা যায়। বিরক্তি লাগছিল তবুও উঠতে পারছিলাম না। দেখতে দেখতে দুটো ঘণ্টা কেটে গেল।

হঠাৎ মুখ তুলে প্রেয়সী বলল, আমার সেই কথাটা মনে আছে দাদাবাবু!

কোন্ কথাটা প্রেয় ?

আপনাকে অনেক বার অনুরোধ করেছি। আজ আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। এবার ভুলবেন না যেন।

আরেকবার বল, এবার মনে রাখার চেষ্টা করব।

আপনাকে বলেছিলাম, আমাকে নিয়ে একটা উপন্যাস লিখুন। নেহাত একটা বড় গল্প। ঠাট্টা নয়। মরবার আগে আপনার লেখা গল্প বা উপন্যাসটা বুকে চেপে নিয়ে তবেই মরব। হাসির কথা মনে করছেন, তা নয়। আমি হলাম সাক্ষাৎ একটা জীবন্ত উপন্যাস আর আপনি আমার অনুরোধ মোটেই মনে রাখছেন না, লিখছেনও না আমার কাহিনী।

আমি চেয়ারে সোজা হয়ে বসে বললাম, কাজটা বড়ই কঠিন। তাজা মানুষের গল্প লেখা মোটেই সম্ভব নয়। মরা মানুষ নিয়ে ইনিয়েবিনিয়ে গল্প ফাঁদা যায়। তবে কি জান প্রেয়, তোমাদের সেই প্রথম বয়সের প্রেমের প্যানপ্যানানি, চুপিচুপি কথা, চোখের ইশারা, এসব লেখার সময় কোথায়। আর লিখেই বা কি হবে ?

কেন ? আমি পড়ব।

হেসে বললাম, আজকাল গল্পের বাজারে ওসব কাহিনী বড় পানসে। হিন্দী ছবির মত গল্প, নাচ-গান, মারামারি অর্থাৎ ঢিসুম-ঢাসুম বাদ দিয়ে কোন উপন্যাস লেখা বৃথা। বিশেষ করে তোমাদের মানে মেয়েদের অর্ধনগ্ন করে না দেখালে বর্তমান অবক্ষয়িত সমাজে এই ধরনের পানসে গল্প অচল হবে। এসব লেখার লোকও আলাদা, গল্পের প্লটগুলো বোম্বাইতে চালান হয়ে গেছে। হতভাগা বাংলাদেশে খিদে কান্না ভিন্ন আর কোন প্লট তো দেখছি না। আমাদের উপেক্ষিত জীবনে আর কোন গল্পের উপাদান নেই। সেই নিরন্ন ফুটপাতের জমিদার আর লক্ আউটের কারখানা

মজুর নিয়ে গল্প রচনাও মস্ত বেকুবি। বোম্বাইয়া হিন্দী কালচার নিয়ে গল্প বলার মত যদি কিছু শোনাতে পার তা হলে চেষ্টা করে দেখতে পারি। তবে মাঝেমাঝেই বিলেতের আর আমেরিকার টিকিট কেনার কথাও বলতে হবে, নইলে রসভঙ্গ হবে। সবই ভেস্তে যাবে।

আপনি ঠাট্টা করছেন দাদাবাবু!

না প্রেয়। ঠাট্টা নয়। আমরা এখন হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের দাসত্ব করছি। হিন্দী-ওলারা মনে করে তারা হল রুলিং ক্লাস। আর অহিন্দীভাষী অঞ্চল হল তাদের শোষণের কায়েমী জমিদারী। বোম্বাইয়া হিন্দীকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করে ভারতীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টির কবর রচনা করছি মুখ বুজে। প্রভুর ভাষা, প্রভুর কালচারই এখন আমাদের ভাষা ও কালচার। মোঘল যুগে ফার্সী পড়েছি, চোগা চাপকান গায়ে দিয়ে প্রভু সেবা করেছি, ইংরেজ রাজত্বে ইংরেজি শিখেছি। গলায় নেকটাই বেঁধেছি। সবই হয়েছে প্রভুর ইচ্ছায়। বোম্বাইয়ের স্টুডিওর মেশিন থেকে ভাষা ও কালচার রপ্তানী হচ্ছে সমগ্র ভারতে। তা থেকে কি আমরা মুক্ত! আমরা সেই ভাষা ও কালচারের সেবা করছি।

প্রেয়সী বোধহয় আমার কথার জবাব খুঁজে না পেয়ে চুপ করেই শুয়ে ছিল। আমি আবার বললাম, আমাদের এই হতভাগা বাংলাদেশে বোম্বাইয়া ভাষা ও কাল-চারের কোন সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ ও বাস্তবধর্মী জীবনযাত্রার কোন মধুর সম্পর্ক নেই। তাই ভাবছিলাম তোমার কথা, আর কারুর কথা নয়। চিরপুরাতনের প্রতি-ধ্বনি মাত্র। উপরন্তু তোমার সব কথা তো আমি শুনিনি। জানিও না। তোমাকে দেখছি ও জেনেছি একজন লজ্জাবতী গৃহবধূ ও কয়েকটি সন্তানের জননীরূপে। যা সামান্য কিছু তোমার দিদির কাছে শুনেছি তা উপভোগ করা যায়, তা দিয়ে গল্প রচনা করা যায় না। একটা পুরো চিঠিও লেখা যায় না।

আমি আপনাকে সব কথা বলব। আপনাকে কিন্তু মন দিয়ে শুনতে হবে। সংসারের ঝামেলা মিটিয়ে সময় হাতে করে আসব। রোজ হয়ত আসতে পারব না। তবে নিশ্চয়ই আসব।

মাঝে মাঝে শোনালে গল্পের সূত্র হয়ত ছিন্ন হবে। গুছিয়ে নিয়ে লেখা খুবই কঠিন হবে।

তা কেন হবে। আমি ধারাবাহিকভাবেই বলব।

প্রেয়সীকে খুশী করতে বললাম, আচ্ছা। তবে আজ উদ্বোধন করা চলবে না। তোমার শরীর ভাল নেই, আমাকেও বের হতে হবে জরুরী কাজে। ঘরে বসে

শোনার উপায় নেই। লোডশেডিং। গরম কালটা পেরিয়ে শীতকালটা এলে বরং সব শোনা যাবে। তখন তো লোডশেডিং-এর জন্য মাথা ঘামাতে হবে না। সে সময় তুমি বলবে আমি শুনব, আমি বলব তুমি শুনবে।

প্রেয়সী হেসে বলল, আপনার যা কথা বলার ভঙ্গী তাতে না হেসে পারা যায় না। আপনার বলার কি আছে, আর শোনারই বা কি আছে।

বললাম, সময়মত বুঝিয়ে দেব।

প্রেয়সী উঠে বসে হাতপাখা নিয়ে আমাকে বাতাস করতে শুরু করল। তার হাত থেকে পাখাটা কেড়ে নিয়ে বললাম, চল। এবার তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। ওষুধটা নিয়মমত খেও। বেশি ছোটাছুটি কোর না। উনুনের ধারেকাছেও যেও না। বিশ্রাম করলেই সুস্থ হয়ে উঠবে।

কোন উত্তর না দিয়ে প্রেয়সী দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল।

আমিও তাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

দুজন পাশাপাশি চলছিলাম। কারও মুখে কোন কথা নেই। প্রেয়সী কি ভাবছিল তা অনুমানসাপেক্ষ, আমি ভাবছিলাম প্রেয়সীর আকাঙ্ক্ষিত কাহিনী কেমন হতে পারে। অনেক দিন থেকে প্রেয়সী কি যেন বলতে ইচ্ছুক কিন্তু আমার অনাগ্রহ তাকে নিরস্ত করছে, ক্ষুব্ধ করেছে। কেন সে শোনাতে চায় তার ব্যক্তিগত জীবন-কথা তা ভেবেই স্থির করতে পারিনি। অবশ্য আমার অনাগ্রহের সঙ্গে অবসরও ছিল কম। তবুও সে এসেছে, মাঝেমাঝে টুকরো টুকরো ঘটনাও বলেছে কিন্তু সেসব ঘটনার পটভূমি খুবই বেদনাদায়ক মনে করে আমি চুপ করেই থেকেছি, মতামত দিইনি। মন্তব্যও করিনি।

প্রেয়সীর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার কোন সুযোগই পাইনি।

যেসব ঘটনা অথবা অবস্থার কথা আমাকে মাঝেমাঝে বলেছে তা অতি মামুলি ধরনের। সবগুলো সাজিয়ে নিলে ছোট্ট গল্পের উপাদান যে না হয় এমন নয় কিন্তু সেসব উপাদানকে অনুপান দিয়ে পাচ্যবস্তুতে পরিণত করা আমার সাধ্যের বাইরে। পরবর্তীকালে গৃহিণী প্রমুখাৎ অনেক কিছু জানতে পেরেও আমার গল্প লেখার আগ্রহ জাগ্রত হয়নি। তবে মাঝেমাঝে চিন্তা করেছি প্রেয়সীকে খুশী করতে একটা কিছু লিখলে মন্দ হয় না।

গৃহিণী কিন্তু নাছোড়বান্দা। মাঝেমাঝেই প্রেয়সীর সম্বন্ধে নানা কথা বলতেন। আমিও শুনতাম। শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তাম। অসম্পূর্ণ থাকত কাহিনীর চোদ্দ আনা অংশই। গৃহিণী রাগ করতেন, কিন্তু আমি তখনও নিজেকে নিরুপায় মনে

করে গৃহিণীর ক্রোধ হজম করতাম।

তবুও একদিন মনে হল প্রেয়সীর কাহিনী গল্পাকারে লিখেই ফেলব। ভাল হোক মন্দ হোক একটা কিছু দাঁড় করাতে পারলে প্রেয়সী তো খুশী হবে। এই সব ভেবে সত্যি সত্যি একদিন কাগজ কলম নিয়ে বসলাম।

কথায় বলে, মানুষ ভাবে এক, ঈশ্বর করেন আর-এক। আমার বেলাতেও এই আজব ঘটনা ঘটল সেইদিনই। কয়েক ছত্র লেখা শেষ করেছি এমন সময় বাধা পেলাম। গৃহিণীর কাংস্যকণ্ঠের মধুর আহ্বানে কলম অচল হয়ে গেল।

গৃহিণী আদেশ করলেন, ওঠ, চল হাসপাতালে।

বললাম, হাসপাতাল! এত তাড়াতাড়ি! ব্যাপার কি বল তো?

গৃহিণী তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললেন, হ্যাঁ, বিশেষ জরুরী। প্রেয়কে হাসপাতালে ভর্তি করেছে। তাকে দেখতে যাব। এইমাত্র প্রেয়র ছোট মেয়ে খবর দিয়ে গেল। অবস্থা মোটেই ভাল নয়। যতীন বলেছে, যা দিদিকে আর জামাইবাবুকে খবর দিয়ে হাসপাতালে আসতে বল।

যতীন অর্থাৎ প্রেয়সীর স্বামী। গৃহিণী মন্দাকিনী বোধহয় পাড়ার পাইকারী দিদি। সেই সুবাদে আমিও জামাইবাবু। অবশ্য প্রেয়সীকে সূত্র করে তার পরিবারের সঙ্গে আমাদের কমবেশি ঘনিষ্ঠতা বজায় থাকায় যতীন অনুরোধ জানিয়েছে।

এর আগে দেখেছি কোন কিছু জরুরী হলে যতীন নিজেই খবর দিত। আজ বোধহয় খবর দেবার মত অবসর তার ছিল না, তাই ছোট মেয়েটাকে পাঠিয়েছে খবর দিতে।

প্রেয়সী আমার স্ত্রীর কাছে সপ্তাহে কমপক্ষে তিনদিন আসত। গল্প করত। সংসারের সুখদুঃখের কথা বলত। কোন কোন দিন বেশ কিছুটা রাত হত ফিরে যেতে। তাকে পৌঁছে দিতে যেতে হত মাঝেমাঝে। যতদূর আমি জানি তা হল আমার স্ত্রী মন্দাকিনীর অতি স্নেহের পাত্রী ছিল প্রেয়সী। বোধহয় আমার স্ত্রীর মত অনুরাগী শ্রোতা পেয়ে সেও কথার বন্যা বইয়ে দিত। তাদের আলোচ্য বিষয় আমার এক্তিয়ারের বাইরে। অনধিকার প্রবেশ ও অনধিকার চর্চা আমার স্বভাববিরুদ্ধ তবুও আমার ভার্যাদেবী মাঝেমাঝে রাতের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিয়ে প্রেয়সীর পাঁচালি শোনাত। আমি 'হুঁ' দিতে দিতে কপট নিদ্রায় ডুবে যেতাম, কখনও ঘুমিয়েও পড়তাম। সবটা শোনা হত না কোন দিনই। লক্ষ্য করেছি প্রেয়সীর পাঁচালি শোনাতে শোনাতে ভার্যাদেবী আঁচলে চোখের জল মুছছেন।

আমি বলতাম, প্রেয় তোমার অতি প্রিয়জন। তার জন্য চোখের জল ফেললে

তারই অমঙ্গল হবে।

মন্দাকিনী ক্ষোভের সঙ্গে বলতেন, মোটেই নয়। ওর দুঃখে আমি দুঃখী। মেয়েদের কোথায় দুঃখ তা তুমি বুঝবে না। কিন্তু আমিও নাচার। আমার তো চোখের জল ফেলা ভিন্ন আর কিছু করার নেই। আহা-উহু করে তাকে সান্ত্বনা দিই আর চোখের জল ফেলি। প্রেয় নিজেকে হালকা করে তার মনের কোনায় জমে থাকা বেদনা আমাকে বলে। সারা জীবনের শতেক ভুলভ্রান্তি যা ঘটেছে তার তুলনায় একটি ভুল যে কতটা অনাসৃষ্টি এনেছে তার জীবনে সেটাই বার বার বলে গভীর অনুশোচনায়। অনেক সময় মনে হয়েছে প্রেয় নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা বলছে তবে যাচাই করে দেখছি প্রায় সবই সত্য, কিছুটা অতিরঞ্জিত।

গৃহিণীর কথাগুলো আমার মনে বিশেষ দাগ কাটেনি কখনও।

প্রেয়সী আমার বাড়িতে আসত, যাবার সময় আমার সঙ্গে দেখা করে যেত অবশ্য তখন যদি আমি বাড়িতে থাকতাম তা হলে দু মিনিট কথা না বলে বাড়ি ফিরত না। আমার ঘরে এসে চেয়ার টেনে আমার সামনে বসত। নানা অপ্রয়োজনীয় কথা বলে কোন দিন উঠবার সময় বলত, অনেক বেলা হয়ে গেছে। কোনদিন বলত, অনেক রাত হয়ে গেছে, এবার চলি দাদাবাবু। আপনার শালা দেরি দেখলে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

কথা শেষ করে প্রেয়সী হাসত, আমিও হাসতাম।

গৃহিণীকে কোন দিনই কোন কথা গুরুত্ব দিয়ে জিজ্ঞাসা করিনি। প্রেয়সী আমাদের ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে সামান্যতম অংশীদার নয়। সব সময়ই তাকে অতিথি মনে করে এসেছি। তার আগমন ও নির্গমন কোনটাতেই আমার কোন স্বার্থ ছিল না। আমি অনাগ্রহী হলেই বা কি! গৃহিণীর সব কিছু ছিল উল্টো। প্রেয় যেন তার চোখের মণি। এমন কি ভাল-মন্দ কিছু রান্না হলে প্রেয়কে ডেকে পাঠাতো। বলা বাহুল্য বার্তাবাহক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই অভাজন। ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক হুকুম তামিল করতাম বিনা বাক্যব্যয়ে।

প্রেয়সীর বাড়িতে যখনই যেতাম তখনই কেমন একটা ব্যস্ততা লক্ষ্য করতাম। আমি যেন তাদের কাছে কোন বিরাট কিছু। আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক বলতে কিছু ছিল না। এক জাতও নই, এক অঞ্চলের লোকও নই। পাড়াতুতো দিদির স্বামী, পাইকারী হারে আমি হলাম সবার দাদাবাবু। তবে মন্দাকিনীর দৌলতে আমাদের সম্পর্ক ছিল হৃদ্য এবং নিঃস্বার্থ। স্বয়ং দাদাবাবু এসেছেন, এ কি কম ভাগ্যের কথা!

যতীন এগিয়ে এসে বলত, দিদি ভাল আছে তো?

কোন উত্তরের অপেক্ষা না করে প্রশ্ন করত, কি খাবেন বলুন ? না না, কোন ওজর আপত্তি শুনব না। কিছু মুখে না দিলেই নয়। অন্তত চা।

মন্দাকিনীর সূত্রেই যতীন আমার শ্যালক আর প্রেয়সী আমার শ্যালকপত্নী। বোধহয় এটাই তখন ছিল খাঁটি পরিচয় এবং আমাদের কথাবার্তায়, আলাপ-আলোচনায় ও ব্যবহারে কারও বিপরীত কিছু মনে করার সুযোগ ছিল না।

প্রেয়সীর বাড়ি ছিল সব সময় জমজমাট। চার মেয়ে ও তিনটি ছেলে এবং তাদের বন্ধুবান্ধবের আনাগোনায় বাড়িটা শব্দমুখর হয়ে থাকত সব সময়। দুটো মেয়ে বিবাহিতা অথচ পিতৃগৃহ ত্যাগ তাদের বোধহয় রুচিবিরুদ্ধ। অবশ্য এটা যতীনের পারিবারিক বিষয়। এ বিষয়ে আমার আগ্রহ না থাকাই উচিত। ছেলেরাও বিবাহযোগ্য। একজন সবে বিয়ের পিঁড়িতে বসলেও বিয়েটা মোটেই সুখকর বোধহয় হয়নি। তবুও প্রেয়সীর সংসার সুখের সংসার। তারা কিন্তু পাতানো পিসিমা ও পিসেমশায়কে কাছে পেলেই খুবই উৎফুল্ল হয়ে বিশেষ আপ্যায়নের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠত। সবাইকে প্রাণবন্তই মনে হত। সুস্থ সমাজজীবনের দায়িত্বশীল জীব বলেই তাদের ভাবতাম। এ সবই যে কৃত্রিম এবং তাদের আচার-ব্যবহার সবই মেকি এটা বুঝতে আমার অনেক সময় দরকার হয়েছিল। সুগার কোটেড কৃত্রিমতাকে সহজ সরল মনে করেই চলেছি অনেক কাল।

প্রেয়সী নাম কেমন অদ্ভুত মনে হত। পৃথিবীতে লাখো লাখো রুচিসম্মত নাম থাকতে প্রেয়সী নামটা কেমন বেখাপ্পা। রাস্তাঘাটে তার নাম ধরে ডাকতে কেমন বাধো-বাধো ঠেকত। একদিন জিজ্ঞেস করছিলাম, কে তোমার নাম প্রেয়সী রেখে-ছিল ?

প্রেয়সী হেসে বলেছে, আমার বাবা আমার নাম রেখেছিলেন শ্রেয়সী। প্রেয়সী নামটা আপনার শ্যালকের দেওয়া। শ্রেয়সী নামটা তার পছন্দ নয়। বিয়ের রাতে আমার নতুন নাম রেখেছিল প্রেয়সী। আপনার শ্যালক বলেছিল, তুমি আমার প্রেয়সী, প্রেমিকা, প্রিয়া। তোমার নাম বদল করে প্রেয়সী রাখতে চাই। তখন তো বুঝিনি, মাথা নেড়ে সম্মতি দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, নাম বদল হলে মানুষ তো বদল হয় না। তোমার যাতে সুখ তাই কর।

বলতে বলতে প্রেয়সীর হাসিমুখখানায় কালো মেঘের ছায়া দেখে বোকার মত তার দিকে চেয়ে ছিলাম।

প্রেয়সী বলল, কি দেখছেন ? দাদাবাবু, নাম বদলে দিলে মানুষ বদল হয় না কিন্তু নাম বদলালেও মানুষের জীবনধারা বদল হয় না। শ্রেয়সীর মৃত্যু ঘটলেও

প্রেয়সী বেঁচে আছে তবে প্রেয়সী শুকিয়ে গেছে। এখন যা আছে তা একটা মেয়েমানুষ যার দুটি কাজ—সংসার করা আর গর্ভে সন্তান ধারণ করা। এবং অধিক সংখ্যক সন্তানের মা হয়ে তাদের পালন করার দায়িত্ব বহন করতে না পারা।

আমি কোন জবাব খুঁজে না পেয়ে চুপ করে গেলাম।

দুঃখটা যে কোথায় তা আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। তবে শ্রেয়সী আর প্রেয়সী একদেহে বাস করতে পারে কিনা তা ভেবে দেখবেন।

বললাম, শ্রেয়সী থেকে প্রেয়সী। যতীনের রুচি আছে।

ছাই! বলেই প্রেয়সী সেদিন বেরিয়ে গেল।

প্রেয়সীর কথা গৃহিণীকে শুনিয়েছিলাম। গৃহিণী কেমন গম্ভীর হয়ে গেলেন। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, কোন কালেই সে প্রেয়সী হতে পারেনি, প্রেয়সী হবার সুযোগও পায়নি।

বুঝলাম কেন সে ছাই বলে বেরিয়ে গিয়েছিল।

গৃহিণী বললেন, ছাই বলেছে। ঠিকই বলেছে। নাম দিয়ে মানুষের বিচার কখনও হয় না। যার নজর থাকে না তার নাম যদি নজরআলি হয় তাহলেও সে তো নজর ফিরে পায় না। জানতে হবে প্রেয়সীকে। প্রেয়সীকে না জানলে প্রেয়সীর অর্থও বোধগম্য হবে না গো। বানানের তফাতে মনের তফাত বোঝা যায় না।

দিন কাটে, মাস কাটে, বছর কাটে। গতানুগতিক জীবন। উর্মিমালাবিধ্বস্ত তেমন কিছু জীবন নয়। শুধু স্রোত আর স্রোত। বাধাবিঘ্ন পেরিয়ে স্রোত বয়ে চলেছে। আমরাও স্রোতের মুখে নিজেদের ছেড়ে দিয়েছি, ভেসে চলেছি। কোথায় শেষ তা জানি না। প্রেয়সী আসে যায়, গল্প করে, হাসে কাঁদে। কখনও ভাবি, কখনও ভুলে যেতে চেষ্টা করি।

এমন সময় সংবাদ পেলাম। মন্দাকিনী সংবাদদাতা। বললেন, প্রেয়সী হাসপাতালে।

প্রেয়সীর ছোট মেয়ে দৌড়ে এসে খবরটা দিয়েই চলে গেছে।

মন্দাকিনীও শোনামাত্র মানসিক দিক থেকে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আমাকে সংবাদটি জানিয়েছে। সব খবর জানার আগ্রহে এবং প্রেয়সীকে কমপক্ষে চোখের দেখা দেখতে গৃহিণী প্রস্তুত হয়ে নিলেন।

গৃহিণীর তাগাদায় আমি আমার কল্পজগৎ থেকে ধপাস করে বাস্তবের সম্মুখীন হলাম। আমি গাধাবোটের মত গৃহিণীর পিছু পিছু ভাসতে ভাসতে হাসপাতালের দরজায় নোঙর ফেললাম। গেটেই দাঁড়িয়েছিল প্রেয়সীর দ্বিতীয়া কন্যা অনিমা। আমাদের দেখেই চোখ মুছতে মুছতে এগিয়ে এসে বলল, চলুন পিসিমা, মা এমারজেন্সীতে আছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, যেতে বারণ নেই তো ?

না। চলুন।

ইতস্তত করে জিজ্ঞাসা করলাম, হঠাৎ কি হয়েছিল ?

পেসার। দু তিন দিন থেকেই মা পেসারে কষ্ট পাচ্ছিল। আজ দুপুরে কলতলায় পড়ে গেছে। মাকে কত বলেছি, শোনে না। কাপড় কাচতে বসেছিল। কি দরকার ছিল। ঠিকে ঝি আছে। সে-ই তো সব করে দেয়। মায়ের মন ওঠে না অন্যের কাজে। খুঁতখুঁতে স্বভাব। আমরা আর পারি না।

ছোট মেয়ে অসীমা কাছেই ছিল। অনিমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, পড়ে যায়নি পিসেমশাই। শরীরটা খারাপ বোধ করতেই ন'দিদিকে ডেকে বলল, পেসারের ওযুধটা দে তো। ন'দিদি দৌড় মেরে কার্টুনটা এনে দিল। কলতলায় বসে কটা বড়ি খেয়েছিল তা তো জানি না। মনে হয় বেশিই খেয়েছিল। সকাল থেকেই বাবা-মায়ের কথাকাটাকাটিতে মায়ের মেজাজও ভাল ছিল না।

রোজ সকালে প্রেয় ওযুধ খেত না ?

দরকার হলেই খেত। নিয়মমত সকালে কোন দিনই ওযুধ খেত না।

ওখানেই গোলমাল হয়ে গেছে। তারপর ?

কিসের গোলমাল ?

ওযুধটা কাজ করতে দু-তিন ঘণ্টা সময় দরকার। যখন ওযুধ খেয়েছে তখন অবস্থা সামাল দেবার মত ছিল না। দু-তিন ঘণ্টা যে অনেক সময়। ওযুধ কাজ করার আগেই সর্বনাশ হতে পারে। প্রেসারের রুগীদের কোনক্রমেই উত্তেজনার দাসত্ব করাও তো ভয়ঙ্কর ভুল। চল দেখে আসি।

অসীমা চলতে চলতে বলল, মা কিন্তু বুঝতে পেরে কলতলায় জামাকাপড় গুছিয়ে রেখে দোতলায় উঠেছিল। পেছনে ছিল ন'দিদি। সে না থাকলে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে যেত। ভাগ্যি সে ছিল!

অনিমা বলল, অনিলা কোন রকমে টানতে টানতে মাকে বিছানায় শুইয়ে হাঁক-ডাক আরম্ভ করেছিল। সবাই ছুটে এল। ডাক্তার এল। ডাক্তার সাহস পেল না। বলল, অবস্থা কঠিন, হাসপাতালে নিয়ে যাও। তার পরামর্শেই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সেই যে মা চোখ বুজেছে এখনও তেমনি আছে। চোখ বুজে ছটফট করছে আর হাত বাড়িয়ে কি যেন ধরবার চেষ্টা করছে। জ্ঞান নেই পিসে-মশাই। বলতে বলতে অনিমা ফুঁপিয়ে উঠল।

এখন কাঁদার সময় নয় অনিমা, ভগবানকে ডাক। তাঁর কৃপায় নিশ্চয়ই সেরে উঠবে। বিপদে ধৈর্যহারা হতে নেই।

মন্দাকিনী কথাটা শেষ করেই বলল, চল।

আমি সুবোধ বালকের মত তার পেছন পেছন এগিয়ে চললাম। সামনে প্রেয়র আরেক মেয়ে অনিতা। সে বলছিল, আমি সবে খেয়ে উঠেছি এমন সময় বাবুল ছুটতে ছুটতে এসে খবর দেওয়ামাত্র বেরিয়ে পড়লাম। কর্তা অফিসে, ছেলেটাকে ঘরে তালা দিয়ে বন্ধ করে এসেছি। পাশের ঘরে চাবিটা দিয়ে বলে এসেছি, কর্তা এলেই যেন হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়।

অনিমার পেছন পেছন এমারজেন্সীর ভেতরে ঢুকেই দেখতে পেলাম প্রেয়সীকে। করিডরে একটা সরকারী পেটেন্ট গদীর ওপর একটা চাদর পেতে প্রেয়সীকে শোয়ানো হয়েছে। মাথার বালিশটা কোমরের তলায় দেওয়া। প্রেয়সী চোখ বুজে হাত-পা ছুঁড়ছে, কিছু ধরবার জন্য বার বার হাত মুঠো করছে। আবার মুঠো খুলছে। ঘন ঘন মাথাটা একাত্ ওকাত্ করছে। মাথার কাছে উবু হয়ে বসে যতীন। ছেলেমেয়েরা কানের কাছে মুখ দিয়ে মা মা করে ডাকছে। কারও কথা শুনতে পাচ্ছে না। পায়ের কাছে বসে তার সেজ মেয়ে পায়ে পাউডার ঘষছে। দুই ছেলে ছোটাছুটি করছে ডাক্তার ও ওষুধ সংগ্রহ করতে।

কলেজ হাসপাতাল। রুগীর ভীড়। জায়গা পাওয়াও কঠিন ব্যাপার। স্থানাভাব অথচ রুগীর সংখ্যা গণনাতীত, রুগীদের বারান্দায় করিডরে স্থান দেওয়া ভিন্ন দ্বিতীয় পথ নেই। বিকল্প ব্যবস্থা করার জন্য সরকারী ব্যবস্থাও অপ্রতুল। রুগীদের নির্ভর করতেই হয় জুনিয়ার ডাক্তারদের ওপর। শিক্ষক অধ্যাপকদের করুণা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে লভ্য। ওরা বিশেষজ্ঞ সে কারণেই বিশেষ ব্যবস্থার দাবীদার। দাবী পূরণ না হলে ওরা নাকে কাঠি দিয়েও হাঁচে না। এ বিষয়ে অনেকে মৃদু প্রতিবাদ করলেও এই ঐতিহ্য হাসপাতাল সৃষ্টির দিন থেকেই বোধহয় চলে আসছে।

শুধুমাত্র প্রেয়সী নয়, তার মত বহু রুগী মহিলা বিভাগের মেঝেতে শুয়ে

আরোগ্য লাভের আশায় মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। ভাল করে দেখলাম, পিতা-মাতার আদরের শ্রেয়সী আর যতীনের প্রেয়সী প্রিয়া ও প্রেমিকা মেঝেতে শুয়ে ছটফট করছে মৃত্যুর শীতল স্পর্শ পেতে।

প্রেয়সীর অবস্থা মোটেই আশাপ্রদ মনে হল না।

গৃহিণীকে ইসারা করে ডেকে ফিস ফিস করে বললাম, এবার চল।

কথায় বলে যতক্ষন শ্বাস ততক্ষণ আশ। গৃহিণী আশা ছাড়তে পারেননি। প্রেয়সীর কানের কাছে মুখ রেখে বার বার তার নাম ধরে ডাকতে থাকে। নিষ্ফল সেই ডাক। প্রেয়সী চোখ মেলে তাকাতেও পারল না। অনিচ্ছাতে আমার সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এসে এমারজেন্সীর দরজায় দাঁড়িয়ে চোখ মুছলেন। অনিমা এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, কেমন দেখলেন পিসিমা ?

ঠিক বুঝতে পারলাম না। ঘাবড়াবার কিছু নেই। ঠাকুরকে ডাক। সবই তাঁর ইচ্ছা।

অনিমা কতটা আশ্বস্ত হল বুঝতে পারলাম না। তার গাল বেয়ে চোখের জল নামতে দেখে গৃহিণী আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকলেন।

অনেকক্ষণ কথা বলতে পারিনি। রাস্তায় এসে বললাম, প্রেয় বোধহয় বাঁচবে না।

গৃহিণী বললেন, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। তবে মৃত্যুটা স্বাভাবিক বলে মনে করছি না। আমার মনে হয় প্রেয় মরবার জন্যই একগাদা ম্যাডালফিন খেয়েছিল। প্রেয় আত্মহত্যা করেছে। বাঁচার জন্যই সে মরতে চেয়েছে।

বললাম, এ রকম উদ্ভট চিন্তা তোমার মনে এল কেন ?

সে সব পরে বলব।

এখনও বলতে পার। তবে তার তো সাজানো সংসার। স্বামী পুত্র কন্যা নিয়ে তো সুখেই ছিল। এমন অবস্থায় কেউ আত্মহত্যা করতে চায় কি ? এই তো পরশু দিনও এসেছিল তোমার কাছে। আমার সঙ্গেও দেখা করে গেছে। কোন বিকৃতি তো দেখিনি। এমন কিছু গুরুতর ঘটেছে তার কথায় মনে হয়নি। তবে কোন মানুষই তো সর্বাঙ্গীণ সুখী হয় না। বোঝাপড়া করেই মানুষ বাঁচে এবং অপরকে বাঁচার সুযোগ দেয়। প্রেয় তো ব্যতিক্রম নয়। তোমার যতসব আজগুবি কথা। যাই বল আমি তো আত্মহত্যা করার মত কোন কারণই দেখছি না। তবে দেবাঃ ন জানন্তি। এটা দুর্ঘটনা ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। হাইপারটেনশনে এ রকম দুর্ঘটনা হামেশাই ঘটে।

গৃহিণী বেশ গম্ভীরভাবে বললেন, হাসপাতালের খাতায় তোমার কথার মতই কিছু লিখবে মৃত্যুর কারণ। তবে আমি জোর দিয়ে বলতে পারি প্রেয় আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে। তোমরাই তো বলে থাক হঠাৎ কিছু ঘটে না। সামনে যা দেখি তার শেকড় অনেক আগেই মনের গভীরে ক্ষত সৃষ্টি করে। আজ হয়ত এমন কিছু ঘটেনি কিন্তু তার অতীত দুঃস্বপ্নের মত তাকে তাড়িয়ে বেড়িয়েছে এত কাল। শেষে রক্ষা করতে পারেনি। সে মুক্তি চেয়েছিল। মৃত্যুকে ডেকে এনেছে মুক্তি পেতে। অতীতের প্রেত তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে যতীনের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করতে। আর কথা নয়। সোজা বাড়ি চল।

প্রেয়সীর অতীত যদি মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়ে থাকে তাহলে তাকে জানার প্রয়োজন তো অস্বীকার করতে পারি না। তার পাণ্ডুর মুখখানা আমাকে দুশ্চিন্তার গহ্বরে ঠেলে দিতে থাক। সারাটা পথ ভেবেছি। গৃহিণীর বক্তব্যের সঙ্গে আমার বক্তব্যের পার্থক্যটা স্থির করতে পারছিলাম না।

বাড়ি ফিরে প্রেয়সীর করুণ মুখখানা বারবার মনের আনাচেকানাচে ভেসে উঠতে থাকে। এমন কি ঘটনা ঘটল যার জন্য তাকে আত্মহত্যা করতে হল! ভেবেই পেলাম না, কেমন একটা সন্দেহ মনকে ভারাক্রান্ত করে রাখল। কেমন যেন গোলমাল মনে হল সব কিছু। চার মেয়ে তিন ছেলে যার সংসার ভর্তি করে রেখেছে তার মানসিক বিকার তো আমার বোধগম্য নয়। বড় মেয়ে অনিতা তার স্বামীপুত্র নিয়ে সংসার করছে। তার স্বামী সরকারী অফিসের কেরানী। অনেকের কাছেই শুনেছি অনিতার স্বামী দিবাকর যখন কলকাতায় পড়াশোনা করত তখনই অনিতার সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। কেউ কেউ বলে অনিতা পালিয়ে গিয়ে রেজেষ্ট্রি করে বিয়ে করেছিল দিবাকরকে। তবে ইতরজনের মুখে শুনেছি প্রেয়সীর প্রথমা কন্যা অনিতার বিয়েতে খুব ধুমধাম হয়েছিল। উভয় পক্ষ ব্যয়ের কোন ত্রুটি করেনি। অনিতা রূপসী। অনেকের কাছেই তাকে পাওয়াটা বোধহয় সোনার আপেল প্রাপ্তির মত ঘটনা বলেই গণ্য হত। যারা তার ধারেকাছে পৌছতে পারেনি তারা দিবাকরকে ঈর্ষা করত, দুর্নাম রটাতো, যা সব সময়ই স্বাভাবিক।

প্রেয়সীর কাছে শুনেছি অনিতা সুখেই আছে।

সুজন ও কুজন কেউ-ই তার ধারেকাছে পৌছতে পারেনি। সেদিক থেকে দিবাকর ভাগ্যবান।

মেজমেয়ে অনিমা তো বাড়ির পাশেই থাকে। তারও রূপের খ্যাতি আছে। সেও নিজ পছন্দমত বিয়ে করে ঘরসংসার করছে। বামুনের ঘরে বামনী সেজে বেশ

চুটিয়ে সংসার করছে। অনিমা তো তার শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বলা বাহুল্য তাকে শ্বশুর-শাশুড়ী নিয়ে কোন দিনই ঘর করতে হয়নি।

জিজ্ঞেস করলে বলে, সবাই ভাল তবে আমাকে যে বিয়ে করেছে সে জানে অসবর্ণ বিয়েটা তার বাবা মা মনের সঙ্গে মেনে নিতে পারবে না। উপরন্তু তার বিয়েটা তো স্বেচ্ছায় যার অর্থ দাসীবৃত্তি নয়। নিজেদের সুখের জন্যই তো আমার স্বামী আমাকে জাতে তুলেছে। বরং এই ভাল আছি। দূরে দূরে থাকি, উদ্বৃত্ত কিছু থাকলে শ্বশুর-শাশুড়ীকে পাঠিয়ে দিই।

এই সব বলে অনিমা বলত, এইটেই তো ভাল এবং সুখের। কোন ঝামেলা নেই।

তবে অনিমা খুবই ভক্তিমতী। রাস্তাঘাটে কখনও দেখা হলেই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে, কুশল জিজ্ঞাসা করে। তার পিসিমার কথা বার বার জানতে চায়। পিসিমা ভাল আছে শুনলে সে কৃতার্থ হয়। ভক্তিমতী অনিমা তার পিতৃগৃহে বেশ আভিজাত্য নিয়েই যাতায়াত করে থাকে। কেউ কখনও কোন প্রশ্ন করে না তার পতিগৃহের অবস্থান্তর নিয়ে এবং পিতৃগৃহের প্রতি অত্যধিক আকর্ষণের জন্য। কেন এই আকর্ষণ তা কেউ জানে না।

তৃতীয়া কন্যা অনিলা। সেরা মেয়ে, ছোট মেয়ের ন'দিদি।

গৌরবরণ না হলেও দেখতে ভাল, স্বাস্থ্য ভাল, হিন্দী সিনেমা দেখে নিজেকে চৌকস করেছে। সহজে ছোট কথায় কান দেয় না। তার মেয়ে বন্ধুর চেয়ে পুরুষ বন্ধুর সংখ্যাটা একটু বেশি। অনেকেই তাকে বলে বহুবল্লভা। এ বিষয়ে আমার কিছু জানা নেই।

চতুর্থী অসীমা দশম শ্রেণীর ছাত্রী। বিগত দুই বৎসর যাবৎ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েও পরীক্ষকদের নষ্টামিতে তার নাম গেজেটে খুঁজে পাওয়া যায়নি। বর্তমানে ভিনরাজ্যের কোন বোর্ড অথবা বিশ্ববিদ্যালয়কে আশ্রয় করে মাধ্যমিক পাসের কৃতিত্ব অর্জন করতে ব্রতী। বলা যায় সে রবার্ট ব্রুসের ভারতীয় এডিশন।

পুত্র দুটি-ই উপযুক্ত। বড়টি একাদশ ক্লাসের উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে বেকার। মাঝেমাঝে সাকার হবার জন্য সচেষ্ট হয়ে পুলিসের খাতায় নাম লেখাতে বাধ্য হয়েছে। দ্বিতীয়টি মোটামুটি ভদ্র সভ্য ও নম্র। কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। তৃতীয়টি স্কুল পেরোতে পারেনি।

প্রেয়সীর পরিবারের কথা এইটুকুই শুনেছি ও জেনেছি।

এই সব কিছু অবস্থা ও ঘটনা বিশ্লেষণ করেও আমি আত্মহত্যার কোন কারণ

খুঁজে পেলাম না। আমার বিশ্বাস প্রেয়সী অবস্থার দাসত্ব করেছে তারই প্রতিফলন ঘটেছে এই দুর্ঘটনায়।

অবশ্য গৃহিণীর দৃঢ় বিশ্বাস প্রেয়সী আত্মহত্যা করেছে। তার বক্তব্য হল, তাকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করেছে। কে ? যতীন ! যতীনই তার মৃত্যুর অথবা অপমৃত্যুর কারণ।

বললাম, এখনও তো মরেনি।

গৃহিণী মন্দাকিনী চোখ পাকিয়ে বললেন, তুমি কিছুই জান না। জানলেও বুঝতে চাও না। এটা আত্মহত্যা। আমি বলছি, এটা হত্যারই নামান্তর। মোটেই দৈবদুর্ঘটনা নয়। প্রেয়কে আমি যত জানি ওর স্বামী যতীনও অতটা জানে না। ওর মনের কথা উজাড় করে আমাকে বলেছে, কেঁদেছে, দুঃখ জানিয়েছে। ভুলের জন্য অনুতাপ করেছে। কখনও তাকে ভাল করে হাসতে দেখিনি। প্রার্থনা করছি প্রেয় আরাম হয়ে উঠুক। ও মরলে চোখের জল ফেলব কিন্তু দুঃখ জানাব না কাউকেই। মনে করব, প্রেয় মরে বেঁচেছে। সব কথা তোমাকে পরে বলব। এখন চাই প্রেয়র রোগমুক্তি।

চুপ করে গেলাম।

যা জানি না তা নিয়ে অনর্থক আলোচনা করে লাভ নেই।

সন্ধ্যা থেকে লক্ষ্য করলাম গৃহিণীর চোখ ছলছল করছে। মুখ ভার। আমার সঙ্গেও ভাল করে কথা বলছেন না। আমিও বেমনা ছিলাম। কোন রকমে নাকে মুখে দুটো গুঁজে শুয়ে ছিলাম। গৃহিণী এসে শুতেই জিজ্ঞেস করলাম, তোমার খাওয়া হয়েছে তো ?

হঠাৎ এ কথা জিজ্ঞেস করছ কেন ?

তোমাকে প্রেয় চেপে ধরেছে। তার জন্য অনশন করাও আশ্চর্য নয়। তবে তুমি অনশন করলে প্রেয় কিন্তু নিরাময় হবে না।

কি যাতা বকছ। ঘুমোও তো।

মন্দাকিনী বালিশ টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ল।

আমিও নিদ্রাদেবীর আরাধনায় লিপ্ত। কিন্তু কারও চোখে ঘুম নেই।

রাতও শেষ হয়ে এসেছে। শেষ রাতের মিঠে বাতাসে সবেমাত্র চোখ ধরে এসেছে এমন সময় দরজায় ধাক্কা। দুজনেই ধড়মরিয়ে উঠে পড়লাম। দরজা খুলতেই দেখি প্রেয়র ছোট ছেলে দরজায় দাঁড়িয়ে। কিছু জিজ্ঞেস করার অবসর ছিল না। হাউহাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলল, মা নেই।

প্রবোধ দেবার তো কোন ভাষা যোগাল না মন ও মুখ। মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলাম, গৃহিণী ত্বরিতে কাপড় বদলে বলল, তুমি যাও খোকা, আমরা আসছি। আমাকে বলল, তুমিও কাপড়টা বদলে নাও।

আমাদের দাম্পত্য জীবনে এমন ঘনঘটার সম্মুখীন এর আগে কখনও হতে হয়নি। কিছুটা বিমূঢ়ের মত খোকার যাওয়াটা লক্ষ্য করে দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

সারাদিনের সমস্যা নিয়েই শেষ হয়ে গেল।

দৈবদুর্ঘটনায় মৃত্যু অথবা আত্মহত্যা এই দুটি সন্দেহের বিচার তখনও করে উঠতে পারিনি। কোনদিন এই হিসাব শেষ হবে এমন আশা পোষণও করিনা। পৃথিবীতে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ মরছে। কেউ রোগে, কেউ দুর্ঘটনায়। কেউ নিজেকে মারছে, এ সবের হিসাব কেউ করে না। আর প্রেয়সী একটা গেরস্ত বাড়ির বউ, সন্তানের মা, তার এর চেয়ে বেশি পরিচয় আর কি আছে। তার মৃত্যু প্রাত্যহিক মৃত্যুতালিকায় একটি বিন্দুও নয়। হাজার হাজারের পেছনে একটি একের সংযোজন মাত্র, আমরা সাধারণ মানুষরা এটাই জানি ও বুঝি। এমন একটি মহিলার মৃত্যু নিয়ে গবেষণা করা বোকামি মাত্র।

হাসপাতালের সার্টিফিকেটে যা লেখা থাকবে তার বেশি জানার অথবা জানবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ নিতান্তই ছেলেমানুষী। হাসপাতালের ডাক্তারবাবুরাই হলেন চিত্রগুপ্তের একমাত্র পার্থিব এজেন্ট। এদের ওপর খবরদারী করার সাধ্য স্বয়ং ধর্মরাজেরও নেই।

সোজা কথা প্রেয়সী নামক একটি মহিলা মারা গেছে।

কারণ, রক্তের চাপ বৃদ্ধি ও মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ।

গৃহিণীর অনুগামী হয়ে যেতে হল হাসপাতালে।

যতীন ও তার ছেলেরা হাজির করল কয়েক ডজন সঙ্গী সাথী। সৎকারের ব্যবস্থা পাকাপোক্ত হতেই আমরা ফিরে এলাম। আসার আগে গৃহিণী শেষবারের মত প্রেয়সীর মৃতদেহের দিকে শক্ত পাথরের মত অচল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে চোখ মুছে বললেন, চল।

বিকেল বেলায় সংবাদ পেলাম অতি সমারোহ সহকারে প্রেয়সীকে নিমতলায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

গৃহিণী শুনলেন ও উচ্চবাচ্য করলেন না।

আমার কিছু বলার ইচ্ছা ছিল কিন্তু গৃহিণীর মার্জারের মত দৃষ্টি ও গাম্ভীর্য আমাকে বাক্‌হীন করে রেখেছিল। সেই দুপুর বেলায় বাড়ি ফিরে আমার সঙ্গে

সামান্যতম বাক্যালাপ না করায় চিন্তিত হলাম। পরিশিষ্টে আমার দুর্ভাগ্যের বাজনা না বেজে ওঠে! এমন গাম্ভীর্য কখনও দেখিনি। গৃহিণীর রক্তের চাপ বৃদ্ধি পেয়ে যদি মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ ঘটে তা হলে আমার অবস্থা হবে না-ঘরকা না-ঘাটকার মত। ভাবলাম, বাক্যালাপ করার চেষ্টা যে কোন অঘটন ঘটাতে পারে তাই নীরব থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।

রাতে দুজন পাশাপাশি শুয়ে রয়েছি কিন্তু কোন বাক্যালাপ নেই। মনে মনে ভাবলাম, মরল যতীনের প্রেয়সী আর তার হ্যাপা পোয়াতে হচ্ছে আমাকে। একেই বলে ভাগ্য! মক্কায় কাক মরলে কাশীতে বিধবারা নিরম্বু উপবাস করার মত অবস্থা।

তবে সারা রাত লক্ষ্য করেছি গৃহিণীর মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণের কোন লক্ষণ নেই তবে ফোঁসফোঁসানি ছিল।

আমাদের স্বাভাবিক জীবন ফিরে আসতে দেরি হয়নি। পরদিন সকাল থেকেই প্রতিপাল্য জনদের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন মন্দাকিনীদেবী। আমিও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। সকালবেলায় যখন চায়ের কাপ ও সেদিনের সংবাদপত্রটি নিয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন তখন দেখলাম মেঘ অনেকটা তরল হয়েছে। মেঘের নিম্নচাপ বিশেষ কিছু নেই।

কদিন পর যতীন তথা যতীন্দ্রনাথ সরকার তথা প্রেয়সীর স্বামী যখন এসে দাঁড়াল আমাদের সম্মুখে তখন আমিও কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম তাকে দেখে। বললাম, বস।

যতীন কাঁদছিল। দুটো চোখ জবা ফুলের মত লাল। হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল, পরশু দিনে প্রেয়সীর কাজ হবে। আপনারা অবশ্যই পায়ের ধুলো দেবেন জামাইবাবু।

উড়ুনিতে চোখ মুছে আবার বলল, আপনারা দাঁড়িয়ে প্রেয়সীর শেষ কাজটা সুসম্পন্ন করে দেবেন। এর বেশি আর কি প্রার্থনা করব।

'ওঁ গঙ্গা' ছাপানো একখানা চিঠি আমার হাতে দিতেই বললাম, তোমার দিদির সঙ্গে দেখা করে বলে যেও। তারই তো অতি আপন জন ছিল প্রেয়সী। তোমার দিদি বড়ই কাতর হয়েছেন, তাঁকে বুঝিয়ে নিয়ে যেও। আমি তো যাবই।

যতীনকে আর দিদির কাছে যেতে হল না। দিদি স্বয়ং এসে দাঁড়াতেই যতীন বলল, এই তো দিদি! কালকে একবার গিয়ে সব দেখে শুনে আসবেন। পরশু দিন সকালবেলাতেই যাবেন কিন্তু।

মন্দাকিনী মাথা নাড়ল, হাঁ-না কিছুই বলল না। যতীন বলল, আরও অনেক

বাড়িতে যেতে হবে বলে বিদায় নিল। যতীন চলে যাওয়া মাত্র দাঁতে দাঁত চেপে গৃহিণী বললেন, স্কাউণ্ড্রেল! ভণ্ড! জোচ্চোর!

অবাক হয়ে মন্দাকিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

গৃহিণী বোধহয় আমার বিস্ময়ের কারণ অনুধাবন করেছিলেন। আমার দিকে শক্ত চোখে চেয়ে বললেন, আমি যা বললাম তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ওর মুখ দেখাও পাপ!

আমার কেমন যেন সব গুলিয়ে গেল। আহত ফণিনীর মত ফোঁস-ফোঁস শব্দ শুধু শুনতে পেলাম। অতি মোলায়েমভাবে বললাম, তা হলে আমাদের যাওয়া উচিত হবে কি?

ভেবে দেখব।

আর কোন মন্তব্য না করে মন্দাকিনী নিষ্ক্রান্ত হলেন। আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। তবে মন্দাকিনী অবিবেচক নয়। যা বলার ছিল তা যতীনের সামনে যে বলেননি এতেই রক্ষা। নাটকের পরবর্তী অঙ্ক কতটা উপভোগ্য হবে তা ভাবতে ভাবতে চোখ বুঁজে বসে রইলাম।

শ্রাদ্ধের দিন সকালে অসীমা এসে বলল, পিসিমা, আপনাদের জন্য বাবা অপেক্ষা করছে। অমর, অমল আর অরূপ এখনও শ্রাদ্ধে বসতে পারছে না। আপনারা গেলেই অমর শ্রাদ্ধে বসবে। সংকীর্তনের দল এসে গেছে, যোগাড়যন্তর শেষ শুধু আপনাদের অপেক্ষায় আছে সবাই। তাড়াতাড়ি চলুন।

মন্দাকিনী ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন, কি করবে?

তুমি কি ভেবেছ?

ইচ্ছে নেই।

অনেক সময় অনিচ্ছাতেও ক্যাস্টর অয়েল খেতে হয়।

মন চায় না।

লৌকিকতা বাদ দিয়ে সমাজে চলা যায় কি!

বেশ, তুমিও চল।

হেসে বললাম, শ্রাদ্ধ তো কোন্ উৎসব নয়। আনন্দেরও নয়। শ্রাদ্ধবাড়িতে ভূরিভোজন আমার নীতিবিরুদ্ধ। ওরা খেতে বলবে। লজ্জায় পড়তে হবে।

তুমি যদি যাও ওটা আমি ম্যানেজ করব। আমি তো জলগ্রহণ করব না।

বেশ চল। এই কথা থাকলো, ম্যানেজ করবে তুমি।

কাপড় জামা বদলে অসীমার সঙ্গেই গেলাম। যাবার সময় বারবার রিকশায়

উঠতে বলছিল অসীমা কিন্তু গৃহিণী কোনমতে রাজি হলেন না, পায়ে হেঁটেই গেলাম যতীনের বাড়িতে। অবশ্য দূরত্ব খুব বেশি নয়। বিলম্বে শ্রাদ্ধবাড়িতে যাওয়াই ছিল গৃহিণীর উদ্দেশ্য।

আমরা বিলম্বিত হলেও অমর বিলম্ব করেনি। পুরোহিতের তাগাদায় তত-ক্ষণ শ্রাদ্ধকার্যে বসে গেছে। সংকীর্তনীয়ারা উচ্চকণ্ঠে হরিনাম গান করছে। শ্রাদ্ধের কোন অনুষ্ঠানেই আমাদের অংশ নেবার কোন সুযোগ আর ছিল না। শুধু মাত্র লৌকিকতা ও নিমন্ত্রণ রক্ষাই আমাদের উদ্দেশ্য। তা সফল হয়েছে গৃহিণীর বুদ্ধিতে। আমরা বাইরে থেকেই সংকীর্তনের খোলের শব্দ ও হরিধ্বনি শুনতে শুনতে হাজির হলাম মুখ্য অনুষ্ঠানের প্যাণ্ডেলে। দোতালার খোলা ছাদে প্যাণ্ডেল, তার নীচেই শ্রাদ্ধের সবকিছু ব্যবস্থা। আমাদের দেখেই যতীন গদগদ হয়ে দুটো ডেক চেয়ার এনে বসতে দিল। কয়েকবার চোখ মুছে শোক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রেয়সীর ভূয়সী প্রশংসাও করতে থাকে। আমরা নীরব শ্রোতা ও দর্শক। গৃহিণীর মুখের দিকে বারবার তাকাচ্ছিলাম, ভয় পাচ্ছিলাম, গৃহিণী কোন কটুকথা বলে সব কিছু বরবাদ করে না দেয়।

গৃহিণীর নীরবতা আমাকে রক্ষা করল।

ঘণ্টাখানেক চুপ করে বসে থেকে উঠে পড়লাম।

এখন যাচ্ছি। পরে সময় পেলে আবার আসব, বলেই সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালাম।

অসীমা পথ আটকে বলল, না খেয়ে কেন যাবেন।

বললাম, খেতে তো আসিনি। তোমার মায়ের শেষ কাজে এসে আমাদের স্নেহমমতার ঋণ শোধ করলাম। মানুষ মরলে তো উৎসব কেউ করে না। এটা তো কোন উৎসব নয়।

কিছু মুখে দিয়ে না গেলে মায়ের আত্মার মুক্তি হবে না পিসেমশায়।

হেসে বললাম, হবে কি না তা দেখবার লোক কি কেউ আছে?

অসীমা বলল, এক গ্লাস সরবত!

তাও না। তোমাদের যদি শাস্ত্রের প্রতি গভীর বিশ্বাস থাকে তা হলে বারজন ব্রাহ্মণভোজন করাও তা হলেই আত্মার মুক্তি। আমরা তো যজমানী ব্রাহ্মণ নই, অগ্রদানীও নই, আবার বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত নই, ব্রাহ্মণভোজনে আসা যাদের পেশা তাদের আপ্যায়িত কর। তাতেই শাস্ত্রবিধি মান্য করা হবে।

অসীমা মুখ ব্যাজার করে ফিরে গেল।

আমি মুখ ফিরিয়ে ভাল করে দেখলাম। সোনালী ফ্রেমে এঁটে প্রেয়সীর এনলার্জমেণ্ট বসানো রয়েছে বেদীতে। তাকিয়ে দেখছিলাম আর ভাবছিলাম কত দূরে চলে গেছে অথচ কত পরিচিত। কদিনের ব্যবধানে আজ মনে হচ্ছে যেন কত অপরিচিত। কত আপনজন অথচ কত পর হয়ে গেছে বিধির বিধানে। সাদা রজনীগন্ধার মালায় সাজানো ফটোর চোখ দুটো আমাকে কি যেন বলতে চাইছে। মনে পড়ল প্রেয়সীর সেই অনুরোধটা। কে যেন আমার কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, আমাকে নিয়ে একটা গল্প লিখুন দাদাবাবু! আজ তার দু চোখ দিয়ে সেই অনুরোধটা আমায় স্মরণ করিয়ে ব্যঙ্গ করছে। সহ্য করতে পারছিলাম না। মুখ ফিরিয়ে নিলাম। মনে মনে বললাম, আমাকে ক্ষমা কর প্রেয়সী। আমার অক্ষমতার জন্য আমি দুঃখিত।

গৃহিণীর হাত ধরে টানতে টানতে নীচে নেমে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। কেমন একটা অশরীরী অনুভূতি আমাকে আচ্ছন্ন করেছিল। গৃহিণীর হাত ধরেই দাঁড়িয়েছিলাম স্তম্ভিতভাবে। হঠাৎ গৃহিণী সচকিতভাবে যদি হ্যাঁচকা টান না দিতেন তা হলে কতক্ষণ এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতাম তা জানি না। গৃহিণী বোধহয় অনুমান করেছিলেন আমার মানসিক অবস্থা, নইলে এত সচকিতভাবে আমাকে টেনে রাস্তায় নিয়ে আসতেন না।

ধীরে ধীরে রাস্তায় এসে চলতে আরম্ভ করলাম।

গৃহিণী শ্রাদ্ধবাড়িতে কারও সঙ্গে সামান্যতম বাক্যালাপও করেননি।

পথে এসে ইঙ্গিতে একটা রিকশা ডাকতে বললেন।

সারা দিনটা প্রয়োজনীয় কাজ করে কেটে গেল। প্রেয়সীর কথা মাঝে মাঝে মনে হলেও তা বিশেষ কোন রেখাপাত করতে পারেনি মনের গহনে। গৃহিণীর সঙ্গে সাহস করে প্রেয়সী প্রসঙ্গ তুলতে পারিনি।

রাতের বেলায় মন্দাকিনীকে কিছুটা ধাতস্থ মনে হয়েছিল। তবুও সাহস করে কোন কথা বলিনি। মাঝে মাঝে এপাশ ওপাশ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে জানিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর চোখেও আমার মত ঘুম নেই।

অনেকটা রাত।

চারিদিক নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে দু-একটা রাতের সোয়ারী নিয়ে গলি দিয়ে রিকশা যাচ্ছিল। তারই শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

কদিন থেকে মন্দাকিনীর সঙ্গে ভাল করে কথা বলার সাহস ও সুযোগ পাইনি। মাঝরাতে কদিনের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করতে চুপিচুপি বললাম, তুমি প্রেয়কে এত

ভালবাসতে অথচ এ কদিন তোমার মুখে একবারও তাঁর নামটা শুনিনি, কেন? আর যতীনকেই বা কেন সহ্য করতে পারছ না।

মন্দাকিনী আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

ব্যাপারটা কি বলতে চাও না কেন?

তোমাকে সব কথা বলতে পারিনি। বলা উচিত মনে করিনি। মেয়েদের মনের কথা পুরুষরা যতটা না জানে ততটাই ভাল। তুমি অস্থির হয়ে উঠবে বলেই চুপ করে থেকেছি। প্রেয় আমার কাছে আসত আর নিজের কথা বলে কাঁদত। তার কান্নার শেষ হয়েছে এটাই আমার পরিতৃপ্তি। মৃত্যু তাকে মুক্তি দিয়েছে, শান্তি দিয়েছে। আর যতীন? মহাপাপী। ওর ছায়া মাড়ানোও মহাপাপ।

বাস্। আর কোন কথা না বলে গৃহিণী থেমে গেলেন।

আমারও চোখে ঘুম নেই। বারবার প্রেয়র মিনতিভরা চোখ দুটো আমার সামনে ভেসে উঠছিল। অনুভব করলাম পাশে গৃহিণীও ঘুমোয়নি। মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাসের ফোঁসফোঁসানি শুনতে পাচ্ছিলাম।

জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি ঘুমোওনি?

তুমিও তো জেগে!

হ্যাঁ, প্রেয়সী আমাকে পেয়ে বসেছে। তোমাকেও। অথচ মৃত্যুকে তো রোধ করতে কেউ পারে না। তাই অবস্থাকে আমরা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছি।

গৃহিণী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ উঠে বসলেন।

আবেগের সঙ্গে বললেন, প্রেয়সী মাঝে মাঝেই বলত, একটাই ভুল করেছিলাম দিদি, তারই মাসুল জীবনভর দিয়ে আসছি। বড়ই কঠিন ও নির্মম এই মাসুল, এর শেষ যে কোথায় তা জানি না। এই ভুলের চরম পরিণতির দায় আর টেনে বেড়াতে পারছি না। সারা জীবন এই দায় কাঁধে নিয়ে বেড়াব তা হয় না। এর শেষ চাই দিদি। প্রেয়কে প্রবোধ দিতাম কিন্তু তার মনের ব্যথা নিরসনের কোন দাওয়াই আমার তো জানা ছিল না। ব্যক্তিগত জীবনকে শুধরে নিতে পারে ব্যক্তি। বোঝাপড়া দিয়ে। আমরা বাইরের লোক, আমাদের তো আহা-উহু বলা ভিন্ন আর কোন কিছু করার নেই। এই তো কিছুদিন আগে প্রেয় বলেছিল দেখবেন কোন দিন কোন অঘটন না ঘটে যায়। তারপর দু মাসও কাটেনি। প্রেয় তার ভুলের মাসুল ষোল আনা বুঝিয়ে দিয়ে অতি প্রিয় স্থানের সন্ধানে চলে গেল। ঠাকুরের কি যে মহিমা! তবে ভালই হয়েছে।

তুমি ওর মৃত্যুটাকে এত সহজভাবে গ্রহণ করেছ এইটেই আশ্চর্য!

গৃহিণী ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, প্রেয়সী তো যাতা ঘরের মেয়ে নয়। ওদের পাড়ায় ওর বাবা ছিলেন খ্যাতনামা উকিল। অর্থ বিত্ত সবই ছিল, ছিল না সংসার গড়ে তোলার মত লোক। তবুও প্রেয় বাবার কাছে যা পেয়েছিল তা অপরিসীম অথচ ভোগ করতে পারল না। এখন ঘুমোও। সব শুনলে আর ঘুম হবে না। আর কথাও তো পালিয়ে যাবে না। ধীরে ধীরে বলব, তুমিও ধীরভাবে শুনবে।

বললাম, ঠিকই বলেছ। তোমার কথা শোনা দরকার কেননা আমার একটা নৈতিক দায় রয়েছে। প্রেয়সীকে নিয়ে একটা বাস্তব জীবনের গল্প লেখা বাকি। তোমার কাছ থেকে উপাদান সংগ্রহ করব। কেমন!

তিন

দিগম্বর উকিলের বড় নাম। এক ডাকে সবাই চেনে। হাইকোর্টে ফাঁসীর আসামীর দণ্ড মকুব করাতে তার মত তীক্ষ্ণ যুক্তির জাল রচনা করতে বলতে গেলে খুব কম উকিলই পারে। এই রকম আপীলের মামলা নীচের আদালতের উকিলরা দিগম্বরের কাছেই পাঠিয়ে থাকে। শতকরা আশী ভাগ ক্ষেত্রেই ফাঁসীর আদেশ রদ হয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সৌভাগ্য লাভ করে আসামী পক্ষ দিগম্বরের জয়গান করে থাকে। কঠিন মামলার অনেক আসামীই খালাস পেয়ে দিগম্বরের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে বাড়ি ফিরে গেছে। তার ক্ষুরধার যুক্তির আর কূটতর্কের সামনে বাঘা বাঘা উকিল ব্যারিস্টার ঘোল খেয়ে যেত। অর্থোপার্জন? লক্ষ্মী যেন তার দুয়ারে বাঁধা।

দিগম্বর মামলার ব্রিফ নিলে অপর পক্ষের উকিলরা চিন্তিত হত। ফৌজদারী মামলার আপীলের ক্ষেত্রে দিগম্বর ছিল অদ্বিতীয়। পাড়ার লোক যথেষ্ট শ্রদ্ধা করত তাকে, যথাযথ সম্মান করত। আইনব্যবসায়ে তার যতই সুনাম থাকুক পাড়ায় দিগম্বর ছিল কিছুটা অপাংক্তেয়। তার ব্যবহারে কেউ অখুশী হয়নি। তবে দিগম্বর উকিলের চেহারাটা ছিল বিদঘুটে। বেশ মোটাসোটা, বেঁটে, গায়ের রং আবলুস কাঠের মত কালো। এই চেহারা নিয়ে জনসমাজে সহজে সে আসতে চাইত না। চেহারা নিয়ে তার ছিল খুবই হীনমন্যতা। বাল্যে বসন্ত রোগাক্রান্ত হওয়াতে সারা দেহে ছিল বসন্তের দাগ বিশেষ করে তার মুখমণ্ডল ছিল বিকৃত। তার নাকটাই হল অদ্ভূত। বসন্তের কঠিন ছাপ ছিল নাকে, দূর থেকে দেখলে মনে হত তার নাকটাই বুঝি নেই।

উকিলের ছেলে উকিল হলে বাঁধা সেরেস্তা পায়, যোগ্যতা থাকলে নিজের

ভাগ্য গড়তে দেরি হয় না কিন্তু প্রথম জমানায় উকিলের পশার জমাতে সময় দরকার, যোগ্যতা দিয়ে তাকে প্রতিষ্ঠিত হতে হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মত ব্যারিস্টারকেও খালি পকেটে ঘুরতে হয়েছে অনেক কাল। তিনি ছিলেন ব্যারিস্টার আর দিগম্বর তো সঞ্চয়হীন উকিল। তাকে পশার জমাতে বহু কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে, তবে যোগ্যতার মাপকাঠিতে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে তবেই হাইকোর্টে খ্যাতি অর্জন করেছিল।

বিয়ে করার ইচ্ছে ছিল না। যখনই আয়নাতে নিজের চেহারা দেখেছে তখনই তার বিয়ে করার ইচ্ছে উপে গেছে। বিধবা মায়ের অনুরোধ এবং পীড়াপীড়িতে বিয়ে করতে রাজি হয়ে বলেছিল, তোমার এই সোনার কার্তিককে দেখলে আর কেউ বিয়ে করবে না। সাবধান, বিয়ের পাঁড়ি থেকে বউ যেন পালিয়ে না যায়।

মা কিন্তু ছেড়ে দেবার পাত্রী নয়। বলেছিল, পুরুষের আবার রূপ। ওর গুণ-টাই বড়। দেখতে দেখতে তুই বেশ পশার জমিয়েছিস, নামও হয়েছে। এমন ছেলের বউ পালাবে কেন? অনেক ভাগ্য করে তোর মত বর পাবে, বুঝলি!

তুমি যখন বলছ তখন বিয়ে করতেই হবে, তবে পাত্রীপক্ষকে রূপ ও গুণের খবরটা নিখুঁতভাবে দিও। পাত্রীরও তো একটা পছন্দ আছে। তার মনের কথা না বুঝে কিছু করলে চিরকাল হীনমন্যতায় ভুগতে হবে দুজনকেই। এর চেয়ে বিয়ে না করাই ভাল।

বিধবা মা সারদাবালা নিজেও মেয়ে খুঁজতে থাকে, ঘটকের আশ্রয়ও নিতে ত্রুটি করেনি। অবশেষে বিবাহ স্থির হল। কিভাবে কি হল তা দিগম্বর জানে না, পাত্রও পাত্রীকে দেখল না, পাত্রীও পাত্রকে দেখল না। ঝিনাইদহের অতি নিম্নবিত্তের সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে বিয়ে স্থির করে সারদাবালা নিশ্চিন্ত হল। কন্যাপক্ষের যাবতীয় ব্যয় বহন করে সারদাবালা ছেলের বিয়ে দিয়ে বউ ঘরে নিয়ে এল।

বউ দেখে সবাই খুশী। চুপিচুপি অনেকে মন্তব্য করল বানরের গলায় মুক্তোর হার।

দিগম্বরও বউ পেয়ে খুশী কিন্তু খুশী হয়নি সদ্যবিবাহিতা নিভাননী। অতি দরিদ্রের মেয়ে হলেও তার নিজস্ব একটা রুচি তো আছে। শুভদৃষ্টির সময় দিগম্বরকে দেখে চমকে উঠেছিল নিভাননী। সেদিন সেই মুহূর্ত থেকে নিভাননী হাসতে ভুলে গিয়েছিল। সারাটা রাত সে কেঁদেছিল। দিগম্বরের হাত ধরে কলকাতা যাবার আগে মাকে চুপিচুপি ডেকে বলেছিল, আমার এমন সর্বনাশ না করলেও পারতে। এর চেয়ে আইবুড়ো হয়ে তোমার কাছেই চিরকাল থাকতাম। একটা

বেবুনের সঙ্গে আমার বিয়ে দিলে শেষ পর্যন্ত! তবে কোন কিছু খারাপ হলে আমাকে দোষ দিও না।

নিভাননীর মা চোখ মুছতে মুছতে বলেছিল। গরীবের কোন পছন্দ থাকে না নিভু। ভাগ্যকে মেনে নিতে হয়।

অষ্টাদশী নিভাননীর আর ত্রিশ বছরের দিগম্বরের মানসিক, কৃষ্টিগত ও শিক্ষা-গত পার্থক্য সহজেই সবার চোখে পড়ল। দিগম্বর বিব্রত, নিভাননী বিপর্যস্ত কিন্তু করার কিছুই তখন ছিল না। দিগম্বর মামলা মোকদ্দমার নথিপত্রের মধ্যে ডুবে থাকতে সচেষ্ট, নিভাননী অন্দরমহলে দাসী ভৃত্য তাড়নায় ব্যস্ত, আর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যোগাযোগ সূত্র সহজে ছিন্ন না হলেও নেপথ্যে সক্রিয় ছিল দিগম্বরের মুহুরী প্রকাশ।

এই জীবনটা দিগম্বর কোন দিনই চায়নি, নিভাননীও এই জীবন নিয়ে ক্লান্ত।

একদিন অতি বিনীতভাবে দিগম্বর নিভাননীকে বলল, আমার সঙ্গে তোমাকে মানায় না নিভা।

নিভাননী সতেজে জবাব দিয়েছিল, আমার মা বলেছিল ভাগ্যকে মেনে নিতে হয়। এতদিন পরে মায়ের উপদেশ ও নির্দেশ মানবার চেষ্টা করব।

তোমার সবকিছু পূরণ করতে পারলেও ঈশ্বরদত্ত এই চেহারাটা তো বদল করতে পারব না। ভাল করেই জানি, তোমার মনের কোথায় ঘৃণা পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে কিন্তু আমার দায়িত্ব কতটুকু তা তুমি নিশ্চয়ই জান।

নিভাননী কোন জবাব দেয়নি। নিজেকে উন্মুক্ত করে বোঝাপড়ার কোন আগ্রহই ছিল না নিভাননীর।

দিগম্বর সকালবেলায় তার চেম্বারে বসত। কোনরকমে খেয়েদেয়ে আদালতে যেত। বিকেলে আদালত থেকে ফিরে আবার মক্কেলের কাগজপত্র নিয়ে বসত তার চেম্বারে। অনেক রাতে উঠে কোনদিন নিজের ঘরে শুতে যেত, কোনদিন চেম্বারে রাখা ইজি-চেয়ারেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ত। যেদিন নিজের শোবার ঘরে যেত সেদিন ভাল করে লক্ষ্য করত নিভাননী ঘুমিয়েছে কিনা, ঘুমিয়ে থাকলে চুপটি করে তার পাশে এমনভাবে শুয়ে পড়ত যাতে নিভাননীর কোনপ্রকারে ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটে। সকালে স্ত্রীর ঘুম ভাঙবার আগেই বিছানা থেকে উঠে সোজা চলে যেত তার চেম্বারে। নিজেকে ডুবিয়ে দিত কাজের মাঝে। কলহ বাদবিসম্বাদ কথাকাটাকাটি কখনও হত না। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যে বিরাট ও দুর্ভেদ্য প্রাচীর মাথা উঁচু করে ছিল তা বাইরের লোক কেউ জানতও না। তবে সারদাবালা

অনুমান করলেও করার কিছু ছিল না।

যতদিন সারদাবালা জীবিত ছিল ততদিন সে-ই দিগম্বরের খাওয়ার তদারক করত। দিগম্বরও ছোট শিশুটির মত মায়ের কাছে আবদার করত। দিগম্বরের আবদার শুনে তার মনের অবস্থা আরও বিষণ্ণ হত। সারদাবালা বুঝত, তার ছেলে তার মনের গ্লানিকে গোপন করতে মায়ের আঁচলের তলায় আশ্রয় নিতে চাইত শিশুর মত আবদার করে। সারদাবালা বুঝতেন কিন্তু দাম্পত্য জীবনের এই মনোবিকারকে নিরাময় করার কোন উপায় তার জানা ছিল না। সবই দেখত ও শুনত। নীরবে সহ্য করত। অসম মনোবৃত্তির দুটো ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর দুই মেরুকে এক সূত্রে বাঁধতে চেয়ে সারদাবালা যে ভুল করেছিল তা শুধু তার আয়ুটাকে ক্ষয় করেছিল এমন নয় অব্যক্ত যন্ত্রণায় জ্বলে পুড়ে মরতে হয়েছিল। শেষের কটা দিন কপাল চাপড়ে নিঃশব্দে বিদায় নিলেও এখানেই যবনিকাপাত ঘটেনি, আরও কঠিন ও নির্মম ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিয়েছিল নিজের পুত্রকে।

মানুষের জৈবিক প্রয়োজনটা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। মানুষ কেন প্রাণীজগৎটাই সৃষ্টির আনন্দে সাময়িকভাবে ভুলে যায় বর্তমানকে। দিগম্বর ও নিভাননী পরস্পরের সান্নিধ্যকে এড়িয়ে চললেও পার্থিব বিধানে নিভাননীকে মা হতে হয়েছে। একবার নয়, কয়েকবার। প্রথম সন্তান কন্যা।

প্রেয়সী-ই তার প্রথম সন্তান।

কমনীয় তার চেহারা, মায়ের মুখের ছাপের সঙ্গে বাবার গায়ের রংই তাকে নিভাননীর চক্ষুশূল করে তুলেছিল জন্মাবধি। প্রেয়সীর জন্মের পর দিগম্বর আশা করেছিল মাতৃত্ববোধ নিভাননীর স্বভাব পরিবর্তন করতে পারবে। কার্যকালে দেখা গেছে প্রেয়সীকে প্রতিপালনের দায় দাস-দাসীর ওপর ছেড়ে দিয়ে নিভাননী প্রেয়সীর কাছ থেকে তফাতে থাকতে অদম্য চেষ্টা করছে। দিগম্বর মৃদু প্রতিবাদও কখনও করেনি কন্যার প্রতি নিভাননীর অহেতুক অবহেলার জন্য। মাতৃত্ব যেন মৃত, নারীত্বের দম্ভে নিভাননী অযৌক্তিক জীবনচর্চায় মেতে উঠল। দিগম্বর বুঝল। মাঝে মাঝে নিভাননীকে স্মরণ করিয়ে দিত, সন্তানকে বড় করার দায়িত্ব সর্বদেশেই জননীর। জননীই শেষ কথা নয়। পালন মায়ের ধর্ম।

নিভাননী যেমন ছিল তেমনিই চলেছে। দিগম্বরকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলেছে, আজকাল বহুদেশেই সন্তান পালনের দায়িত্ব পালন করে আয়া ও গৃহভৃত্যরা। এটা নতুন কিছু নয়।

প্রেয়সীর সকল দায় দিগম্বর নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে আয়া পরিচারক

নিয়োগ করে সজাগ দৃষ্টি রাখত প্রেয়সীর ওপর। রাতের বেলায় আয়ার ঘরে ঘুমন্ত শিশুকে পৌছে দিয়ে দিগম্বর শুয়ে পড়ত তার ইজিচেয়ারে।

প্রেয়সী হাঁটতে শিখেছে।

সকালবেলায় আয়ার কোল ছেড়ে গুটিগুটি পায়ে দিগম্বরের চেম্বারে এসে বাবার কোলে উঠে বসত, আদালতে যাবার সময় আয়ার কোলে তুলে দিয়ে অন্যমনস্কভাবে প্রতিদিনই গাড়িতে গিয়ে উঠত। আবার বিকেলবেলায় বাড়ি ফিরেই প্রেয়সীকে কাছে ডেকে নিত। এমনিধারা একটা রুটিনবাঁধা জীবনে না ছিল কোন স্বাদ না ছিল কোন সন্তোষ। এ যেন ছ্যাকড়া গাড়ি। শীর্ণদেহ অশ্বতরকে চাবুক হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়ার মত। অশ্বতরের বেদনা সোয়ারীও বোঝে না, বোঝে না গাড়োয়ান। চলতে হয় তাই চলছে।

একই ঘরে আলাদা বিছানায় রাত কাটাত দুজন কিন্তু কোন সময়ই প্রেয়সীকে কাছে ডেকে নিত না নিভাননী।

ঝগড়া নেই, বিবাদ নেই, আছে পছন্দ আর অপছন্দের লড়াই।

আট বছর পর প্রেয়সীর নিঃসঙ্গতা কিছুটা দূর হল তার ভাই বিজয়ের আগমনে।

নিভাননী বিজয়ের দিকে তাকিয়ে কেমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল।

দিগম্বর বোধহয় প্রথম বারের মত প্রতিবাদ জানাল। বলল, তোমার সব কিছু অসুবিধাই তো দূর করি? আমি আশা করব তুমি অন্তত তোমার সন্তানদের ওপর কিছু মমতা দেখাবে।

মমতা! মুখ বেঁকিয়ে জবাব দিল নিভাননী। তার সঙ্গে জুড়ে দিল, একটা ভূতের বাচ্চা! তার ওপর মমতা? আবার নাম রেখেছ বিজয়। কি বিজয় করবে তোমার ছেলে। হাঁদাম্যাদা কিছু নাম দিলেই মানাত ভাল। সখ করে মেয়ের নাম রেখেছ প্রেয়সী। দুনিয়াতে এত নাম থাকতে আর কোন নাম খুঁজে পাওনি। নাম প্রেয়সী—বাপ্‌রে রূপের ডিপো তাই প্রেয়সী, বরং ওর নাম ভাল হত রাক্ষসী রাখলে।

দিগম্বর কোন উত্তর দেয়নি।

কথাকাটাকাটি ঝগড়া করা তার স্বভাব নয়। তবুও অনেক সময় ভেবেছে, মা হয়ে এমন নির্মম কি করে হতে পারে! যদি কেউ অপরাধ করে থাকে তা হল উভয় পক্ষের অবিভাবক। সে নিজেও কোন অপরাধ করেনি। তার সন্তানরা তো পবিত্র কুসুমের মত।

বিজয়ের জন্মের পর থেকেই নিভাননী জায়গা করে নিয়েছিল পাশের ঘরে। ভুলেও সে দিগম্বরের ঘরে পা দিত না। দিগম্বরও কোন সময়ই নিভাননীর ঘরে প্রবেশ করত না। আগে যাওবা দু-একটা কথাবার্তা হত, এখন তাও বন্ধ।

সময় দাঁড়িয়ে থাকে না।

শ্রেয়সী বড় হতে থাকে। বিজয়ও হেঁটে বেড়ায়। ভাইবোন দুজনেই বাবার দু পাশে শুয়ে রাত কাটায়। সকালে গৃহশিক্ষক এসে শ্রেয়সীকে পড়ায়। দুপুরটা তার কাটে স্কুলে। দিগম্বর ছেলে-মেয়েদের পাশে বসিয়ে খাওয়ায়। শ্রেয়সী স্কুল যাবার পর বিজয়ের দায়িত্ব নেয় আয়া।

শ্রেয়সী বুঝতে শিখেছে। মূলে পৌঁছতে না পারলেও বুঝত বাবা-মার সম্পর্কের কোথাও যেন একটা কাঁটা ফুটে আছে তা উৎপাটন করার সাধ্য কারও নেই। এটাও সে বুঝেছে। শ্রেয়সী ভুলেই গেছে তার মায়ের অস্তিত্ব। বিজয় মাঝে মাঝে মায়ের কাছে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এসে আয়ার হাত ধরে খেলা করে।

প্রকাশ দিগম্বরের মহুরী।

তার বড় কাজ হল শ্রেয়সীর সব রকম আবদার মেটানো। তার জন্য বেশ কিছু ব্যয় করতে হলেও যেন শ্রেয়সী মনে কোন দুঃখ না পায়, এই নির্দেশ ছিল দিগম্বরের। শ্রেয়সীর আবদার যুক্তিযুক্ত হোক অথবা অযৌক্তিক হোক তা বিচার করা চলবে না। চাওয়া মাত্র তাকে দিতে হবে।

বাবার স্নেহ-ভালবাসা ও প্রশ্রয়ে শ্রেয়সী বড় হতে থাকে। দিগম্বর সকাল সন্ধ্যায় আদালতের কাগজপত্র নিয়ে বসে। শ্রেয়সীর গৃহশিক্ষক সকাল সন্ধ্যায় পড়ায়। বাবা ও মেয়ের দেখাসাক্ষাৎ সামান্য সময়ের জন্য। বিশেষ বিশেষ কারণে রাতের বেলা দিগম্বর যখন শুতে যেত তখন তার ছেলে ও মেয়ে দুজনেই ঘুমিয়ে পড়ত। প্রথমাবধি নিভাননী যখন শ্রেয়সী সম্বন্ধে উদাসীন ছিল তার কেমন পরিবর্তন হয়নি। বিজয় মায়ের কাছে যেত। তাকে যত্ন না করলেও একেবারে দূরছাই করত না। বিজয় তখনও ভাল করে বুঝতে না শিখলেও তার শিশুমন যা খুঁজতো তা না পেয়ে বিজয় ক্রমেই একগুঁয়ে অবাধ্য হয়ে উঠতে থাকে। দিগম্বর ছেলে-মেয়ের সব রকম সুখসুবিধা সৃষ্টি করেও শান্তিতে বাস করতে পারত না।

ছেলেমেয়ের দিকে নিভাননী কোন রকম নজর রাখত না। বাবা ও মায়ের দুটি ভূমিকা গ্রহণ করতে হত দিগম্বরকে কিন্তু কোনটাই সম্যকভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হত না। নিজের বিরাট পশার বজায় রেখে ঘরের খুঁটিনাটি নজর রাখা, তদ্বির করা কোন পুরুষমানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। বিধাতা বোধহয় এসব হিসাব

করেই পুরুষ ও নারীর কর্ম বিভাগ করে দিয়েছিলেন সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে। দিগম্বরের অক্ষমতার পরিপূরক ছিল তার মুহুরী প্রকাশ। বাজার-হাট করা, হিসাব রাখা, ফাইফরমাস খাটা, এই সব গেরস্থালি কাজ অনেকটা সামলে দিত প্রকাশ। খুব আগ্রহ নিয়েই প্রকাশ এসব কাজ করত; দিগম্বর মনে মনে তার প্রশংসা করলেও বাইরে প্রকাশ করত না।

প্রকাশ যুবক, সুঠামদেহী, গৌরবর্ণ, লেখাপড়া খুব না শিখলেও মামলামোকদ্দমা তদ্বির তদারক যেমন বুঝত তেমনি বুঝত দিগম্বরের সংসারের কাজকর্ম। প্রকাশ ভিন্ন দিগম্বরের সংসার যেন অচল। প্রকাশ ধীরে ধীরে তার দক্ষতায় সবার মন জয় করে নিয়েছিল। সব কাজেই প্রকাশের ডাক পড়ত। তার নিত্যকার কাজ ছিল সন্ধ্যাবেলায় আদালত থেকে ফিরে নিভাননীর সামনে হাজির হওয়া এবং নিভাননীর ফরমাস অনুসারে সবকিছু যোগান দেওয়া। মনিবপত্নীকে খুশী রাখলে আখেরে সুখ সে বুঝত।

নিভাননী মনে করত প্রকাশ তার অপরিহার্য সঙ্গী ও বশম্বদ অনুচর। মাঝে মাঝেই প্রকাশ মারফত গোপনে টাকা জমা দিত ব্যাঙ্কে। এ খবর কোনদিনই কেউ জানতে পারেনি। জমা ব্যাঙ্কের টাকা ক্রমে স্ফীত হতে থাকে। ব্যাঙ্কের পাসবইটা লকারে রেখে চাবিটা লুকিয়ে রাখত যাতে গোপন সঞ্চয়ের কথা কেউ জানতে না পারে। এই গোপন সঞ্চয়ের কথা প্রকাশ কাউকে না বললেও সেও ভাবত, কেন এই গোপনীয়তা! কেনই সঞ্চয়ের দিকে তার মনিবপত্নী এত আগ্রহী। মাঝে মাঝেই পাড়ার স্যাঁকরা এসে দিগম্বরকে গয়না তৈরীর বিল দিত। টাকার অঙ্ক যতই হোক দিগম্বর বিনা বাক্যব্যয়ে বিল পরিশোধ করে দিত। তার পক্ষে কোন সুযোগ ছিল না এই লেনদেনকে যাচাই করার।

হঠাৎ খেয়াল হল শ্রেয়সী বড় হচ্ছে। তাকেও বিয়ে হতে হবে। কৃষ্ণবর্ণ এই কন্যার বিয়ে দিতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। অগ্রিম কিছু ব্যবস্থা করা উচিত। স্যাকরা ডেকে ধীরে ধীরে শ্রেয়সীর জন্য একটা একটা গয়না গড়িয়ে ব্যাঙ্কের লকারে রেখে দিত দিগম্বর।

প্রকাশের জ্যাঠতুতো দাদার ছেলে যতীন।

আঠার বিশ বছর বয়স।

প্রবেশিকা পাস করে কলকাতায় এসেছে কলেজে পড়তে। হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করার মত আর্থিক সামর্থ্য নেই তাই কাকার কাছে এসেছে আশ্রয় চাইতে। প্রকাশের অনুরোধে দিগম্বর তার বৈঠকখানার পাশের ঘরে যতীনকে থাকতে

অনুমতি দিয়েছিল। আর নিভাননী যতীনকে দুবেলা খেতে দেবার আদেশ দিয়েছিল পাচক ঠাকুরকে। প্রকাশের চেষ্টায় যতীন দিগম্বরের গৃহে তখন সুপ্রতিষ্ঠিত।

শ্রেয়সী তখন নবম শ্রেণীর ছাত্রী।

বিজয়ের হাতেখড়ি হয়েছে।

বোধহয় এই ভাবে তাদের চাপা অশান্তির জীবন কেটে যেত কিন্তু অকস্মাৎ ছেদ পড়ল শ্রেয়সীর অভিযোগে। সকালবেলায় মুখ না ধুয়েই দিগম্বরের ঘরে ঢুকে ডাকল, বাবা!

শ্রেয়সীর গলায় উত্তেজনার স্বর।

এত সকালে কোনদিনই শ্রেয়সী তার কাছে আসে না। দিগম্বর চমকে উঠল। ধড়মড় করে উঠে বসে সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে মা?

প্রকাশকাকাকে বাড়ি যেতে বল। তাকে এখানে আর থাকতে দিও না।

অবাক হয়ে দিগম্বর জিজ্ঞাসা করল, কেন মা? তোমাকে কিছু বলেছে কি?

না, আমাকে বলেনি। তবে প্রকাশকাকা লোক ভাল নয়। বলেই শ্রেয়সী কেঁদে ফেলল।

দিগম্বর শ্রেয়সীর কথায় চিন্তিত। শ্রেয়সীও কিছু বলতে চায় না। অনর্থক একটা লোককে তাড়িয়ে দেবার বাহানা কেন করছে তা স্থির করতে না পেরে শ্রেয়সীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

আমার কথা শুনবে না?

আহা, বিনা কারণে কাউকে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত হবে। তুমি তো তার দোষটা বলবে।

শুনে কাজ নেই,—বলে শ্রেয়সী চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে গেল।

ভাবনায় ডুবে গেল দিগম্বর। পাকা উকিল, বুঝল কিছু ঘটেছে কিন্তু যুক্তি দিয়ে তা প্রমাণিত না হলে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ অমানবিক হবে।

সেদিন যদি উকিলের মন নিয়ে যুক্তির জাল বিছিয়ে শ্রেয়সীর প্রার্থনাটা অগ্রাহ্য না করত, শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের মন দিয়ে বিচার করত দিগম্বর তা হলে শ্রেয়সীর ভবিষ্যৎ এত ঘন অন্ধকারে ডুবত না। শ্রেয়সীও ভয়ঙ্কর ভুল করে সারা জীবন অনুশোচনায় দগ্ধে মরত না।

বিকেলবেলায় শ্রেয়সীকে কাছে ডেকে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিগম্বর বলল, তুমি যা বলেছ তা ভেবেছি। দেখি কি করা যায়। বিদায় কর বললেই তো একটা লোককে বিদায় করা উচিত হবে না। তার দোষগুণ বিচার করতে হবে। সত্যিই

সে দোষী কিনা তা যাচাই করতে হবে। প্রকাশের মত কাজের লোককে এক কথায় বিদায় করা ভাল হবে না মা। মানুষ ভুল করে। সেই ভুল সংশোধন করার সুযোগ দেওয়া উচিত। প্রকাশের বদলে একটা যোগ্য লোকও তো খুঁজে পেতে হবে। তুমি পড়তে যাও। আমি যা হয় একটা কিছু করব।

দিগম্বরের ভাবনার শেষ আর হয়নি। কিছু ঠিকও করতে পারেনি। প্রকাশের ওপর নজর রাখার প্রয়োজনও কখনও মনে করেনি। মাসের পর মাস কেটে যায়। বছরও প্রায় শেষ। শ্রেয়সীর দশম শ্রেণীতে উঠার পরীক্ষা সামনে। রাত জেগে পড়তে হয়। শেষে রাতে বাথরুমে যাবার সময় নজর পড়ল একটা অশরীরীর মত ছায়া চুপিচুপি তার মায়ের ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। শ্রেয়সী ভয় পেয়ে চিৎকার করে ওঠেনি। লোকটাকে সে চিনতে পেরেছিল। কয়েক মাস আগেই এই লোকটাকে এইভাবে চুপিচুপি মায়ের ঘর থেকে বের হতে দেখছে। বাবার কাছে অভিযোগ করেছিল কিন্তু কোন কথা খুলে বলতে পারেনি। অভিযোগ করলেও কোন লাভ হয়নি।

দিগম্বর প্রকাশ সম্বন্ধে নির্বিকার।

সেদিনের মত আজও স্পষ্ট প্রকাশকে দেখতে পেয়ে শ্রেয়সী ঘরের আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। বালিশে মুখ গুঁজে শ্রেয়সী খুবই কেঁদেছিল সে রাতে। নিজেকেই ধিক্কার দিয়েছে। একবার মনে হয়েছিল আত্মঘাতী হবার। সে সাহস তার ছিল না।

বাবাকে গিয়ে রাতের ঘটনা বলার সাহসও ছিল না। কেঁদেই তার মনের গ্লানি লাঘব করা ভিন্ন অন্য কোন পথ তার জানা ছিল না।

যতীন আজকাল কলেজে যায় না।

চাকরির খোঁজে ঘুরছে দরজায় দরজায়। সরকারি চাকরি পেতেই বেশি আগ্রহী। তার বাড়িতে বুভুক্ষু বিধবা মা আর দুটো ছোট ভাই। তাদের টাকা না পাঠালে অনশনে দিন কাটাতে হবে। এসব খবর পেয়ে যতীন ঘুরছে চাকরির খোঁজে। বার বার চিঠি দিচ্ছে তার মা কিন্তু যতীন নিরুপায়। কাকার কাছ থেকে কটা টাকা চেয়ে বাড়িতে পাঠিয়েছিল তারপর যে-কে-সেই। অবস্থার পরিবর্তন ঘটেনি।

কদিন থেকে যতীন আর বাইরে বের হয় না।

তার ঘরেই চুপ করে শুয়ে থাকে। আকাশপাতাল চিন্তা করে। কোন রকমে স্নান খাওয়া শেষ করে আবার প্রবেশ করে তার শোবার ঘরে। মাঝে

মাঝে শ্রেয়সী তার ঘরের সম্মুখ দিয়ে যেত। দেখতে পেত যতীন চুপ করে শুয়ে আছে। তার করুণ মুখটাও মাঝে মাঝে চোখে পড়ত। কেমন একটা মমত্বপূর্ণ সহানুভূতি জেগেছিল শ্রেয়সীর মনে কিন্তু তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করার ভরসা তার ছিল না। পরিচয়টা অতি ক্ষীণ। তাদের আশ্রিতজন, আত্মীয় কুটুম্ব নয়, স্বজাতি নয়। বোধহয় এই কারণেই যতীনকে করুণার পাত্র মনে করেছিল।

শ্রেয়সী ক্রমেই যতীন সম্বন্ধে আগ্রহী হয়ে উঠল।

কদিন ধরেই শ্রেয়সী লক্ষ্য করেছে যতীন সারাদিন দরজা ভেজিয়ে শুয়ে রয়েছে। একদম বাইরে বের হয় না। বামুন ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করেছিল, প্রকাশকাকার ভাইপো আজকাল খেতে আসে কি?

আসে দিদিমণি। সময়মত আসে না।

পড়াশোনা করে?

তা তো জানি না। আগে কলেজে যাবার তাড়া ছিল। এখন বোধ হয় কলেজ ছুটি।

শ্রেয়সী এর বেশি জানতে চায়নি।

একদিন দুজনের মুখোমুখী হতেই শ্রেয়সী জিজ্ঞেস করল, তুমি কলেজ যাও না?

যতীন কোন উত্তর না দিয়ে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল।

শ্রেয়সী পেছন থেকে জিজ্ঞেস করল, তুমি তো এখানে আছ পড়াশোনা করতে।

যতীন ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, চাকরির চেষ্টা করছি।

পড়াশোনা শেষ হয়নি। কোথায় চাকরি পাবে?

কেউ তো দিচ্ছে না। চেষ্টা করছি। চাকরি না পেলে আমার মা আর ভাইয়েরা শুকিয়ে মরবে। তাদের চিঠি পাচ্ছি আর অস্থির হয়ে উঠছি। পড়তে মন বসছে না, কলেজের মাইনেও দিতে পারিনি। কোথায় টাকা পাব সেই চিন্তাই আমাকে পাগল করে তুলেছে।

তুমি পড়া ছেড় না। কত টাকার দরকার?

যতীন কোন রকমে বলল, পঞ্চাশ টাকা হলে এখন চলে যাবে।

তোমার কাকাকে বলেছ কি? আমার বাবাকে? কাউকে বলনি। টাকা কি আকাশ থেকে তোমার পকেটে এসে ঢুকবে। চাকরির চেষ্টা করলেই সহজে চাকরি পাওয়া যায় না। এ তো বুঝেছ। টাকার ধান্দায় না থাকলে টাকাও পাওয়া যায় না।

চোখ পাকিয়ে গুরুগম্ভীর স্বরে কথা শেষ করে শ্রেয়সী ভেতর-বাড়িতে চলে গেল। আশ্রয়দাতার কন্যার কঠোর মন্তব্যে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গেল যতীন।

পরদিন পঞ্চাশ টাকা হাতে করে এসে শ্রেয়সী বলল, এই নাও টাকা। এবার পড়াশোনায় মন দাও। টাকার দরকার হলে আমাকে বলবে। লজ্জা পেও না।

যেমন দ্রুতবেগে শ্রেয়সী এসে বিছানার ওপর টাকা কটা ফেলে দিয়েছিল তেমনি দ্রুতবেগে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল যতীন।

কোন কথা বলবার সুযোগও পেল না, বলার সাহসও তার ছিল না।

সামান্য থেকেই বড় বড় ঘটনা ঘটে।

অতি সামান্য এই ঘটনার পেছনে আরও গুরুতর ঘটনা অপেক্ষা করছিল। সে সম্বন্ধে না ছিল শ্রেয়সীর কোন জ্ঞান না ছিল তার পরিবারের কোন লক্ষ্য।

অঘটন ঘটনার বীজ রোপিত হল পরোপকারবৃত্তির মাঝ দিয়ে। অঘটনই ঘটেছিল বিপুল আকারে। এর দায়িত্ব ও বিষফল শ্রেয়সী, যতীন, নিভাননী ও দিগম্বরকে সমান ভাগ করে নিতে হয়েছিল পরবর্তী জীবনে। যে করুণা ও দাক্ষিণ্যের ছায়াতে শ্রেয়সী ও যতীনের পরিচয় সেই ছায়া বিস্তারলাভ করে যখন কায়াতে পরিণত হল তখন ফিরে যাবার কোন পথ আর উন্মুক্ত ছিল না।

নিভাননীর ঘরে প্রকাশের গোপন অভিসার তারুণ্যের মুখোমুখি হয়ে শ্রেয়সীর মনে যে সামান্য যৌনচিন্তা জেগেছিল তাকে বাস্তবরূপ দেবার গোপন আকাঙ্ক্ষাই যতীনকে কাছে টেনে নেবার উৎকট লালসার জন্ম দিয়েছিল শ্রেয়সীর মনে। প্রণয়-বন্ধনের যে স্পৃহা তা ক্রমেই গভীর থেকে গভীরতম হতে থাকে। প্রণয়ের মোহ যতীনকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি, সে ভেবেছে শ্রেয়সীকে করায়ত্ত করলে অর্ধেক রাজ্য ও রাজকন্যা লাভ নিশ্চিত। শ্রেয়সী যেমন যতীনের অর্থের প্রয়োজন মেটাতো তেমনি গোপনে উভয়ের সান্নিধ্য নতুন জীবনের স্বপ্নও দেখাত।

শ্রেয়সী সম্বন্ধে অনেক কিছু জানত মন্দাকিনী। তার প্রথম জীবনের ঘটনাগুলো এইভাবে বিবৃত করে বলল, প্রেয়সী-সমাচারের মূল নাটকের গোড়াপত্তন ঘটেছিল এইভাবে। পরবর্তী ঘটনা তোমার সমাজবোধে আঘাত করলেও যা ঘটেছিল তা সত্য এবং কঠোর।

মন্দাকিনী আবার বললেন, সকালবেলায় দাসী অনন্তবালা শ্রেয়সীর ঘর খোলা দেখে উঁকি দিয়ে দেখল। ঘরে শ্রেয়সী নেই। পড়ার বইগুলো বিছানার এক ধারে গাদা করে রাখা। অনন্তবালা মনে করল দিদিমণি হয়ত বাথরুমে গেছে। না, কোথাও নেই!

কোথাও শ্রেয়সীকে না পেয়ে অনন্তবালা ছুটে গেল দিগম্বরের কাছে। মনিবকে

খবরটা দেওয়া উচিত। তার কাছে ছুটে গিয়ে বলল, বাবু, দিদিমণি কোথাও গেছে কি ?

কেন ? তার ঘরে নেই ?

না। আপনাকে বলে গেছে কি ?

না তো। এত সকালে সে যাবেই বা কোথায় ! সব জায়গা দেখেছ কি ?

হ্যাঁ।

দিগম্বর চমকে উঠল।

কোন কিছু স্থির করতে না পেরে প্রকাশকে ডেকে পাঠাল।

প্রকাশ এসে দাঁড়ানো মাত্র দিগম্বর বলল, শ্রেয় নাকি বাড়িতে নেই। কিছু না বলে তো কোথাও সে বাড়ির বাইরে যায় না। একটু খোঁজ কর।

বামুনঠাকুর চা-জলখাবার দিতে গিয়ে ফিরে এসে বলল, যতীনবাবুও ঘরে নেই। তার ঘরে কোন জিনিসপত্র নেই। কোথাও চলে গেছে নিশ্চয়ই।

দিগম্বর উকিল সারাজীবন ফৌজদারী মামলা করেছে, ফাঁসীর আসামীর গলার দড়ি খুলেছে, এতকাল বাইরের মানুষের কথা ভেবেছে, কোনদিন ঘরের দিকে তাকাবার অবসর পায়নি তবুও যখনই শুনল যতীনও বাড়ি ছেড়ে বলে গেছে তখন বাস্তবটা চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল। যতীন প্রকাশের আত্মীয়। শ্রেয়সীর অনুরোধ শুনে যদি প্রকাশকে বিদায় করে দিত তাহলে এত বড় দুর্ঘটনাটা নিশ্চয়ই ঘটত না। ধুঁয়ো দেখে আগুনের সম্ভাবনা তার কচি মেয়েটা বুঝেছিল অথচ সে নিজে বুঝতে পারেনি, এটাই আশ্চর্য। নিভাননীর সঙ্গে কোন আলোচনা না করেই সোজা চলে গেল থানায়।

তিন দিনের ব্যবধানে পুলিস এসে খবর দিল বনগাঁ সীমান্তে যতীন আর শ্রেয়সীকে পুলিস আটক করেছে। বনগাঁ আদালতের নির্দেশে আগামীকাল তাদের কলকাতার আদালতে হাজির করা হবে।

কদিন প্রকাশের সাক্ষাৎ পায়নি কেউ।

সে কখন আসে কখন যায় তা কেউ বলতে পারছিল না।

প্রকাশ আত্মগোপন করে নিভাননীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে। নিভাননী তাকে আশ্বাস দিয়েছে এই হাঙ্গামা সে যে কোন প্রকারে মিটিয়ে দেবে। যতদিন হাঙ্গামা না মেটে ততদিন প্রকাশ যেন এই বাড়ির সীমানায় না আসে।

আট দশ বছর পর হঠাৎ নিভাননী উপস্থিত হল দিগম্বরের শোবার ঘরে। দিগম্বর কিছুক্ষণ স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বিস্ময়ের ভাব কাটবার আগেই

নিভাননী বলল, সব শুনলাম। যতীনকে জেলে পাঠিয়ে তোমার মেয়ের ইজ্জত কি বাড়াতে পারবে ?

নিভাননীর অযাচিত এই প্রশ্নে দিগম্বর ঘাবড়ে গেল। সে কিছু বলার আগেই নিভাননী আবার বলল, কেলেঙ্কারী বাড়তে দিও না। দুজনকে খালাস করে নিয়ে এসে বিয়ে দাও। হাঙ্গামাও মিটবে, মান রক্ষাও হবে।

দিগম্বর হাঁ না কিছুই বলল না।

আমার যা বলার বললাম, তোমার যা করার তা করবে। বলেই নিভাননী ফিরে গেল। প্রকাশকে সে বলেছিল কিছু বিহিত করবেই কিন্তু দিগম্বরের নীরবতা তাকে উৎসাহিত করতে পারেনি। মনে মনে গজরাতে গজরাতে সে ফিরে গিয়েছিল।

বিকেল বেলায় দিগম্বর আদালত থেকে মেয়ের জামিন হয়ে ছাড় করে আসলেও যতীন থেকে গেল পুলিস হাজতে। নাবালিকা অপহরণের কঠিন শাস্তি ঝুলছিল যতীনের ভাগ্যে। লোক মারফত প্রকাশ যতীনকে ছাড়াবার চেষ্টা করলেও তা হাকিম অগ্রাহ্য করেছিল। শ্রেয়সী বাড়ি এসে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়েছিল।

সব কিছু লক্ষ্য করে নিভাননী সন্ধ্যাবেলায় গুটি গুটি পায়ে দিগম্বরের ঘরে এসে বলল, কিছু ঠিক করলে ?

কিসের ?

যতীন আর শ্রেয়র কি করবে ? তুমি কি চাও যতীন জেল খাটুক আর তোমার মেয়ের কপালে সতীর ছাপ দিয়ে ঘরে পুষবে।

দিগম্বর গম্ভীরভাবে বলল, কোনটা চাই আর কোনটা চাই না সেটা বড় প্রশ্ন নয়, শ্রেয়সীর মত মেয়েকে যতীনের মত ছেলের হাতে তুলে দিতে পারব না। যতীন বেইমান, অসদাচারী, বিশ্বাসঘাতক, ওর শাস্তি হওয়া উচিত। এ শ্রেণীর মানুষ সমাজে স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করলে আরও অনেক দুর্ঘটনা ঘটাবে। আর যতীন আমার মেয়ের প্রতি সুবিচার করবে, সুখে ঘর সংসার করবে এটাই বা কেমন করে বিশ্বাস করব।

এতে কারও কি কোন লাভ হবে ?

লাভ লোকসানের হিসাবটা তো সামনেই রয়েছে। সারাজীবন লাভের হিসাব করেছি। কাগজ কলম অনেক খরচ হয়েছে। হিসাবের যোগফল তো দেখলাম শূন্য। আমার মেয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাকে কার্যপদ্ধতি স্থির করতে দাও।

এ বিষয়ে তোমার মতামতকে সম্মান করতে পারলাম না।

যা ভাল বোঝ কর। এতে তোমার মাথা নীচু হবে সেটাও ভেবে দেখ।

প্রকাশ আর নিভাননী এবিষয়ে গোপনে শলা পরামর্শ করতে থাকে। দিগম্বরকে রাজি করতে না পারলে যতীনের কয়েক বছরের নির্ঘাত জেল হবে। আর শ্রেয়সী? দিগম্বরের অর্থের অভাব নেই, কোন রকমে কোন প্রতিষ্ঠিত পাত্রের হাতে তুলে দেবে। হয়ত সারাজীবনটা সে হয়ে রইবে নিজের জীবনের ও পরিবারের সমস্যা। নিভাননী হাল ছেড়ে দেবার মত মহিলা নয়। শেষ চেষ্টা করবে। স্থির করে পরের দিন আবার হাজির হল দিগম্বরের ঘরে। বিনা ভূমিকায় বলল, শুনলাম শ্রেয়কে ডাক্তারের সামনে হাজির হতে হবে।

আইন তাই নির্দেশ দিয়েছে।

সেখানে কত নোংরা ঘটনা ঘটবে তা জান?

জানি।

কত নোংরা প্রশ্ন করবে জান?

জানি।

জেনেও তুমি তোমার মেয়ের ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে কলঙ্কের ছাপ দিতে চাও? সারাজীবন তাকে কলঙ্ক বয়ে বেড়াতে হবে। যতীন বেকার কিন্তু ছেলে তো খারাপ নয়। সব সমস্যা মিটিয়ে দিতে পার তাদের দুজনকে এক জায়গায় করে বিয়ে দেওয়া।

দিগম্বর আইনের বইয়ের পাতা উল্টাতে উল্টাতে বলল, আমাকে ভেবে দেখতে দাও।

নিভাননী বুঝল বরফ গলতে আরম্ভ করেছে।

কয়েকদিন পর দিগম্বর হাজির হল নিভাননীর ঘরে।

নিভাননী উঠে বসতেই দিগম্বর বলল, আজ যতীনকে খালাস করে এনেছি। কোন হৈ-হাঙ্গামা না করে আগামীকাল রাতেই শ্রেয়সীর সঙ্গে যতীনের বিয়ের ব্যবস্থা কর। তবে একটি সর্ত রইল। শ্রেয়সী সবে পনর পেরিয়েছে, যতদিন তার আঠার বছর পূর্ণ না হবে ততদিন শ্রেয়সী আমাদের কাছে থাকবে আর যতীন এই বাড়িতে আসবে না।

নিভাননী কিছুক্ষণ মুখ নীচু করে ভেবে বলল, বেশ তাই হবে।

বিনা আড়ম্বরে শ্রেয়সীর সঙ্গে যতীনের বিয়ে হয়ে গেল। দুচারজন অতি পরিচিতজন ভিন্ন কাউকেই ডাকা হয়নি। নহবৎ বাজেনি, স্ত্রী-আচারের হাঙ্গামা ছিল

না। পুরুত মন্ত্রপাঠ করল, নিভাননী কন্যাদান করল। বাসরে কোন বন্ধুবান্ধবের ভীড় ছিল না, আলোর ঝলকানি ছিল না, ভোজের ব্যাপারও অতি সংক্ষিপ্ত।

বিয়ের পরের দিনই দিগম্বর প্রকাশকে ডেকে বলল, তোমাকে অন্য কোথাও কাজ খুঁজে নিতে হবে। তোমাকে রাখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তুমি যতীনকে নিয়ে আজই আমার বাড়ি ছেড়ে যাও। যতীন অবশ্য আসবে, তবে তিন বছর পর। এই তিন বছরে তাকে তৈরী হতে হবে শ্রেয়সীর যোগ্য করতে। টাকা পয়সার দরকার হলে তা আমি দেব কিন্তু আমার বাড়িতে তার থাকা চলবে না।

এই পরিণতির জন্য প্রকাশ প্রস্তুত ছিল না। দিগম্বরের নির্দেশ শুনে চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পেছন থেকে দিগম্বর ডেকে বলল, আমার সেরেস্তার কাগজপত্র সব বুঝিয়ে দিও সমীরকে আজই। সমীর জগৎবাবুর মুহুরী। সেই-ই আজ থেকে আমার কাজ করবে। তোমার কিছু প্রাপ্য গণ্ডা থাকলে তা বুঝে নিও, মক্কেলদের টাকা পয়সার হিসাব দিয়ে যেও।

প্রকাশ মাথা নীচু করে বলল, আজ্ঞা।

পরদিন সকাল বেলায় যতীন আর প্রকাশকে আর দেখা গেল না। তারা ভোর বেলায় তল্পীতল্পা বেঁধে অন্য কোথাও চলে গেছে। কোথায় গেছে তা জানার চেষ্টাও করল না দিগম্বর।

শ্রেয়সী রয়ে গেল তার বাবার কাছে।

মানসিক স্থিরতা ফিরে পেতে বেশ কয়েকদিন কেটে গেল। দিগম্বর কিছুতেই সুস্থির হতে পারছিল না। শ্রেয়সীর বিয়ের পরদিন থেকে নিভাননীকেও আর দিগম্বরের ঘরে দেখা যায়নি। নিভাননীর চেষ্টাতে বিয়েটা ঘটলেও তার ভূমিকা ছিল নগণ্য।

কদিন পরে শ্রেয়সীকে কাছে ডেকে দিগম্বর বলল, চোখের নেশা বড় খারাপ নেশা। মানুষ চোখের নেশায় ভয়ঙ্কর ভুল করে বেটি। ভালমন্দ বিচার করার ক্ষমতা তখন থাকে না। কালোকেও মানুষ মনে করে অতি সুন্দর। আবার অতি সুন্দর ও কুৎসিত মনে করে নেশাগ্রস্ত মানুষ। তবে যা হয়েছে তা তো ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। ভুল করেছিস, সংশোধন করার পথ তো বন্ধ তবুও আমি চেষ্টা করব তোকে যেন কোন সময় কষ্ট পেতে না হয়। চাঁপাতলায় বাড়িটা তোর নামে লিখে দিয়েছি। কোন সময় আর্থিক কষ্ট হলে ওই বাড়ির ভাড়ায় তোর জীবিকা চলে যাবে।

বলতে বলতে থেমে গেল দিগম্বর। মাথা নীচু করে বাঁ হাত দিয়ে নিজের কপাল টিপতে টিপতে বলল, মাঝে মাঝেই মাথার যন্ত্রণা অনুভব করছি।

মৃদুকণ্ঠে শ্রেয়সী বলল, ডাক্তার দেখাওনি?

দেখাব। তবে কি জানিস শ্রেয়, তোর ভুলের জন্য আমার দায়িত্বও কম নয়। তুই যেদিন প্রকাশকে তাড়িয়ে দিতে বলেছিলি সেদিন যদি তোর কথা শুনতাম তাহলে এত বড় ভুল করার সুযোগ সৃষ্টি হত না। এই ভুলের মাশুল কিভাবে যে তোকে দিতে হবে তা চিন্তা করছি আর আমার বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠছে। যদি সেইদিনই প্রকাশকে বিদায় করে দিতাম তাহলে তোকে যতীনের খপ্পরে পড়তে হত না। নিজের জীবন দিয়েই পরখ করেছি একটা ভুল করলে কত বেশি অনাসৃষ্টির জন্ম হয়। কতটা ভুল করলে কতটা শাস্তি পেতে হয় তা আমার মত তো অন্য সবাই জানে না। তবুও তোকে সমাজের হাত থেকে বাঁচাতে এই বিয়েতে সম্মতি দিতে হয়েছে।

শ্রেয়সী কোন উত্তর না দিয়ে মাথা নীচু করে বসেছিল।

দিগম্বর আবার বলল, যতীনকে বলেছি তুই সাবালিকা না হওয়া অবধি যেন এই বাড়িতে না আসে। এদিকে তুই নজর রাখিস। প্রকাশকে বিদায় করলাম কিন্তু সময়মত তা করলে এমন অঘটন নিশ্চয়ই ঘটত না। তবে আমরা তো ভাগ্য বলেই মেনে নিয়েছি। প্রকাশের পাওনাগণ্ডা পাই পাই করে বুঝিয়ে দিয়েছি। সে আর আসবে না কিন্তু যতীন তো আসবে। তোর পড়াশোনা যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিস।

মৃদুস্বরে শ্রেয়সী বলল, আচ্ছা।

আচ্ছা যদি 'ভাল' হয় তবে এই ব্যবস্থা মোটেই ভাল হয়নি। অন্তত দিগম্বর উকিলের পরিবারে এটা অকল্পনীয় ঘটনার সূচনা।

প্রকাশ চলে গেছে ঠিকই কিন্তু কদিন পর দেখা গেল নিভাননা তার সব কিছু সম্বল নিয়ে বাড়ি ছেড়ে কোথাও চলে গেছে।

খবরটা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল দিগম্বর। তার উকিলী বুদ্ধি ভোঁতা করে প্রকাশ আর নিভাননী ঘর বাঁধতে চলে গেছে। এত দিনে সম্যকভাবে উপলব্ধি করল কেন শ্রেয়সী চেয়েছিল প্রকাশকে বিদায় করতে। মায়ের অনাচারের কথা মুখ ফুটে বলতে পারেনি কিন্তু অনর্থের মূলকে উৎপাটিত করার চেষ্টা ছিল শ্রেয়সীর। সারা জীবনে অনেক বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে অনেক খুনীকে নির্দোষ সাব্যস্ত করেছে কিন্তু একটা বালিকার সাধারণ সাংসারিক বুদ্ধির কাছে তাকে হার মানতে হল,

অনুশোচনায় দিগম্বর ভারসাম্য রক্ষা করতে পারছিল না। বালিকার বুদ্ধির তুলনায় সে নিজে কতটা নির্বোধ তা বুঝতে পেরে গুম হয়ে বসে রইল।

বিকেল বেলায় বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে। অনেক রাতে টলতে টলতে ফিরল বাড়িতে। নতুন অধ্যায় শুরু হল তার জীবনে।

খবর পেয়ে শ্রেয়সী ছুটে এল। বাবাকে অপ্রকৃতিস্থ দেখে ডুকরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, একি করেছ বাবা, এমনভাবে সর্বনাশ ডেকে আনছ কেন?

শ্রেয়সীর গলার শব্দে বেহুঁস দিগম্বর হুঁস ফিরে পেল। শ্রেয়সীর কাঁধে হাত রেখে কিছুক্ষণ অপলকে তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বিড়বিড় করে বলল, আদালতে ফাঁসির আসামীকে খালাস করেছি অথচ আজ নিজের ফাঁসির দড়ি গলায় পরেছি রে শ্রেয়। তোরও সর্বনাশ করেছি। তোর মায়ের সর্বনাশ করেছে প্রকাশ, আর আমি সর্বনাশ ডেকে আনছি বাঁচার জন্য। না থাক, তুই যা।

সেই রাত থেকে দিগম্বর আর ভেতর-বাড়িতে যেত না।

বৈঠকখানার আরাম-কেদারায় গা এলিয়ে দিয়েই রাত কাটাত।

রাতের বেলায় মক্কেলরা বিদায় হলে মদের বোতল নিয়ে বসে।

শ্রেয়সী দেখে, শোনে অথচ প্রতিবাদ করতে পারে না।

নিজের ত্রুটির সম্বন্ধে শ্রেয়সী সজাগ ও ভবিষ্যতের জন্য আতঙ্কিত। যতীন ওই প্রকাশের ভ্রাতুষ্পুত্র, প্রকাশের চরিত্রের ছাপ যতীনের চরিত্রেও থাকাই সম্ভব।

মাসের পর মাস কেটে যায়। কোথাও কোন পরিবর্তন ঘটেনি।

সংসারে নিভাননীর উপস্থিতি ছিল নগণ্য, তার গৃহত্যাগের পর সেই কারণে কারও মনে কোন ছায়াপাত করেনি। ঠাকুর, চাকর, আয়া ইত্যাদি নিয়েই দিগম্বরের যেমন সংসার ছিল তেমনি সংসার চলছিল। নেপথ্যে আরেকটি দুর্ঘটনার বীজ রোপিত হচ্ছিল সেটা সবার দৃষ্টি এড়িয়ে গেলেও শ্রেয়সীর দৃষ্টি এড়ায়নি। যাকে ঘিরে এই দুর্ঘটনার ইঙ্গিত সে হল বিজয়। বাল্যকাল পেরিয়ে বিজয় কৈশোরের দুয়ারে কিন্তু তার আচার-আচরণে কোন মতেই সুস্থ ভবিষ্যৎ জীবনের লক্ষণ ছিল না। শ্রেয়সীর ভালবাসা ও শাসন কোনটাই বিজয় সহ্য করতে পারত না। সব সময় কি যেন ভাবে, স্কুলে যায়। গৃহশিক্ষক ভিন্ন কেউ জানে না তার পাঠ্যবিষয়ে কতটা অগ্রগতি ঘটেছিল।

পড়ার বিষয় শ্রেয়সী কখনও জিজ্ঞাসা করে না। নিভাননীর গৃহত্যাগের পর তারও পড়াশোনা বন্ধ। বিজয়কে কোন কথা বললেই সে তার বয়সের অনুপযুক্ত চড়াচড়া কথা শোনায়, শ্রেয়সী কষ্ট পায়, কাউকে মনের কথা বলতেও পারে না।

মাঝে মাঝে যতীন প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বিজয় কটু কথাও বলে, মায়ের সম্বন্ধে বাইরে যে সব রুচিহীন কথা শুনে আসে তাও বলে। শ্রেয়সী মরমে মরে যায় কিন্তু সে নিরুপায়।

আর দিগম্বর!

সকাল সন্ধ্যায় মক্কেল নিয়ে ব্যস্ত থাকে। রাতের বেলায় তার চেম্বারের ইজিচেয়ারেই ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমোবার আগে তার অসংযত পদক্ষেপ দেখে কেউ তার সান্নিধ্যে যায় না। চেম্বারেই খাওয়াদাওয়া ঘুম, ভুলেও কখনও অন্দর বাড়িতে পা দেয় না।

বছর পেরিয়ে গেছে।

শ্রেয়সী মাঝে মাঝে যতীনের চিঠি পায়। উত্তরও দেয়।

শ্রেয়সীর বক্তব্য, অপেক্ষা করতে হবে।

যতীনের বক্তব্য, আর কত দিন?

শ্রেয়সী জবাব দেয়, বাবা যতদিন সম্মতি না দিচ্ছে ততদিন।

যতীন ধৈর্য হারালেও শ্রেয়সী ধৈর্য হারায়নি।

সুখবর দিয়েছে যতীন। সে ছোটখাটো একটা সরকারী চাকরি পেয়েছে। এবার তার স্ত্রীপালনের ক্ষমতা হয়েছে। এবার শ্রেয়সী ইচ্ছা করলে পালিয়ে যেন আসে। সংসার গড়তে চায়, সংসার চালাবার ক্ষমতা তার আছে।

শ্রেয়সী জবাব দিয়েছে খুশী মনেই, বাবাকে এভাবে রেখে পালিয়ে যেতে পারব না। আরও এক-আধ বছর হয়ত এইভাবেই কাটাতে হবে। বাবার সম্মতি লাভের চেষ্টা করছি। যদি সম্মতি পাই তা হলে তুমি-ই আসতে পারবে আমাদের এখানে।

এক-আধ বছর কাটাতে হয়নি তাদের।

একদিন সকালে দিগম্বরকে চা দিতে এসে দেখল টেবিলের কোনায় মাথা রেখে দিগম্বর শক্ত হয়ে বসে আছে।

শ্রেয়সী ডাকল, বাবা।

কোন জবাব নেই।

এগিয়ে গিয়ে গায়ে ধাক্কা দিল।

একি! দেহটা একদম শীতল! চমকে উঠল শ্রেয়সী।

চিৎকার করে উঠল শ্রেয়সী।

ঝি-চাকর-ঠাকুর ছুটে এল। ডাক্তার ডাকা হল। কিন্তু সব শেষ। প্রাণের

কোন লক্ষণই ছিল না।

দিগম্বর দেহরক্ষা করল। পরিবেশের জটিল সমস্যাগুলো যেমন ছিল তেমনি থেকে গেল। জীবনের স্থিতিকাল যে কত অবিশ্বাস্য তা দিগম্বর নিশ্চয়ই জানত অথচ সমস্যা সমাধানের পথ না খুঁজে সমস্যাগুলো জিইয়ে রেখেই দিগম্বর বিদায় নিয়েছিল। হঠাৎ এই মৃত্যু শোকাবহ হলেও মৃত্যু তাকে মুক্তি দিল আশীর্বাদের মত। আরও কিছুকাল যদি সে বেঁচে থাকত তা হলে হয়ত তাকে আত্মহত্যা করতে হত।

পারলৌকিক সব কিছু শেষ।

নিভাননী খবর পেয়েও আসেনি।

এই অসময়ে সুযুক্তি দেবার মত লোক একজনকেও না পেয়ে শ্রেয়সী যতীনকে ডেকে পাঠাল।

স্বামী-স্ত্রীর যৌথজীবনেরও এটাই সূত্রপাত। কতটা মনোরম তা বলা কঠিন তবে উইলের বয়ান শুনে যতীন যে মোটেই খুশী হয়নি তা ক্রমেই প্রকাশ পেতে থাকে তার আচার-আচরণে।

য়্যাটর্নি বাড়ি থেকে ডাক পেয়ে যতীন ও শ্রেয়সী দুজনেই গেল। য়্যাটর্নি দত্তসাহেব উইল পড়ে শ্রেয়সীকে বলল, দিগম্বরবাবু মৃত্যুর পূর্বে যে উইল করে গেছে তাতে স্থাবর অস্থাবর সকল সম্পত্তি দিয়ে গেছে। তোমাকে আর বিজয়কে মানুষ করে গড়ে তোলার দায়িত্ব দিয়েছে তোমাকে। বিজয় সাবালক হলে এবং সৎপথে চললে তুমি তোমার অংশ থেকে ইচ্ছা করলে কিছু অংশ বিজয়কে দিতে পার। বিজয়ের কোন দাবী থাকবে না তার বাবার সম্পত্তিতে। তাকে দেওয়াটা তোমার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করবে।

যতীন মনে মনে খুশী হলেও কার্যকালে দেখা গেল এই উইল তাদের যৌথ-জীবনে ঘুণ ধরিয়েছিল। শ্রেয়সী বুঝতে পেরেছিল দিগম্বরের সম্পত্তি যদি যতীনের হাতে যায় তাহলে তার বুভুক্ষু আত্মীয়স্বজন এসে ঘাড়ে বসবে। সেজন্য দত্তসাহেবের সঙ্গে পরামর্শ না করে কোন কাজই করত না।

য়্যাটর্নি দত্তসাহেব উইলের প্রোবেট নেবার ব্যবস্থা করে শ্রেয়সীকে চুপিচুপি বলেছিল, তোমার বাবা আমাকে বলেছিলেন, দেখ দত্তসাহেব, হতভাগা যতীনের হাতে যেন সম্পত্তি না যায় তা হলে আমার মেয়ে পথে বসবে! সেজন্য আমাকে নজরে রাখতে বলেছিল। দিগম্বর বলেছিল, তার সংসার ভেঙেছে যতীন আর প্রকাশ। এদের কোনমতে তুমি ও শ্রেয়সী প্রশ্রয় দিও না। যাইহোক, তোমার

কোন অসুবিধা হলে আমার কাছে আসবে। আমিও বৃদ্ধ হচ্ছি, কতদিন তোমাকে সাহায্য করতে পারব তা ভগবান জানেন।

শ্রাদ্ধশান্তি মিটল।

যতীন এসে বসল দিগম্বরের বাড়িতে।

এবার তার ক্ষমতা জাহির করার সুযোগ এসেছে। প্রথমেই পুরনো ঝি-চাকর-ঠাকুরকে একে একে বিদায় করে দিল।

শ্রেয়সী প্রতিবাদ করল।

রাঁধুনী ছাড়িও না। আমি রান্না করতে পারব না। উনুন দেখলেই আমার ভয় করে।

যতীন চোখ পাকিয়ে বলল, আমার ক্ষমতা অনুসারে তোমাকে চলতে হবে। তোমার বাবার অনেক আছে, আমার বাবার তো নেই। তোমার বাবার সম্পত্তি ভোগ করতে আমি আসিনি। আমার বউ আমার ক্ষমতার মধ্যেই সব কিছু চালিয়ে নেবে। এটাই আমি চাই। তোমার বাবা আমাকে বিশ্বাস করত না, দত্তসাহেবকে অভিভাবক করে গেছে আমাকে জব্দ করতে।

শ্রেয়সী কোন উত্তর না দিয়ে নিজের কাজে গেল। এই প্রথম বুঝতে পারল কোথায় কাঁটা ফুটেছে। দিগম্বরের হিসাবে অনেক ভুল হলেও মরার আগে যে উইল করে গেছে সেটা যে নিরর্থক নয় তা বুঝবার মত জ্ঞান বুদ্ধি শ্রেয়সীর জন্মেছে।

জীবনে কোনদিন শ্রেয়সী রান্নাঘরে ঢোকেনি। যতীনের তাড়নায় তাকে অফিসের ভাত দিতে রান্নাঘরে ঢুকতে হল। পুরনো দিনের ঝি যামিনী বলল, দিদিমণি, তুমি বেরিয়ে এস, আমি সব করে দিচ্ছি। যতীন যদি জুলুম করে আমি তার উত্তর দেব।

শ্রেয়সী বলল, তোমাকে তো কাজ করতে নিষেধ করেছে।

করলেই হল! আমি কি তোমার কাছে মাইনে চেয়েছি, না খেতে চেয়েছি। আমি সকালে বিকেলে রান্নাটা করে দেব।

যামিনীর মুখের কাছে যতীন দাঁড়াতে পারেনি। তাকে তাড়াতেও পারেনি অথচ যামিনীকে সহ্য করতেও পারছিল না। একদিন সামান্য ত্রুটির জন্য যামিনীকে বেধড়ক পেটালো যতীন। শ্রেয়সী যতীনের এই আচরণে বিস্মিত হল, ভীত হল। বাধা দিতে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে শ্রেয়সী অবাক হয়ে গেল। যতীনের অতীতের সেই চেহারা কোথায় যেন হারিয়ে গেছে, শ্রেয়সী ভাল করেই বুঝল,

তার সাধের সংসার সাজানো সুকঠিন হবে। হয়ত নরককুণ্ডে পরিণত হতে পারে নিকট ভবিষ্যতে।

যামিনীর দুরবস্থা ও নাজেহাল হতে দেখে শ্রেয়সী প্রতিবাদ করা তো দূরের কথা, যতীনকে ভয়ঙ্কর ভয় করতে থাকে। চুপ করে থাকা ভিন্ন অন্য কোন পথ জানা ছিল না তার।

দিগম্বর বলেছিল, চোখের নেশা বড় খারাপ নেশা।

এই খারাপ নেশা যে তাকে টেনে কোথায় নামিয়েছে এবং কোথায় নামাতে পারে তা স্থির করতে পারছিল না শ্রেয়সী। গোপনে চোখের জল মোছা বিনা আর কি থাকতে পারে। তার অতি নিকট জন এমন কেউ ছিল না যাকে হিতাকাঙ্ক্ষী মনে করে মনের কথা বলতে পারে।

বিজয় বড়ই ছোট। সংসারের কিছুই সে বোঝে না। বোঝবার মত ক্ষমতাও তার ছিল না। নিজের মনের দুঃখ তাকে বললে সেও কোন উপায় খুঁজে পাবে না।

বছর না ঘুরতেই শ্রেয়সীকে যেতে হল হাসপাতালে, ফিরে এল একটি মেয়েকে বুকে করে।

থাক্। তবুও একটা সঙ্গী পাবে শ্রেয়সী।

যতীনের হাত থেকে রেহাই পাবে কি ?

যে লোকটা একটা প্রৌঢ়া দাসীকে বিনা কারণে অমানুষিক প্রহার করতে পারে তার অসাধ্য কাজ কিছুই থাকতে পারে না। এ বিশ্বাস ছিল শ্রেয়সীর। গর্ভাবস্থায় সব সময়ই সে সতর্ক থাকতো হয়ত যতীন তার গর্ভপাত ঘটাতেও পারে। সে জন্য কোন সময় যতীনের সঙ্গে কোন আলোচনাতে যেত না, কোন উঁচু গলায় কথা কইত না। কেবল দিন গুণত, কবে সে মায়ের সম্মান লাভ করবে।

যামিনী কিন্তু চুপ করে থাকেনি। সে শ্রেয়সীর মানসিক অবস্থা বুঝেছিল। যতীনকে কঠিনভাবে বাধা না দিলে যতীন ভবিষ্যতে আরও নিম্নস্তরের কাজ করবে। যামিনী কোন কথা না বলে সোজা গিয়েছিল থানায়।

পুলিস তাকে সোজা আদালত দেখিয়ে দিল। আদালতের আশ্রয় নিল যামিনী।

যতীন সমন পেল। সমন পেয়েই শ্রেয়সীর সামনে কাগজটা খুলে ধরে বলল, এই ছাখ্ তোদের পেয়ারের ঝির কাজ। মাগী আমার নামে আদালতে নালিশ করেছে।

আজ প্রথম প্রতিবাদ করল শ্রেয়সী, বলল, তুই তোকারি করছ কেন ? আমি কি বাড়ির ঝি না চাকর ?

যতীন ক্ষিপ্তের মত বলল, থাম মাগী, তোরা হলি ঝিয়ের জাত। তোদের হুজুর হুজুর করতে হবে বুঝি!

শ্রেয়সী যতীনের চেহারা ও কথা শুনে থমকে গেল। কথা বাড়াতে সাহস পেল না।

যতীন গজরাতে থাকে।

শ্রেয়সী যামিনীর সঙ্গে গোপনে দেখা করে কিছু টাকা তার হাতে গুঁজে দিয়ে যতীনের হয়ে মাপ চেয়ে অনুরোধ করল মামলা তুলে নিতে।

যামিনীর গায়ের ব্যথা, মনের ঝাল তখনও মেটেনি। সেও গজর গজর করে বলল, সেটি হবেনি দিদিমণি। তোমার সোয়ামীকে সামলাও, আমি হেস্তনেস্ত না করে ছাড়বনি।

শ্রেয়সী চোখ মুছতে মুছতে বলল, মাসী, ওকে মাপ করে দাও। এই মামলার জন্য আমাকে অনেক শুনতে হবে, আমার জীবন ওষ্ঠাগত হবে মাসী।

যামিনী একটু নরম হয়ে বলল, তুমি তাই চাও দিদিমণি ?

না চেয়ে উপায় নেই। তুমি মিটমাট করে নাও। আমাকে বাঁচাও মাসী।

যামিনী মামলা তুলে নিলেও ঝামেলা থেকে গিয়েছিল।

শ্রেয়সীর বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে যামিনী উড়েপট্টির একজন বাঙালীবাবুর বাড়িতে কাজ নিয়েছিল।

যামিনী সম্বন্ধে খোঁজখবর করতে ভদ্রলোক এলেন যতীনের কাছে।

যামিনী কি আপনার বাড়িতে কাজ করত ?

যতীন প্রশ্ন করল, কেন মশাই ?

আমার বাড়িতে কাজ করছে। সে কেমন লোক জানা দরকার। তাই খবর করতে এসেছি।

ওর কথা বলবেন না মশাই। পাকা চোর। আমার স্ত্রীর সোনার বালা চুরি করেছিল। গায়েব করতে পারেনি। যতীন সরকার কাঁচালোক নয় মশাই। আদায় করে তবে ছেড়েছে তবে পুলিসে দিইনি। ও জাতের মেয়ের কথা বলাই ঘেন্নার বিষয়। আমি যে দয়া দেখলাম তার জন্য কৃতজ্ঞতা নেই, আমার নামে আদালতে মারপিটের মামলা করেছিল মশাই। শেষে সাক্ষী না পেয়ে মামলা উঠিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিল। মিথ্যে সাক্ষী কে দেবে, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে!

তাই তো!

তাই তো নয়, এখুনি বিদায় করে দিন। দুর্জনকে ঘরে জায়গা দিলেই বিপদ-

হবে। আমার মত ঠকতে হবে। ওর স্বভাব চরিত্তির খুব ভাল নয়।

তাই তো। বড়ই চিন্তায় ফেললেন।

চিন্তা নয়। বিদায়। পত্রপাঠ বিদায় করুন।

যামিনী গতর খাটিয়ে খায়। এক জায়গায় কাজ গেলে আরেক জায়গায় কাজ পাবে। তার কাজের অভাব হয়নি।

শ্রেয়সীর প্রসবকালে ঘরে একজনও বয়স্কা কোন মহিলা ছিল না তাকে দেখা-শোনার করার মত। বিপন্নভাবে যতীনকে বলল, কোন বয়স্কা মেয়ের খোঁজ কর। এই সময়টা এ রকম মহিলা না থাকলে খুবই কষ্ট হবে।

যতীন দাঁত খিঁচিয়ে বলল, লোক যখন নেই তখন অবস্থা জেনে বলতে হবে। আমি তো আর তোমাকে দেখার মত লোক পয়দা করতে পারব না। নার্সের টাকাও যোগাতে পারব না।

অতি বিনীতভাবে শ্রেয়সী বলল, একটা কথা বলব?

বলতে পার।

যামিনী মাসীকে খবর দাও, সে এলে অনেকটা সাহায্য হবে।

যতীন যেন ফাঁপড়ে পড়ল। যামিনীর কাছে যাবার মত মুখ তার নেই। নিজের মনেই বলল, সে আর আসবে না প্রেয়।

আমি ডেকেছি বললেই সে আসবে। তার সঙ্গে তোমার কথা বলার দরকার নেই। শুধু ডেকে আনবে। ছোটবেলা থেকে যামিনী মাসী আমাকে কোলেপিঠে করে বড় করেছে। আমার কোন অসুবিধা হলে নিশ্চয়ই সে আসবে।

যতীন সামান্য আপত্তি করে যামিনীর আস্তানায় গিয়ে বলে আসল, তোমাকে তোমার দিদিমণি ডেকেছে। যত তাড়াতাড়ি পার যেও।

যামিনী যতীনকে দেখেই নিজের ঘরে ঢুকেছিল। যতীনকে মোটেই সে পছন্দ করে না তা জানিয়ে দিল অবজ্ঞার মাঝ দিয়ে। শুধু জিজ্ঞেস করল, কেন ডেকেছে?

যতীন বলল, গেলেই জানতে পারবে।

ছোটবেলায় শ্রেয়সী যামিনীর সেবা পেয়ে বড় হয়েছে। কেমন একটা স্নেহের বন্ধন ছিল উভয়ের মাঝে। যামিনী তবুও বলল, সময় পেলেই যাব।

না, না, আজই যেও। তার বড়ই দরকার।

দেখি বলে যামিনী পানের বাটা নিয়ে পান সাজতে বসল। যতীনকে বসতেও বলল না। যতীন সব বুঝেও চুপ করে বেরিয়ে গেল যামিনীর বস্তিবাড়ি থেকে। যতীন ফিরে যাবার কিছু পরেই যামিনী হাজির হল শ্রেয়সীর বাড়িতে। দেখেই

বুঝতে পারল শ্রেয়সীর অবস্থা। প্রসবকাল এসে গেছে। এ সময় যামিনীর সাহায্য দরকার উপলব্ধি করে যামিনী বলল, দিদিমণি, তোমার জন্য সব কিছু করতে পারি কিন্তু জামাইবাবু যেন কোন কাজে নাক গলায় না তা হলে আমি কিন্তু থাকবনি।

সেদিনের গায়ের ব্যথা, মনের জ্বালা, আদালতের মামলা সব কিছুই যামিনী ভুলে গেল শ্রেয়সীকে দেখা মাত্র।

ক'দিন পরে হাসপাতাল থেকে ফিরে যামিনী খবর দিল শ্রেয়সীর মেয়ে হয়েছে।

খবর শুনেই তিড়বিড়িয়ে উঠল যতীন। বলল, মাগী মেয়ে বিয়োলো।

যামিনী গালে হাত দিয়ে বলল, একি বলছ দাদাবাবু!

ঠিক বলেছি। দুটোকেই নিমতলায় দিয়ে আসবি। ওদের মুখ দেখতে চাই না।

মুখ দেখতে না চাইলেও নিমতলায় দুজনকে পাঠানো গেল না। চারদিন পরে শ্রেয়সী মেয়ে কোলে করে ফিরে এল।

যতীন তখন নিজের ঘরের দরজা ভেজিয়ে চুপটি করে বসে রইল।

মেয়ে পেয়ে শ্রেয়সী খুশী। মনে মনে আতঙ্ক। তার মেয়েকেও যদি তার মত দুর্ভোগ সহ্য করতে হয় সারাজীবন, তাহলে?

যামিনী মেয়ে কোলে করে যতীনের সামনে ধরে বলল, দিদিমণি তো কালো, তার মেয়ে কেমন ফর্সা। কত সুন্দর হয়েছে দেখ তো দাদাবাবু।

যতীন শিশুর দিকে তাকিয়ে বলল, কার পয়দা, কে জানে!

যামিনী পাথরের মত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তার মুখ থেকে কোন কথা বের হল না।

শ্রেয়সী সমাচারের এই হল ভূমিকা, বলেই মন্দাকিনী নিজের চোখ মুছল।

আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম। বললাম, সমাজবিরোধী ক্রিমিন্যালদের ক্ষেত্রে এই রকম আচরণই স্বাভাবিক। একটা মজার কথা হল, এই সব পাকা বদমায়েসরা জানে কিভাবে সহজ সরল তরুণীদের মনে প্রভাব বিস্তার করে তাদের সর্বনাশ করা যায়। তাদের কার্য সিদ্ধ হলে দু পায়ে তাদের দলে মুচড়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে। আর বোকা মেয়েরা এই ভুলের মাশুল দেয় সারাটা জীবন। যতীনের কথা যা বললে তা হল একটা পাকা সমাজবিরোধীর চরিত্র। এই চরিত্র যাদের তারা সমাজের ভয়ঙ্কর শত্রু। অথচ আমাদের সমাজের মেয়েরা বিয়ের পিঁড়িতে বসার পর মনে করে মোক্ষলাভ হল, কিন্তু যখন সমাজবিরোধী চরিত্রের সঙ্গে পরিচিতি

হয় তখন আর ফেরার পথ থাকে না। শ্রেয়সী এমনই একটা বোকা মেয়ে অবশ্য যে পরিবেশে সে বড় হয়েছে তাতে এরকম ভুল করাই স্বাভাবিক।

মন্দাকিনী চোখ মুছতে মুছতে বলল, শ্রেয়সী এসে তার এই সব অতীত ও দুঃখের কাহিনী শোনাত। তার মনের কথা শোনার তো লোক ছিল না। তাই মনপ্রাণ খুলে আমার কাছে সবকিছু বলত। মেয়েরা তাদের দুঃখের কথা মাকেই বলেই থাকে। শ্রেয়সীর সে উপায়ও ছিল না।

বললাম, নিভাননী বোধহয় বেশিদিন বাঁচেনি।

কে বলল, নিভাননী আজও বেঁচে আছে। প্রথম জীবনে যথেষ্ট সঞ্চয় করেছিল। প্রকাশও আদালতে দালালী করে যথেষ্ট উপায় করে। নিভাননী ও প্রকাশ পাক-পাড়ায় বাড়িভাড়া করে মৌজসে বসবাস করছে। শুনেছি, একটা ছেলেও হয়েছে। বলতে গেলে সুখেই আছে।

নিভাননীকে দোষারোপ করতে পারছি না গিন্নী।

কারণ, তার পছন্দের বাইরে তাকে বিয়ে করতে হয়েছিল। হিন্দুসমাজে এমনটা তো হামেশাই ঘটে থাকে, বর্তমানে অনেক বদল হয়েছে। আজকাল বিয়ের ব্যাপারে ছেলেরা পিতামাতার খুব অনুগত নয়। তবে প্রাপ্তির আশা থাকলে বিয়ের সময় ছেলেরা অতি অনুগত হয় থাকে বাবা-মায়ের।

চার

আমি ভুলে গেলেও মন্দাকিনী দিন গুনে চলেছে।

শ্রাদ্ধের দিন একবার গিয়েছিলাম যতীনের বাড়িতে। তারপর ওপথ দিয়েই হাঁটিনি। যতীনের অবিবাহিতা মেয়ে মাঝে মাঝে আসে, মন্দাকিনীর সঙ্গে বসে সুখদুঃখের কথা বলে। আবার ফিরে যায় কেমন একটা গতানুগতিক রুটিনের মত। শ্রেয়সী এলে আমার সঙ্গে দেখা না করে ফিরে যেত না। তার মেয়েরা তাদের পিসীর কাছেই আসে, সেখান থেকেই সোজা চলে যায় বাড়িতে। করুণ আকুতি জানাবার ও শোনাবার লোক আর নেই। কেউ এসে বলত না, দাদাবাবু আমাকে নিয়ে একটা উপন্যাস লিখুন, অন্তত একটা গল্প লিখুন, কেউ এসে জিজ্ঞেসও করে না, দাদাবাবু কেমন আছেন। মেয়ে দুটো এলেই শ্রেয়সীর কথা মনে পড়ত। তার করুণ মুখখানা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠত।

কয়েক দিন থেকে গৃহিণী কি যেন বলতে এসে ফিরে যায়।

আমিই ডেকে জানতে চাইলাম, বললাম, তুমি কিছু বলতে চাও?

বলব বলব মনে করি আবার দ্বিধাবোধ করছি। ঘটনাটা সত্য কি না তা না যাচাই করে বলাটা ঠিক হবে কি না তাই ভাবছি। কথাটা অবিশ্বাস্য হলেও যতীনের দুটো মেয়েই কথাটা বারবার জোর দিয়ে বলছে।

এমন কি কথা?

ওরা বলল, যতীন নাকি আবার বিয়ে করবে স্থির করেছে। মেয়ে দেখা কথাবার্তা বলা শেষ। বোধহয় দিনও ঠিক হয়ে গেছে।

অবাক হয়ে বললাম, এই তো তিন চার মাস আগে শ্রেয়সী মায়া গেছে, এর মধ্যেই বিয়ে!

তিন চার মাস নয়। পাঁচ মাস আঠার দিন আজকের দিন ধরলে। অর্থাৎ প্রায় ছ মাস।

তুমি দিন গুনে রেখেছ দেখছি।

তা রেখেছি। তাই তো ভাবছি, এত সহজে পুরুষমানুষ এত বর্বর বিবেকহীন হয় কি করে!

যতীনকে তো চিরকালই বর্বর বলে আমরা জানি, সে সবই করতে পারে। এটা তো তোমারই কথা।

মন্দাকিনী ছাদের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছিল। আমিও নীরবে বসে রইলাম। আমার মনের অবস্থা প্রকাশ করার মত কোন ভাবভঙ্গী না দেখে মন্দাকিনী বিরক্তির সঙ্গে বলল, তুমি দেখছি পরমহংস হয়ে পড়েছ, কোন মন্তব্য তো করলে না।

বললাম, হুঁ।

কি হুঁ?

পাত্রীটির বয়স কত?

চল্লিশ পেরিয়েছে।

নিশ্চয়ই দু তিন হাত ঘুরে অনেক অর্থ সঞ্চয় করেছে।

হাত ঘুরেছে তা জানি না, তবে সরকারী চাকরি করে। ভাল চাকরি করে।

ভদ্রমহিলা দেখতে কেমন?

মেয়েরা তো বলল সুশ্রী নয়।

তাহলে বিয়ে হবে।

কারণ?

ভদ্রমহিলার রূপ দেখে বহু পাত্রপক্ষ পালিয়েছে। অথচ মাথায় সিঁদুর না টানলে সমাজে চলতে অসুবিধা হচ্ছে। সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করতেই এই বিয়ে। আর শ্রেয়সীকে যতীন বিয়ে করেছিল পটিপাটি দিয়ে। এতে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল নিভাননী প্রকাশের প্রভাবে। যতীন পেয়েছিল অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা। এবার অতটা না পেলেও, পাবে সরকারী কর্মীর উপার্জনের বেশ মোটা অংশ। ভদ্রমহিলাও জানে। যতীন মরলে আর কিছু না হোক, পেনশনটা সে পাবে। অর্থনীতির নীতি অনুসারে এই বিবাহ অনিবার্য।

গৃহিণী বললেন, আমি ভাবছি।

কি ভাবছ, সেই মহিলা জেনেশুনে এমন একটা লোককে কেন বিয়ে করবে! যতীনের চার মেয়ে তিন ছেলে জীবিত, দু-একটা নাতি-নাতনীও আছে। এত জেনেও সে বিয়ে করছে কেন?

গিন্নীর কথার জবাব কি দেব! সবাই তো হাওয়ায় ঘুরছে। তবুও বললাম, দেবাঃ ন জানন্তি। তবে এই মহিলা নিশ্চয়ই অনেক ঘাটের জল খেয়ে এসেছে বলেই মনে হয়। এবার তরী তীরে ভেড়াবে অর্থাৎ অন্য ঘাটের জল খেতে গেলে একটা লাইসেন্স দরকার। সেই লাইসেন্স পেতেই বিয়ের পিঁড়িতে বসার অত আকাঙ্ক্ষা। ভাল করে খোঁজ নিও। যতীনের মত অনেক যতীন তার কৃপাপ্রার্থী হলেও মহিলাটিকে সামাজিক মর্যাদা দেবার ইচ্ছা কেউ দেখায়নি। তাই প্রথম সুযোগেই যতীনের স্কন্ধে আরোহনের সুযোগ গ্রহণ করেছে।

অনিমা বলছিল, এই মহিলার সঙ্গে তার বাবার অনেক দিনের পরিচয়। এই মহিলাকে কেন্দ্র করে তার মায়ের সঙ্গে বহু বাদবিসম্বাদ হয়েছে। মাকে শারীরিক নির্যাতনও সহ্য করতেও হয়েছে।

হতে পারে। এতকাল ভাব-ভালবাসা করেও ঘরে তুলতে পারেনি। এবার প্রথম সুযোগে সেই কার্যটি সমাধা করবে এবার। যতীন পাকা খেলোয়াড়, এবার খেলার ইতি ঘটবে। যতীনকে শায়েস্তা করবে তার এই ভাবী বধূ।

মন্দাকিনী গবেষণা করে বললেন, এই মেয়েটাই শ্রেয়সীর মৃত্যুর কারণ।

আশ্চর্য কি! অসীমার জন্মের দু'বছরের মধ্যেই আবার জন্ম নিল আরেকটা মেয়ে।

বললাম, সবাইকেই তো দেখেছি। তারপর কি ঘটল তাই বল।

দ্বিতীয় মেয়েটিকে কোলে নিয়ে ঘরে ঢুকতেই যতীন তার রুগ্ন গালে কষে একটা

চড় মেরে বলল, এবারও মেয়ে বিইয়েছিস মাগী। দূর হ আমার সমুখ থেকে।

শ্রেয়সী অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে। গাল বেয়ে চোখের জল নামছে কিন্তু কোন কথা বলতে পারছিল না কিন্তু যামিনী রে-রে করে উঠল। চিৎকার করে বলল, এ কি করলে দাদাবাবু। কাঁচা পোয়াতি।

যতীন তেড়ে গেল যামিনীর দিকে। কুৎসিত মুখভঙ্গী করে বলল, থাম মাগী! আমার বউকে আমি মেরেছি তাতে তোর কি! বের হয়ে যা বাড়ি থেকে।

তা তো যাব। তবে আবার মারলে থানায় যাব। তুমি মানুষ না জানোয়ার!

কি বললি? জানোয়ার বলেই যামিনীর গালেও কষে একটা চড় মারল।

আচ্ছা! সেবার না হয় দিদিমণির জন্য তোমাকে ছেড়ে দিয়েছি। এবার আর ছাড়ছি না। গজরাতে গজরাতে যামিনী সামনের ফুটপাতে গিয়ে চিৎকার করে লোক জড় করল। যতীন সদরের দরজা বন্ধ করে চুপিচুপি নিজের ঘরে ঢুকে মেঝেতে মাদুর পেতে শুয়ে পড়ল।

শ্রেয়সীর কি অপরাধ ভেবে পেল না কেউ। সন্তান মেয়ে হবে কি পুরুষ হবে তা জানে শুধু বিধাতা। তার দায় বইবে সন্তানের মা, ঝক্কি সইবে সন্তানের মা। এ সব অবমাননা তো কেউ সমর্থন করে না। করবেও না।

যতীন কয়েক দিন ভয়ে ভয়ে কাটাল। আদালতের কোন সমন না পেয়ে কিছুটা নিশ্চিন্ত মনে অফিস যাতায়াতও আরম্ভ করল।

শ্রেয়সী সেই চড় খেয়ে একদম চুপ হয়ে গেছে। যতীন কল্পনাও করতে পারে-নি শ্রেয়সী তার সঙ্গে বাক্যালাপও বন্ধ করে দেবে। এর আগে বহুবার অকারণে শ্রেয়সীকে নির্মমভাবে মারলেও শ্রেয়সী কোন সময়ই তার সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করেনি। কথা বলা বন্ধ করেনি। প্রতিদিন নিয়মমত রান্নাঘরে গেছে। সংসারের কাজ করেছে। এবার সবটাই বিপরীত। যতীন মনে মনে গজরাচ্ছে। আর শ্রেয়সী পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করছে।

শ্রেয়সী নীরবে চোখের জল ফেলে। মনের কথা বলার কাউকেই পায় না। যামিনী ছিল তার সঙ্গে, মাঝে মাঝে সুখ দুঃখের কথা বলেছে। এখন যামিনীও নেই, মনের ব্যথা বুকে চেপে চোখের জল ফেলা ভিন্ন আর কোন পথই তার ছিল না।

শ্রেয়সী সুস্থ হল। দুটো মেয়েকে দুপাশে নিয়ে শুয়ে থাকে মেঝেতে। খাটে শোয় যতীন। রাতের বেলায় মেয়েরা কেঁদে উঠলে যতীন গালাগালি করে। রাতের ঘুম নষ্ট হলে তার মেজাজ গরম হয়। অবোধ শিশুদের যেমন গালাগালি তেমনি তাদের মাকে। অথচ কোন সময়ই শ্রেয়সীকে সন্তানদের রক্ষণা-

বেক্ষণের জন্য সাহায্য করে না।

যদি এভাবেও দিন গুজরান হত তা হলে হয়ত শ্রেয়সীকে অকালে মরতে হত না।

তৃতীয় সন্তান হল চার বছর পরে। এবারও মেয়ে।

যতীন ক্ষিপ্তের মত তেড়ে এসে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করল। এই তো হবে, যার মা খানকি তার পেটে গাদাগাদা মেয়ে আসছে খানকিগিরি করতে। মাগী জাতটাই হল ইত্যাদি।

শিশুদের দুধ বন্ধ করে দিল যতীন।

বড় মেয়ের বয়স সাত পেরিয়েছে। তার দুধের অত প্রয়োজন নেই কিন্তু দুধ দরকার মেজটার ও ছোটটার।

দুধের শিশুদের দুধ বন্ধ হলে তারা বাঁচবে কি করে। শ্রেয়সী তার গোপন পুঁজি ভেঙে কৌটোর দুধ আনিয়ে নিত। বড় মেয়ে অসীমাকে দিয়ে টুকটাক জিনিসপত্রও আনাতো।

কর্পোরেশনের বিনা বেতনের স্কুলে অসীমা পড়ত। দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে প্রমোশ পাবার পর তারও পড়াশোনা বন্ধ করে বাড়ির ঝিয়ের কাজে লাগিয়ে দিল যতীন।

শ্রেয়সী বলেছিল, পড়ুক না আরও দু-একবছর।

পড়ে হবে কি? এই মেয়েও বড় হয়ে ওর দিদিমার রাস্তা ধরবে। তার জ বই কেতাব কিনে কি হবে। তোর রক্তে বিষ। এই বিষ আর ছড়িয়ে কা নেই। এর চেয়ে মুখ্যু থাকাও ভাল। বেশি শিখেও তো জজিয়তি করবে না।

স্কুল যাবার জন্য অসীমা কাঁদত।

শ্রেয়সী মনে মনে বিরক্ত হত, বিক্ষোভ জমত তার মনে।

কদিনের মধ্যেই শ্রেয়সীর নতুন চেহারা দেখতে পেল যতীন।

চাঁপাতলার বাড়ির ভাড়াটেদের রসিদগুলো সই করে রেখ।

সময় হলে করব।

মানে?

মানে এই বাড়িটা বাবা আমাকে দিয়ে গেছেন। ওই বাড়ির পুরো ভাড়া আমার হাতে এনে যদি দাও তা হলে সই করব।

এতদিন যতীনের নানাবিধ অত্যাচারেও শ্রেয়সী প্রতিবাদ জানায়নি। যতীন এমন একটা উত্তর আশা করেনি। কিছুক্ষণ শ্রেয়সীর মুখের দিকে তা থেকে বলল, এতদিন খাচ্ছিস কি?

তোমার অবস্থার মধ্যেই আমাকে চলতে বলেছ। তাই তো চলছি।

তোর গণ্ডা গণ্ডা মেয়েকে কে খাওয়াবে?

আমার বাবা খাওয়াবে। আমার টাকা আমার হাতে এনে যদি দাও তা হলে আমি সই করব নইলে আমিই যাব ভাড়া তুলতে। আমার মেয়েরা লেখাপড়া শিখবে না, তাদের মুখে এক ফোঁটা দুধ দিতে পারবে না আর আমার টাকা নিয়ে তুমি তোমার গুষ্টি পুষবে তা হবে না। টাকা আমার চাই।

তেড়ে এল যতীন।

মারলে কি সই আদায় করতে পারবে। আমার টাকা আমার চাই।

শ্রেয়সী দেখল যতীন রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হয়েছে। এবার সে বুঝল শক্ত হাতে ধরলে যতীন হার মানবেই। তাকে বাধা দিতে হবে পদে পদে। তার জন্য হয়ত নানা দুঃখদুর্দশা সইতে হবে তবুও এভাবে নির্যাতন সহ্য করা উচিত নয়।

শ্রেয়সী গৃহশিক্ষক রাখাল মেয়েদের পড়াতে, দুধের ব্যবস্থা করল।

অসীমা বড় হতেই থাকে, শ্রেয়সীর মনেও শক্তি বাড়তে থাকে। সঙ্গী পেল তিনটি মেয়েকে। সব সময় ভাবে কবে মেয়েরা বড় হবে। কবে ওরা যতীনের মুখ মেপে জবাব দেবে।

একদিন যতীন বলল, তোমার অনেক গয়না তো আছে, গায়ে দাও না কেন?

দরকার হয় না।

মেয়েদের দু-একটা গয়না করেও তো রাখতে পার।

ওটা তোমার কাজ। আমার নয়। আর গয়নাগুলো বাক্সে যেমন আছে তেমন থাকবে। আমার মেয়েদের বিয়ে দেবার সময় দরকার হবে।

যতীন যতই কিছু করুক লকার খোলার কোন ব্যবস্থায় রাজি করতে যেমন পারল না তেমনি বাড়ি ভাড়ার টাকা আদায় করে পকেটস্থ করতে পারল না।

আবার মেয়ে।

পরপর চারটি মেয়ে।

তারপর শ্রেয়সীর দেহে ভাঙন ধরতে থাকে। চিন্তায় চিন্তায় শ্রেয়সী অস্থির হয়ে উঠল।

আবার সন্তান সম্ভাবনা।

এবার কিন্তু মেয়ে নয় ছেলে।

নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল শ্রেয়সী। ছেলে বড় হলে তার দুঃখ দূর হবে। অন্তত কঠিন প্রতিবাদ ও আঘাত করতে পারবে যতীনকে।

এবার তার যমজ দুটো ছেলে হবার পর শ্রেয়সী গোপনে হাসপাতালে গিয়ে লাইগেশন করে এল। ইতিমধ্যেই সাতটি সন্তানকে প্রতিপালন করতে যেমন হাঁপিয়ে উঠেছিল তবুও সে পিছিয়ে পড়েনি। পিতৃদত্ত সম্পদ আর বাড়িভাড়া দিয়ে ছেলে-মেয়ের ভবিষ্যৎ গড়ার দিকে নজর দিল। আর যতীন কেবলমাত্র সবাইয়ের রোজকার খাবার সংগ্রহ করে দিত। তবুও শুনতে হত মাগী যেন রত্নগর্ভা। এই রাক্ষসের গুষ্টি পুষতে পুষতে দেউলিয়া হয়ে গেলাম।

অনেক দিন শ্রেয়সী কাঁদেনি। যতীনের নির্যাতন ও লাঞ্ছনা মুখ বুজে সহ্য করেছে। তার প্রতিদিনের কামনা হল তার মেয়েরা যেন তার মত ফাঁদে না পড়ে। চাওয়া আর পাওয়ার অনেক দূরত্ব। এটা মেয়েদের ভাল করে বুঝিয়ে এসেছে সব সময়। হঠাৎ একদিন তৃতীয় মেয়ে এসে বলল, জান মা দিদি না ওপাড়ার লালটুদার সঙ্গে বেড়াতে যায়। রোজ বিকেলে পড়তে যাবার নাম করে বের হয় কিন্তু টিউটো-রিয়ালে যায় না। লালটুদার সঙ্গে কোথাও কোথাও যায়।

চমকে উঠল শ্রেয়সী।

প্রশ্ন করল, লালটু কে ?

লালটুদার নাম শোননি বুঝি ! এ পাড়ার সবাই চেনে। সবাই বলে লালটু হল একটা পাকা মস্তান। ও নাকি কটা খুনও করেছে।

শিউরে উঠল শ্রেয়সী। ভয়ঙ্কর পরিণতির কথা চিন্তা করে তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তার মত তার মেয়েও বোধহয় গুরুতর ভুলের পথে এগোচ্ছে।

এতদিন অসীমার দিকে ভাল করে তাকায়নি। সে তো বিয়ের বয়স পেরিয়ে চলেছে। অতি শীঘ্র তার বিয়ে দেবার প্রয়োজন। এই প্রয়োজনটা ভাল করে না বুঝতে পারাটাই অপরাধ।

অসীমাকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করল, অনি বলছিল কে এক লালটুর সঙ্গে তুই ঘুরে বেড়াস, এটা কি সত্যি ?

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে অসীমা বলল, ঠিক নয়।

লালটুর সঙ্গে তোর পরিচয় নেই ?

আছে। তবে তোমরা যা মনে করছ তেমন কিছুই নয়। লালটু আমার ছোট ভাইয়ের মত। অনি ও অমির চেয়েও ছোট। মাঝে মাঝে বিনয়ের বাড়িতে যাই। বিনয়কে চিনলে তো ? সে-ই যে পোস্টাপিসে কাজ করে। তার বোন যে আমার সঙ্গে পড়ত। কিন্তু পাড়াটা খুব ভাল নয়। হঠাৎ লালটুর সঙ্গে দেখা হলে বলি, আমাকে বিনয়ের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে, তবে সব দিন নয়।

লালটু বিনা অন্য সঙ্গী বুঝি পাস না ?

কেন পাব না। কোন কোনদিন বাবার অফিসের নিত্যকাকাও পৌঁছে দেয়। তবে লালটু যদি সঙ্গে থাকে কেউ টুঁ শব্দটি করতে সাহস পায় না।

বিনয়ই বা এত ঘনিষ্ঠ কেন ?

সে কথা নাই বা শুনলে।

সত্যি করে বল, বিনয় কি তোকে বিয়ে করতে চায় ?

অসীমা মুখ ঘুরিয়ে বলল, বোধহয়।

শ্রেয়সী তার অতীতের স্মৃতিতে ডুবে গেল। কিছুক্ষণ ভেবে বলল, সারাজীবনের জন্য যে প্রতিশ্রুতি তা যাচাই না করে স্বীকার করা কি ভাল ?

সে কাজটা তোমাদের। তোমরা যাচাই করে দেখে নিতে পার।

শ্রেয়সী নিজেই বের হল বিনয় সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করতে। মোটামুটি নিম্নবিত্তের সৎ পরিবারের ছেলে। এসে যতীনকে বিনয়ের কথা বলল। অসীমা যে তাকে বিয়ে করতে চায় তাও বলল।

যতীন সব শুনে বলল, এ বিয়ে হবে না।

কেন ?

বিনয় জাতিতে যুগী।

আমিও কায়েতের মেয়ে আর তুমি হলে বারুজীবী। তোমাকে বিয়ে করতে আমার তো কোন জাতে বাধেনি। আমি নেমেছি, তুমি উঠেছ। এখানে অসীমা নামবেও না, উঠবেও না। অসীমার তো কোন জাত নেই। সব খুইয়েই তো আমরা বিশ্বজাতি হয়ে আছি।

খুব বড় বড় কথা বলছ। কিন্তু এ বিয়ে হবে না!

শ্রেয়সী অসীমাকে জানাল যতীনের মতামত।

মাস দেড়েক বাদে অসীমা শ্রেয়সীকে বলল, আমার সঙ্গে বাজারে চল, কিছু কেনাকাটা করতে হবে।

কিসের জন্য বাজার ?

বিনয় বদলি হয়ে আলিপুরদুয়ার যাচ্ছে। তাকে কিছু প্রেজেন্ট করব।

এবেলায় নয়, ওবেলায়।

উহুঁ। এখুনি।

কাপড় জামা বদলে অসীমার সঙ্গে রাস্তায় এসেই শ্রেয়সী দেখল বিনয় উল্টোদিকের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের দেখে এগিয়ে এসে বলল, আপনারা দাঁড়ান,

ট্যাক্সি ডেকে আনছি। একটু অপেক্ষা করুন।

পেছন থেকে বিনয়ের বোন সীমা এসে বলল, অসীদি এসে গেছ। এবার চল।

গাড়ি নিয়ে আসুক তোমার দাদা।

ওই তো এসে গেছে। নাও, উঠে পড়। মাসীমা, আপনিও উঠুন।

ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসের সামনে।

এতক্ষণে শ্রেয়সী বুঝল ব্যাপার। বিনা আপত্তিতে হাজির হল রেজিস্ট্রারের টেবিলের সামনে। ঢোল সানাই বাজল না, শাঁখে কেউ ফুঁ দিল না এয়োরা উলু দিল না। বিয়ে হয়ে গেল। বিনয় শপথ নিল, তুমি আমার আইনসম্মত স্ত্রী, অসীমা শপথ নিল তুমি আমার আইনসম্মত স্বামী।

সইসাবুদ সব শেষ করে এক ঘণ্টার মধ্যে সবাই সার্টিফিকেট নিয়ে ফিরে গেল।

অসীমা শ্রেয়সীর সঙ্গে নিজের বাড়িতে ফিরে এল।

পরের দিন বিনয় রওনা হবে আলিপুরদুয়ার।

অসীমা প্রস্তুত হল।

তোমার কি মতলব? জানতে চাইল শ্রেয়সী।

মতলব! বিয়ে দিয়েছ। স্বামীর ঘর করতে যাব। এবার তো কেউ বলতে পারবে না আমি পালিয়ে গেছি।

সত্যিই সেদিন বিনয়ের হাত ধরে অসীমা রওনা হল। স্টেশনে বিদায় জানিয়ে এল শ্রেয়সী। বিনয় ও অসীমা প্রণাম করতেই বলল, তোমরা সুখে থেকো।

যতীন বাড়িতে ছিল না। তাকে কিছুই জানানো হয়নি। বাড়ির খবর রাখবার কোন চেষ্টাও সে করত না। কয়েকদিন অসীমাকে না দেখে তার নাম ধরে ডাকতেই শ্রেয়সী এসে বলল, অসী নেই।

কোথায় গেছে?

আলিপুরদুয়ার।

কার সঙ্গে? আমাকে না বলে জওয়ান মেয়েটাকে অতদূর যেতে দিলে কেন?

সে গেছে তার স্বামীর সঙ্গে। সাবালিকা মেয়ে। তাকে আটকাবার আমার কোন হক্ আছে কি? বিশ্বাস করে যখন স্বামীর সঙ্গে স্বামীর ঘর করতে যাচ্ছে তখন আমাদের বলার কি আছে!

অসী বিয়ে করল অথচ আমি জানলাম না।

পরমুহূর্তে বলল, তুই মাগী সবনষ্টের মূল। মেয়েটাকে বিক্রি করেছিস। তুই নিজে হলি খানকির মেয়ে, তোর মেয়েও তো তা হবেই। বলতে বলতে হাতের

কাছে পেল একটা ছোট্ট লাঠি। সেটা দিয়ে ক্ষিপ্তের মত পেটাতে থাকে শ্রেয়সীকে। তার কাঁদার শব্দ শুনে তিন মেয়ে আর বড় ছেলে এসে যতীনকে জাপটে ধরে চিৎকার করে উঠল, একি হচ্ছে!

যতীন তার জন্তুর মত জীবনে এই প্রথম বাধা পেল। ক্ষিপ্তের মত কুৎসিত গালাগাল করতে করতে অমরকে মারতে গেল। অমর বেগতিক দেখে যতীনের হাতের লাঠি চেপে ধরল। শুরু হল কাড়াকাড়ি। যতীনের হাত থেকে লাঠিটা কেড়ে নিতেই যতীন কেমন শান্ত হয়ে গেল।

অমর হুকুমের সুরে বলল, যাও, ঘরে যাও।

যতীন মাথা নীচু করে ঘরে ঢুকল। এতকাল যত অত্যাচার করেছে তাতে বাধা পায়নি। আজ বাধা পেয়ে পরাজিতের মত ঘরে ঢুকতে বাধ্য হল। অমর চিৎকার করে বলল, অনেক অত্যাচার করেছ মায়ের ওপর। আর কোন দিন এমনটা যেন না হয়। ভদ্রলোকের মত জামাকাপড় পড়ে বাইরে বের হও অথচ মুখটা তো হাড়ির কোদাল। যা মুখে আসে তাই বল। খবরদার, মুখ সামলে কথা না বললে খুবই খারাপ হবে। দিদির বয়স হয়েছে, আরও পাঁচ সাত বছর আগে বিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। তুমি তার বিয়ে দেবে না। সে যদি তার মনের মত পাত্র পায় ও বিয়ে করে তাতে কোন অপরাধ হয় কি? যদি অপরাধ হয় তা হয়েছে দিদির, মায়ের নয়। এই জ্ঞানটাও তোমার নেই। আশ্চর্য লোক তুমি। বিয়ে করল দিদি আর পিঠ ফাটল মায়ের। চমৎকার বিচার।

অসীমা আলিপুরদুয়ার থেকে চিঠি দিয়েছে নিরাপদে পৌছনো সংবাদ। লিখেছে সংসারটা গুছিয়ে নিতে পারলেই মাকে নিয়ে আসবে। বেড়িয়ে যাবে। জায়গাটা মন্দ নয়। পেছনে তাকালে হিমালয় পর্বত। মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। শহরের পাশ দিয়ে কালজানি নদী তরতর্ করে বেয়ে চলেছে। দক্ষিণে এগিয়ে গেলে কোচবিহার। একসময় কোচবিহার ছিল দেশীয় নৃপতি শাসিত রাজ্য। এখনও কোচবিহার যাওয়া হয়নি। ছুটির দিন দেখে একদিন যাব। শুনলাম দেখবার মত শহর। তার বাড়িটা তক্তার মাচাং এর উপর। টিনের ছাউনি, সামনে খোলা মাঠ। ছোট লাইন ও বড় লাইনের গাড়ি অনবরত যাচ্ছে আসছে। আসাম যাবার একমাত্র পথ।

এই সব লিখে শেষে লিখেছে, বাবা হয়ত রাগ করবে। হয়ত তোমার ওপর অত্যাচার করবে। তুমি আগেও যেমন সহ্য করেছ, এখনও তা সহ্য করবে। মা হবার দণ্ড তোমাকে পেতে হয়েছে, হবে। তবে আমি নিজেকে মনের দিক থেকে

প্রস্তুত করেছি। যদি ভবিষ্যতে তোমার মত নির্যাতন সহ্য করতে হয় তাহলে নিজের উপযোগী পথ কেমন করে খুঁজে নেব, তাই ভাবছি।

শ্রেয়সী সযত্নে চিঠিখানা লুকিয়ে রাখল।

বছর না পেরোতেই অসীমার চিঠি পেল। তার কোলে একটা খোকা এসেছে। আরও ছয় মাস পরে অসীমা ছেলে কোলে করে বিনয়ের সঙ্গে কলকাতায় এল।

খবর পেয়ে শ্রেয়সী ছুটতে ছুটতে গেল সদরে। খোকাকে কোলে নিয়ে ছুটে গেল ওপরে। যতীনের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, এই দেখ কেমন সুন্দর তোমার নাতি হয়েছে।

ভ্রূ কুঁচকে যতীন বলল, ওদের তুমি বুঝি ডেকে এনেছ?

ডাকতে হবে কেন? মেয়ে আসবে তার বাবা মায়ের কাছে তাতে ডাকাডাকির কি আছে।

তা তো ঠিক। কদিন থাকবে? গেলাবে কে?

কতটা নিষ্ঠুর স্বার্থপর হলে এমন কথা বলতে পারে তা ভেবে পেল না শ্রেয়সী। তার গাল বেয়ে চোখের জল নামতে থাকে। কোন জবাব না দিয়ে খোকাকে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল।

যতীন ব্যঙ্গের স্বরে বলল, কথা বলছ না কেন?

শ্রেয়সী আর ভারসাম্য রাখতে পারছিল না। কঠোর ভাবে যতীনের দিকে তাকিয়ে বলল, আমার মেয়ে জামাইকে খাওয়াব আমি। আমার বাবা যথেষ্ট রেখে গেছে। তা থেকে ওদের গেলাবো।

তোমার বাবার ফুটো কলসীর জল বিজয়ের জন্য গড়াতে গড়াতে শেষ হয়ে এসেছে। তলানিও নেই।

কে বলল নেই। তা হলে তুমিই সব শেষ করেছ তোমার গুষ্টি পুষতে। বিজয়কে তো ভাল করে লেখাপড়াও শেখাওনি। এখন তো সে আমার ওপর নির্ভর না করে ব্যবসা ধান্ধা করে খাচ্ছে।

ব্যবসায় টাকা দিল কে?

টাকা দিয়েছে বিজয়ের বাবা। আমার বাবা। তুমি নও। আমার কাছে বাবার যা সম্পদ জমা আছে তারই উপস্বত্ব থেকে বিজয়কে টাকা দেওয়া হয়েছে। আজ অবধি তুমি তার জন্য একটা কড়িও খরচ করনি। আমার মেয়ে জামাই কাঙাল নয়। বিনয়ের বাবা-মা এখানেই থাকে। অসুবিধা হলে দু চারদিন সেখানেও থাকতে পারবে। বেড়াতে এসেছে। তাদের আদর যত্ন করাই আমাদের কাজ।

যতীন হয়ত কিছু কটুকথা বলত। বাধা পেল। বিনয় আর অসীমা ঘরে ঢুকতেই থেমে গেল।

অসীমা শ্রেয়সীর কোল থেকে খোকাকে নিজের কোলে টেনে নিল। বিনয় প্রণাম করল যতীনকে। একবার ভাল করে তাকিয়েও দেখল না যতীন।

শ্রেয়সী কেঁদেছে। মেয়ে জামাইয়ের অযত্ন হতে দেয়নি। নিজেই বাজার হাট করেছে। বড় ছেলে অমর সব সময় তাকে সাহায্য করেছে। অসীমা আর বিনয় কয়েকদিন পরে নিজেদের বাড়িতে গিয়ে তার বাবা-মায়ের কাছেও থেকে এসেছে। যে কদিন অসীমা ছিল শ্রেয়সীর কাছে সে কদিন যতীন সকালে উঠেই বেরিয়ে গেছে। অনেক রাতে বাড়ি ফিরেছে। সারা দিন কেটেছে হোটেলের ভাত খেয়ে। কোন সময়ই অসীমা ও বিনয়ের সামনে আসেনি। নাতিটাকে কোন সময় কোলে তুলে নেয়নি।

অসীমা ও বিনয় যতীনের আচার-আচরণে ক্ষুব্ধ। তারাও ফিরে যাবার জন্য ব্যস্ত। কয়েকদিন আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে ঘোরাফেরা করে একদিন শ্রেয়সীকে প্রণাম করে আবার ফিরে গেল বিনয়ের কর্মস্থল আলিপুরদুয়ারে।

শ্রেয়সী সমাচারের একটি পর্বের যবনিকা পতন হলেও এটাই শেষ নয়।

শীগগিরই জানা গেল পাশের বাড়ির নেপু ঘোষালের বিশ্বখাটে ছেলে বান্টু বর্তমানে যতীন পরিবারের নতুন সমস্যা। যতীনের দ্বিতীয় মেয়ে অনি মাঝে মাঝে বেশি রাতে বাড়ি ফেরে। কেন ফেরে তা জানতে চেষ্টা করে শ্রেয়সী। অনি যেন ভারিক্কী চালে বলে, বাইরে কত কাজ।

শ্রেয়সী সহ্য করতে করতে পাষাণে পরিণত হয়েছে। অনির গতিবিধির ওপর নজর রাখার মত তার মানসিক অবস্থাও ছিল না। শরীরটা আজকাল কেমন ঝিম্ ঝিম্ করে। বেশি চিন্তা করলে ঘাড়ে পিঠে ব্যথা করে। শুতে পেলে কিছুটা স্বস্তি লাভ করে। একতলা-দোতলা ওঠা-নামা করার সময় তার মনে হয় কে যেন পেছন থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিচ্ছে। মাথা ঘোরাটা যেন স্থায়ী রোগ। কি যে করবে ভেবেই পায় না।

অমরকে বলতেই তাকে নিয়ে গেল ডাক্তারের কাছে। ডাক্তারবাবু বললেন, রক্তের চাপ বৃদ্ধি পাওয়াতে এই সব উপসর্গ দেখা দিচ্ছে। ওষুধ লিখে দিয়ে বললেন সাবধানে থাকতে। নুন কম খেতে। ডাক্তারের নির্দেশ মত চলাফেরা করার কি উপায় আছে। তা হলে সংসার অচল হয়ে পড়বে। অমর আর ছোট দু'টো ছেলে মায়ের মুখের দিকেই তাকিয়ে বড় হচ্ছে। অসীমা সব দেখাশোনা করত। অসীমার

বিয়ে হয়ে গেছে। সেও থাকে না। অনিমা আর অমর ভরসা কিন্তু তারাও পড়া-শোনা করে স্কুল কলেজে যায়। একা মানুষ, এক হাতে সব কাজ করতে হয়। মেয়েরা যা সাহায্য করে তা যথেষ্ট নয়। বিশ্রাম নৈব নৈব চ। গুমরে গুমরে মরতে থাকে শ্রেয়সীর মন, তাই পাতানো দিদি মন্দাকিনীর কাছেই মাঝে মাঝে ছুটে যায় মনের দুঃখ উজাড় করে গল্প করে। কখনও জামাইবাবুর সঙ্গে বেশ গল্প করে। শ্রেয়সীর ব্যক্তিজীবনে ঠাসা প্রোগ্রাম। সকাল পাঁচটা থেকে পরের দিন সকাল পাঁচটা অবধি ঠাসা প্রোগ্রাম। রাতে ঘুম হয় না। জেগে কাটাতে হয়। অনিমা দুবার মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে ব্যর্থ হয়ে তৃতীয়বারের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ছোট বোন অমিয়া পাস করে কলেজে ঢুকেছে কিন্তু যতীন আর পড়াতে চায় না। অনিমা তৃতীয়বারের জন্য কতটা প্রস্তুত তা কেউ জানে না। তবে মাঝে মাঝেই অনিমা মিছিলের সামিল হয়ে ময়দানে যায়। অবসর কাটায় পাড়ার দাদাদের সঙ্গে সভা সমিতিতে হাজিরা দিয়ে। ক্লাবের ছোট ছোট মেয়েদের নিয়ে নানা কাজকর্ম করে। বাড়ির কারও কোনও নিষেধ সে শোনে না।

বাণ্টু শাসকদলের পোষা মস্তান। যখন যে দল ক্ষমতায় যায় সেই দলেই ডাক পড়ে বাণ্টুর। সম্প্রতি কর্পোরেশনে একটা চাকরিও পেয়েছে। কাজ কিছুই করতে হয় না। পাড়ায় পাড়ায় আড্ডা দেওয়াই বড় কাজ। মাসকাবারে মাইনেটা নিয়ে ঘরে ফেরে। শেষরাতে দলবল নিয়ে অসহায় নিরীহ পথিকদের ওপর হামলা করে সর্বস্ব কেড়ে নেয়। নিজের কাজ ধাঙড়দের কাজ পরিদর্শন করা। সে কাজ কখনও তাকে করতে হয় না।

পাড়ার আবালবৃদ্ধবনিতা বাণ্টুকে চেনে। জানে তার কার্যকলাপ। কেউ সাহস করে কিছু বলে না সন্ত্রাসের ভয়ে। তার সবচেয়ে বেশি আর্থিক সংস্থান হয় গড বিজিনেসে, প্রতি বছর ধুমধাম করে কালীপূজা করে। সরস্বতীপূজা করে, নববর্ষ উৎসব করে। কোন মহান ব্যক্তির জন্মোৎসব করে উদ্বৃত্ত অর্থে নিজে পকেট ভারী করে। পূজা বাবাদ নগদ লক্ষ্মী যা পায় তার কিছুটা অংশ অবশ্য তার সাঙ্গ-পাঙ্গোদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়। বিশেষ করে চোলাই খাবার ব্যবস্থা করে থাকে। এ হেন বাণ্টুর নেক নজরে পড়লে যুবতীদের রক্ষা নেই, আর এর নেক নজরে যে পড়েছে তাদের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে বাণ্টু চিন্তা করে না। চিন্তা করে ওই সব যুবতীদের অভিভাবকরা।

অনিলার রূপ-যৌবনের কোন ঘাটতি নেই। বাণ্টুর শতেক দোষ ঢাকা পড়ে তার সুন্দর চেহারা ও অমায়িক ব্যবহারে। সহজেই স্বল্পবুদ্ধি উঠতি বয়সের মেয়েরা

বাণ্টুর খপ্পরে পড়বে এতে আশ্চর্য কিছু নেই। কিছুকালের মধ্যে অনিলা ও বাণ্টুর মধ্যে ভাব-ভালবাসা জমে উঠেছিল। অন্য কেউ লক্ষ্য না করলেও অমরের নজর এড়াতে পারেনি।

অমর এগার ক্লাসের উচ্চমাধ্যমিক দিয়ে বসে ছিল। হঠাৎ তাকে ডেকে অনিলা বলল, অমু, আমার সঙ্গে এক জায়গায় তোকে যেতে হবে। কোথায় ? তা আর জানতে হবে না। গেলেই জানতে পারবি।

মেজদি এতদিন একাই ঘুরে বেড়িয়েছে। আজ হঠাৎ সঙ্গীর দরকার কেন হল।

অনিলা অমরকে অন্যমনস্ক দেখে বলল, চল, দেরী করিসনি।

কোথায় যেতে হবে তা বার বার জানতে চেয়েও অনিলা মুখ খুলল না। শুধু বলল, তোর অত জেনে কাজ নেই। আমার সঙ্গে যাবি, এর বেশি জানার কি দরকার।

অনিলা ট্যাক্সি ডেকে অমরকে পাশে বসিয়ে রওনা হল।

ট্যাক্সিটা কিছুটা পথ গিয়েই অনিলার নির্দেশে দাঁড়িয়ে গেল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল বাণ্টু আর যোগেন। তাদের গাড়িতে তুলে নিল।

পরবর্তী ঘটনা সংক্ষিপ্ত।

যখন ফিরল তারা তখন অনিলা সরকার হয়ে গেছে অনিলা ঘোষাল। রেজি-স্ট্রারের খাতায় সই করে দুজনের শুভপরিণয় সমাধা হল উভয়পক্ষের অভিভাবক-দের অজ্ঞাতে।

বাণ্টুর সঙ্গেই চলে গেল তার বাড়িতে।

রাতের বেলায় অনিলা মাঝে মাঝেই দেরী করে আসে। আজও সে দেরী করছে মনে করেই শ্রেয়সীর কোন মানসিক চাঞ্চল্য দেখা দেয়নি। অমর সুযোগ বুঝে অনিলার বিয়ের কথাটা বলবে মনে করেছিল কিন্তু মাঝরাত পেরিয়ে যেতেই শ্রেয়সী অমরকে ডেকে বলল, তুই একবার যা অমু। তোর মেজদি এখনও ফেরেনি, তার খবর নিয়ে আয়।

সে আর ফিরবে না মা।

কেন ?

মেজদি বাণ্টুদাকে বিয়ে করে তাদের বাড়িতে চলে গেছে।

তুই কি করে জানলি ?

মেজদি আমাকে রেজেস্ট্রী অফিসে নিয়ে গিয়েছিল।

শ্রেয়সী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আগে বলিসনি কেন রে অমু ?

কি জানি যদি তোমরা অশান্তি কর তাই চুপ করে ছিলাম। তবে এবার ট্যাঁ-ফোঁ করা চলবে না। বান্টুদাকে তো সবাই চেনে। বাবা যদি হাঙ্গামা করে তা হলে কারও ঘাড়ে মাথা থাকবে না।

শ্রেয়সী মনে মনে খুশী হলেও কেমন একটা ভীতি তাকে ঘিরে ফেলল। বান্টুর মত সমাজবিরোধীর সঙ্গে অনিলা মানিয়ে চলতে পারবে তো? হঠাৎ বিয়ে করে বান্টু যে সমাজসংস্কারক হবে এমন আশা করা বাতুলতা। না জেনেশুনে যতীনকে বিয়ে করে তাকে যেমন ভুগতে হচ্ছে তেমন ভোগান্তি যেন অনিলার না হয়। ভাবতে ভাবতে সকাল হয়ে গেল। অমর তখন বেঘোরে ঘুমচ্ছে। পাশেই আরেক ছেলে অমল শুয়ে ছিল, তাকে ডেকে তুলে বলল, ওঠ অমল। আমার সঙ্গে যেতে হবে এক জায়গায়।

চোখ কচলাতে কচলাতে অমল বলল, এত সকালে?

হ্যাঁ। ওঠ, কাপড়জামা বদলে নে।

অমলের হাত ধরে শ্রেয়সী বেরিয়ে পড়ল। রাস্তায় অমলকে জিজ্ঞেস করল, বান্টুদের বাড়ি চিনিস?

খুব। বান্টুদার বাড়ি কে না চেনে। সেখানে যাবে বুঝি?

গম্ভীর ভাবে শ্রেয়সী বলল, হুঁ!

শ্রেয়সী বান্টুকে আগে কখনও দেখলেও, পরিচয় ছিল না। বান্টুদের দরজার কড়া নাড়তেই ভেতর থেকে প্রশ্ন হল, কে?

আমরা সরকারদের বাড়ি থেকে আসছি। বান্টু আছে?

কি দরকার? সে তো ঘুমোচ্ছে।

তাকে একটু খবর দিন। বলুন, অনিলার মা এসেছে।

অনিলার মা! ও বুঝেছি।

আপনি কে? কি বুঝেছেন?

আমি বান্টুর বাবা। বুঝলাম জালে মাছ পড়েছে। এবার টেনে তুলবেন।

বুঝলাম।

কি বুঝলেন?

জেলখানার দরজা খোলা জেনেও ছেলেকে মাথায় তুলে নিয়েছেন।

বান্টুর বাবা এতটা আশা করেনি। নেপু ঘোষালের মুখের ওপর এমন কথা বলার সাহস এই মহল্লার কারও আছে তা ভাবা যায়নি। অথচ তাই সহ্য করতে হল, নতুন কুটুম্ব কি না। প্রথম পরিচয়টা যে মধুর হয়নি তা দুজনের বাক্যালাপেই

বোঝা গেল।

নেপু ঘোষাল বলল, মেয়েকে নিয়ে যেতে চান। নিয়ে যান। আপদ বিদায় হোক। অনজাতের মেয়েকে ঘরে টেনে এনে জাত জন্ম সবই নষ্ট করেছে হারামজাদা। এবার বিদায় হলেই বাঁচি।

চমৎকার! আমার মেয়েকে ফুসলে বার করে এখন জাতের বড়াই করছেন! এসব জোচ্চুরি চলবে না। আমি এসেছি ফয়সালা করতে।

নেপু ঘোষাল ভাল করে বুঝল অনিলার মা সহজ মেয়ে নয়। সহজে ছাড়বেও না।

ওরা বিয়ে করেছে তা জানেন?

জানি বলেই তো মেয়েকে নিয়ে যেতে আসিনি। এসেছি ফয়সালা করতে। বিয়েটা আপনি স্বীকার করেন তো! তা যদি হয় তা হলে আমার সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা কি হয় তা জানেন নিশ্চয়ই। সেই সুবাদে আপনার বক্তব্য কতটা রুচি-সম্মত হয়েছে তাও নিশ্চয়ই বুঝেছেন।

নেপু ঘোষাল এতটা আশা করেনি। ভেবেচিন্তে একটা উত্তর ঠিক করার আগেই অমল শ্রেয়সীর হাত ধরে টানতে টানতে বলল, চল মা। আর অপমানিত হয়ে কাজ নেই। এঁরাই তো ভদ্রলোক।

নেপু ঘোষাল চোখ পাকিয়ে কিছু বলার উপক্রম করতেই অমল এগিয়ে এসে বলল, আপনার ছেলে বাণ্টুকে বলবেন আমার নাম অমল সরকার। কোন কাজেই তার চেয়ে পেছনে থাকব না। এর উত্তর ঠিক সময় মত আমি পৌঁছে দেব।

অমলের চিৎকারে বাণ্টুর ঘুম ভেঙে গেছে। সকাল বেলায় তার মত মস্তানের দরজায় কেউ চেল্লাচেল্লি করতে পারে এটা ছিল তার কল্পনাতীত। এমন সাহস যে কার তা যাচাই করতে বাণ্টু স্বশরীরে হাজির হল দরজার সামনে। অমলকে দেখেই বাণ্টুর লাল চোখটা হঠাৎ সাদা হয়ে গেল।

অতি নরম গলায় বাণ্টু জিজ্ঞেস করল, আরে অমল যে, এত সকালে এত গরম কেন?

অমলও নরম গলায় বলল, কিছুই হয়নি বাণ্টুদা। মা এসেছে মেজদির সঙ্গে দেখা করতে। তোমার বাবা যা বললেন তাতে আমাদের মনে হচ্ছে, তোমাদের বিয়েটা আমাদের অপরাধেই হয়েছে। আমরা বামুন না, তবে একেবারে ছোটজাত নই। আজকের দিনে জাত তুলে কটু কথা বলা কি ভদ্রসমাজে সাজে! বিয়ে করলে তোমরা। আমরা জানলামও না অথচ গালিগালি শুনল মা।

নেপু ঘোষালকে ভেতরে ঠেলে দিয়ে বাণ্টু বলল, তুমি ভেতরে যাও বাবা।

অনিচ্ছাতেও নেপু ঘোষাল ভেতরে গেল। বাণ্টু বলল, তোমরা বস অমল, আমি অনিলাকে ডেকে আনছি।

দরজা ঠেলে অনিলা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, ডাকতে আর হবে না। আমি এসে গেছি।

শ্রেয়সীর দিকে এগিয়ে গিয়ে অনিলা ডাকল, মা।

হ্যাঁ, বলে অনিলাকে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে বলল, আমি ভাবতেও পারিনি। অসীমা আমার সঙ্গে পরামর্শ করেছিল, তুই তাও করিসনি। নিজের ভাগ্য নিজে বেছে নিয়েছিস। বিয়ে সবাই করে অন্তত এটাই হল সমাজব্যবস্থা। পাত্র-পাত্রীর বিয়েতে অভিভাবকদের তো কিছু বলার থাকে, করার থাকে, এটা কি করে ভুলি গেলি।

অনিলা শুধু বলল, মা।

আবেগ কখনও সুখের হয় না রে অনিলা। নিজের জীবন দিয়ে তা আমি পরখ করেছি। আবেগকে যে বিশ্বাস করে তার কপালে শতেক দুঃখ লেখা থাকে। তোরা সুখী হ, আমি মা, আমার তো আশীর্বাদ করা ভিন্ন আর কোন নিজস্ব সম্পদ নেই। সেটাই রইবে সব সময়। তবে কোন অসুবিধা হলে সোজাসুজি আমার কাছে আসিস, এর বেশি আর কি বলব। আচ্ছা চলি।

অনিলা যা করেছে তা শোভন না হলেও অস্বাভাবিক কিছু নয়। রুচিসম্মত না হলেও বে-আইনী কিছু নয়। যদি ওদের জীবনযাত্রা সুখের হয় তা হলে এর চেয়ে সুখের কথা আর কি থাকতে পারে। ভবিতব্য বলে সব কিছু না মেনে তো উপায় নেই।

যতীন খবর শুনে বোকার মত তাকিয়ে রইল। অসীমার বিয়ে শুনে যতীন যে ভাবে অত্যাচার করেছিল তা আর ঘটল না। অমরের উপস্থিতি সংযত করল যতীনকে। তবু দাঁত কিড়মিড় করে বলল, এসবই তোর জন্য।

শ্রেয়সী ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল, আমার কি অপরাধ ?

পেটে ধরলেই মা হয় না। ছেলেমেয়েদের মানুষ করতে জানতে হয়।

সেটা তো তুমি কখনও শেখাওনি। বছর ঘুরতে না ঘুরতে কেমন কাঁথা সেলাই করতে শিখিয়ে দিলে। এখন নিজের জ্বালায় মরছ তাই অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে সন্তোষ লাভ করতে চাও। ভেবেছিলাম ওরা আমার মত ভুল বোধহয় করবে না। এখন দেখছি কপালপোড়া সবাই।

রক্তের দোষ।

কার ?

তোর। তোর রক্তে পাপ। তাই কাউকেই ভাল করতে পারিসনি।

আমার আর তোমার দুজনের রক্তে ওদের জন্ম। পাপ যদি কোথাও থাকে তা থেকে তুমি খালাস পাবে না। তুমি যদি ভাল হতে তবে সবাই ভাল হত। একগাদা সন্তানের মা হয়ে কাউকেই মানুষ করে গড়ে তোলা যায় না। তবে বেঁচে গেছ। দুটো মেয়ের জন্য তোমার এক পয়সাও খরচ করতে হল না। তা হলে তো তুমি বুক ফেটেই মরে যেতে।

শ্রেয়সী আজ কথা না বাড়িয়ে সংসারের কাজে মন দিল।

অমর বাজারের থলে হাতে করে দাঁড়িয়ে ছিল। বলল, বাজারের টাকা দাও মা। অনেক বেলা হয়ে গেছে।

শ্রেয়সী মনে করেছিল মোটামুটি দিনগুলো এইভাবেই ভালমন্দ মিশিয়ে কেটে যাবে। কিন্তু ভাল কিছু না ঘটে ঘটতে যাচ্ছে মন্দটাই। বিধি বিরূপ।

অসীমা অনেক দূরে থাকে। যেটুকু যোগাযোগ চিঠিপত্রে। অসীমার চিঠি এলে আদ্যোপান্ত গভীর ঔৎসুক্য ও মনোযোগ সহকারে পড়ে আলমারীর একপাশে সাজিয়ে রাখে। যখনই অবসর পায় পুরনো চিঠিগুলো আবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে। কোথাও কোন ব্যথা বেদনার কথা খুঁজে না পেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে চিঠিগুলো আগের মতই সাজিয়ে রাখে। মেয়ে-জামাইয়ের প্রতি যতীনের অশোভন অভব্য ব্যবহারের মর্মান্তিক স্মৃতি মাঝে মাঝেই মানসিক অশান্তি ঘটায়। মায়ের আদর যত্ন উপেক্ষা করে ছেলে কোলে করে সেই যে বিনয়ের সঙ্গে চলে গেছে তারপর বছর পেরিয়ে গেলেও মায়ের কাছে আসার নামও সে করে না। বিনয় অসীমাকে স্টেশনে ট্রেনে তুলে দিয়ে এসেছিল অমর। ফিরে আসতেই শুধুমাত্র জিজ্ঞেস করেছিল, ওরা ঠিকমত গাড়িতে জায়গা পেয়েছে তো ?

অমর মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে দিল।

অসীমা পর্ব অনেকটা শেষ ও স্তিমিত হলেও নতুন সমস্যা দেখা দিল অনিলাকে নিয়ে।

কোন জাঁকজমক নেই। বন্ধুভোজন নেই। কালীঘাট অথবা দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে গিয়ে মাথায় সিঁদুর তুলে দেওয়া নেই। অতি নীরবে ও গোপনে বিয়ে হয়ে গেছে অনিলা ও বাণ্টুর। দুই মেয়েই হল আইনসম্মত পত্নী, ধর্মপত্নী নয়। কিন্তু ধর্মের বন্ধন যে এত দুর্বল তা তো তখন চিন্তা করা যায়নি। এরা যদি আইনসম্মত

পত্নী হয়ে স্বচ্ছন্দে থাকে তা হলে ধর্মসাক্ষী করার প্রয়োজনটা আর থাকে কি। এ সবই বিধির বিধান। বোধহয় যতীনকে ব্যঙ্গ করতে তাদের দাম্পত্য জীবনকে অবজ্ঞা জানাতে অসীমা ও অনিলা নতুন ঐতিহ্য স্থাপন করেছে।

মাস কয়েক নিশ্চিন্ত ভাবেই কাটল।

একদিন উষাকালে সদরের কড়ায় শব্দ হতেই যতীন গিয়ে দরজা খুলেই দেখতে পেল অনিলাকে। যাকে বলে এক বস্ত্রে আসা সেই রকম অবস্থা।

যতীন কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না। অনিলাকে ভেতরে ডেকে নিতেও পারছিল না। শুধু জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে রে অনি?

অনিলার গলার সব শব্দ যেন বন্ধ হয়ে গেছে। যতীনের পাশ কেটে ভেতরে ঢুকেই বলল, পুলিস!

কোথায় পুলিস? কেন পুলিস?

অত জানি না। তোমার জামাইকে শেষ রাতে ধরে নিয়ে গেছে।

কেন, এই প্রশ্ন উহ্যই থেকে গেল।

শ্রেয়সীরও আশংকা ছিল বাণ্টুকে নিয়ে অশান্তি ভোগ করতে হবে অনিলাকে। কার্যকালে দেখা যাচ্ছে এই অশান্তিতে জড়িয়ে পড়ছে সবাই। সবাই জানে বাণ্টু বেকার ও সমাজবিরোধী। তার স্থান আজই হোক আর কালই হোক শ্রীঘরে। এর আগেও কয়েকবার হাজত বাস করেছে বাণ্টু তবে এখনও মেয়াদ হয়নি। কোথাও কোন অঘটন ঘটলে পুলিসের নজর পড়ে বাণ্টু ও তার দলবলের ওপর। প্রমাণ না খুঁজে পেলেও অসামাজিক কাজের সঙ্গে বাণ্টুর যোগ আছে এটা সবাই মনে মনে বললেও প্রকাশ করে না।

অনিলা কি এইসব জানত না? জানত, জেনেই বাণ্টুর সঙ্গে ঘর বেঁধেছে।

শ্রেয়সী কিছু বলতে পারছিল না।

যতীন ক্রুদ্ধভাবে বলল, ঠিক হয়েছে।

শ্রেয়সী অভিমানের স্বরে বলল, কি ঠিক হয়েছে?

ওই হারামজাদা খুনী ডাকাত ছিল তা এ তো সবাই জানে। এর চেয়ে ভাল কি হবে?

তা বটে।

এবার যাও থানায়। নগদ কড়ি পুলিসের হাতে দিয়ে নাকে খত দিয়ে এস।

অনিলা কাঁদছিল, বলল, তোমাকে যেতে হবে না। ওর বাবাই গেছে। যা করার ওরাই করবে।

তুই কাঁদিস না অনি, জেনেশুনেই তো বিয়ে করেছিস। এর জন্য প্রস্তুত থাকাটাই হল তোর নিত্যকর্ম।

যতীন অস্থিরভাবে পদচারণা করতে করতে থামল। কাউকে কিছু না বলে গায়ে জামা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। কোথায় যাচ্ছে তা কাউকেই বলল না।

অনিলা হাতমুখ ধুয়ে চা খেল। শ্রেয়সী বারবার তার মুখের দিকে তাকাচ্ছিল আর ভাবছিল। নিজের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে এদের দুর্ভাগ্য কিভাবে সবার অজান্তে জড়িয়ে গেছে। মুক্তির কোন পথ নেই।

যতীন ফিরে এসে বলল, থানা থেকে বাণ্টুকে গ্রেপ্তার করেনি, লালবাজার থেকে পুলিস এসে তাকে ধরে নিয়ে গেছে। থানার বাবুদের কিছুই করার নেই।

কিন্তু, কেন তাকে গ্রেপ্তার করল তা জেনে এসেছ কি?

ওটা জিজ্ঞেস করার দরকার হয় না। দেশে আইনের লাখ খানেক বই আছে, যে কোন বইয়ের যে কোন ধারায় আটক করলেই হল। বিশেষ করে দারোগা পুলিসের পকেটে কম কড়ি থাকলেই ওরা শিকার ধরতে বের হয়। নিরীহ মানুষকে টেনে তুললেই হল, তারপর রফা। মেহনতী পয়সাগুলো ওদের পকেটে দিয়ে বাড়ি ফিরতে হয়। আর যদি বুঝতে পারে মক্কেল শাঁসালো তা হলে আর রক্ষা নেই। কথায় বলে বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, তেমনি পুলিসের খপ্পরে পড়লে তাদের পয়সার যোগান দিতে ভাল মানুষও চোর ছ্যাচড়ে পরিণত হয়।

শ্রেয়সী বাধা দিয়ে বলল, ছাড় ওসব কথা। লালবাজার, মানে, অনেক ঘাটের জল খাওয়াবে।

যতীন বলল, তা খেতে হবে।

উপায়?

নেপু ঘোষালের কাছে ছুটতে হবে। আমার মত ছাপোষার সাধ্য কি পুলিসের খিদে মেটায়। যদি দরদস্তুরে না পোষায় তা হলে যেতে হবে আদালতে। পয়সা দাও, মুহুরিকে খোশামোদ কর, পেয়াদার পা ধর আর বিশ্ববিদ্যালয়ের দামী দামী ছাত্র যারা পেশকার হয়ে কেরানীকুলকে গৌরবান্বিত করছে তাদের সামনে হাত জোড় করে দাঁড়াও। আর হাকিম? সেদিন আর নেই। কলকাতার হাকিম মুখ তুলে দেখে না। কেস রিপোর্ট পেলেই যথেষ্ট।

এসব কথাবার্তা অনিলার ভাল লাগছিল না। সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাদছিল। নেপু ঘোষালের নাম শুনেই বলল, ওরা যাবে না বাবা।

কেন যাবে না! চুরি ডাকাতি করে টাকাপয়সা এনে বাবা-মাকে বুঝি কখনও

দেয়নি। পাপের টাকা পেটে গেছে, পাপীকে রক্ষার চেষ্টাও তাদেরই করতে হবে।

শ্রেয়সী বিরক্তির সঙ্গে বলল, তুমি অমানুষ।

তা বটে।

তোমাকেই যেতে হবে লালবাজারে। অনি তোমার সঙ্গে যাবে। সব কিছু জেনে দরকার মত ব্যবস্থা করে আসতে হবে।

আমি পারব না। আজ আমার ডে-ডিউটি।

যতীন হম্বিতম্বি করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

শ্রেয়সী অনিলার হাত ধরে প্রথমে গেল তার বাবার বন্ধু শেখর উকিলের বাড়ি। উকিলের পরামর্শে তার বাবার দানকৃত বাড়ির দলিল ও নগদ কিছু টাকা নিয়ে ছুটে গেল আদালতে। অমর তার সারাদিনের সঙ্গী। উকিল মুহুরি অনেক করেও বিকেল পর্যন্ত বাণ্টুর কোন হদিস করতে পারল না। আইনমত আদালতে তাকে হাজির করল না পুলিস।

শ্রেয়সী শেখর উকিলকে বলল, বাবা বলতেন, আসামীকে হাকিমের কাছে হাজির করতে হয় গ্রেপ্তারের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই। এখন দেখছি কোন আইন নেই।

শেখর উকিল বলল, আইন আছে। কাগজে ছাপা হয়। ছাপা আইন মানা না মানা পুলিসের এক্তিয়ারে। তবে ব্যাপারটা ঘোরালো মনে হচ্ছে। তুমি আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর, ফেরার পথে লালবাজার হয়েই যাব। দেখি যদি কোন হদিস করা যায়।

অমরের সঙ্গে অনিলাকে বাড়ি পাঠিয়ে শ্রেয়সী বসে রইল আদালতের বেঞ্চে।

সন্ধ্যার আগেই লালবাজারে গেল শেখর উকিলের সঙ্গে।

এ-দপ্তর ও-দপ্তর করে কোন ঠিকানা করতে পারল না। কোন পুলিস অফিসার স্বীকারই করল না বাণ্টুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অথচ তাকে পুলিস গ্রেপ্তার করেছে এ-বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই।

কোথায় গেল বাণ্টু। মহা চিন্তায় পড়ল শ্রেয়সী। একটা মানুষ তো হাওয়াতে উড়ে যেতে পারে না। এ সবই পুলিসের কারসাজি।

শেখর উকিল শুনল কানাঘুষায়, কাল রাতে পুলিস আর সমাজবিরোধীদের মধ্যে ভয়ঙ্কর এনকাউণ্টার হয়েছে। কয়েকজন সমাজবিরোধী আহত হয়ে হাসপাতালে আছে।

বাড়ি ফিরে শ্রেয়সী অমরকে নিয়ে বের হল। কলকাতার সব হাসপাতাল খুঁজে

শেষ পর্যন্ত হাজির হল গঙ্গার কিনারায় মেয়ো হাসপাতালে।

এখানে এসে জানতে পারল বাণ্টু ঘোষাল আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। পুলিস পাহারায় তার চিকিৎসা হচ্ছে। হাসপাতাল থেকে জানা গেল বাণ্টুর অবস্থা মোটেই ভাল নয়।

হাসপাতালের সিঁড়িতে ধপাস করে বসে পড়ল শ্রেয়সী।

মায়ের অবস্থা দেখে তাড়াতাড়ি জল এনে মায়ের মাথায় দিয়ে কোন রকমে সুস্থ করে ট্যাক্সি করে শ্রেয়সীকে নিয়ে গেল বাড়িতে।

ডাক্তার বদ্যি এল, রাতের বেলায় চিকিৎসার কোন ত্রুটি করা হয়নি। শ্রেয়সী সুস্থ হয়ে উঠল রাত না পোয়াতে।

অমরকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, বাণ্টুর আর কোন খবর জানিস ?

বিকেল বেলায় যা জেনেছি তার বেশি জানি না।

অনিলা সব শুনেও কাঁদল না। শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। শুধু একবার অমরকে জিজ্ঞেস করেছিল, বাণ্টু বাঁচবে তো ?

বাণ্টু বেঁচে ছিল অক্ষম দেহ নিয়ে। এর চেয়ে তার মৃত্যুই ছিল সুখের। কিন্তু—

কিন্তু অনেক, প্রথমেই আইনের খাঁচা খুলে বেরিয়ে আসতেই অনেক কাঠখড় পুড়েছিল।

দ্বিতীয় কিন্তু, বাণ্টু খালাস হবার আগে নেপু ঘোষালের উত্তরাধিকারী অনিলার কোলে এসে গেছে। ছেলের মুখ দেখে বাণ্টু বোধহয় বাঁচার লড়াইতে নেমে ছিল।

পুলিসের গুলিতে বাণ্টুর উরুর হাড় ভেঙে কুরুরাজ দুর্যোধনের মত ভূমিতে গড়াগড়ি না দিয়ে বিছানায় গড়াগড়ি দিচ্ছে, অনিলা কচি বাচ্চাটা কোলে নিয়ে সব কাজ রেখে স্বামীর সেবা করছে, দিন কাটে, মাস কাটে, বছর কাটে। বাণ্টুর শারীরিক ক্ষমতা ফিরে আসার কোন লক্ষণ নেই, কোলের বাচ্চা হামাগুড়ি আর দেয় না, হেঁটে চলে বেড়ায়।

অনিলা মাঝে মাঝে আয়নায় নিজের চেহারাটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। তার মাথার সিঁদুরটা জলজ্বল করে। সিঁদুর দেখে নিজেকে নিজেই ভবিষ্যবাণী শোনায়, বাণ্টুর কোন ক্ষতি হবে না।

ক্ষতি যা হবার তা হয়ে গেছে।

অসীমার ছেলে থাকে দূরে। অনিলার ছেলে থাকে কাছে। নিয়মিত প্রতিদিন অনিলা ছেলে নিয়ে আসে শ্রেয়সীর কাছে। কোনদিন আসতে দেরি হলে শ্রেয়সী অস্থির হয়ে ওঠে। সারাবাড়ি পায়চারি করে। কাউকে বলতে পারে না মনের কথা।

সব সময় মনে হয় এই শিশুটাই তার সব শান্তির আধার।

অনিলার বাড়িতে কাউকে পাঠাতে সাহসও পায় না। অনিলার বিয়ের পরদিন যেভাবে নেপু ঘোষাল তাকে আপ্যায়িত করেছিল সেই কথা সে ভুলতে পারেনি। চরম অপমানের মুখোমুখি হয়েও সে নিজেকে ছোট করতে সেদিনও যেমন পারেনি, এখনও তেমনি পারে না। শুধুমাত্র অনীহা নয়, কেমন একটা ঘৃণা তার মনে সব সময় জেগে থাকে। অনিলা তার ছেলের হাত ধরে যখন আসে তখনই সবকিছু ভুলে ছেলেকে কোলে নিয়ে আদর করতে যেন পাগল হয়ে ওঠে।

অনিলা এলেই জিজ্ঞেস করে, বাণ্টু কেমন আছে?

রোজই এক প্রশ্ন করে, একই উত্তর শোনে। এর ব্যতিক্রম হয়নি কখনও।

একদিন অনিলা বলল, ভালই করেছে পুলিস। একজন ঘোরতর সমাজবিরোধীর হাত থেকে তো সমাজকে রক্ষা করতে পেরেছে। আমার কপালে কষ্ট আছে থাকুক। আরও দশজন তো বেঁচেছে। ওর হাতে পায়ে শক্তি থাকলে আরও কত অন্যায় যে করত তার ইয়ত্তা নেই। তবে আমি চাই ও বেঁচে থাকুক, তাতেই আমি খুশী। অবশ্য ওর সেবা করতে করতে আমি হয়রান হয়ে যাই তবুও কখনও সামান্য বিরক্তি প্রকাশ করি না, অনুযোগ করি না।

তোর ধর্ম তুই পালন করছিস।

স্বামীর বুঝি কোন ধর্ম নেই?

শ্রেয়সী উত্তর দিতে পারে না। সারাজীবন শ্রেয়সী যতীনের সেবা করছে কিন্তু যতীন সামান্য কৃতজ্ঞতাও কখনও জানায়নি।

অনিলা আজকাল কাঁদে না। বাণ্টুর কীর্তিকলাপ শুনলে হাসে।

কিন্তু সৃষ্টির আনন্দ থেকে বাণ্টু বঞ্চিত হতে চায়নি। দৈহিক অক্ষমতা তাকে সর্বপ্রকারে অক্ষম করতে পারেনি।

অনিলা একদিন এসে যে খবর শোনাল শ্রেয়সীকে তাতে শ্রেয়সী গালে হাত দিয়ে বসে পড়ল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, বলিস কি!

হ্যাঁ মা।

তুই বাধা দিসনি?

দিতাম। ইদানীং ও কাঁদত। বলত, আমি বিছানা থেকে নামতে পারি না, সেই সুযোগটা নিয়ে তুমি আমার অধিকারটা অস্বীকার করতে চাও।

কয়েকমাস পরে অনিলা হাসপাতাল থেকে ফিরে এল আরেকটা ছেলে কোলে নিয়ে।

পাঁচ

শ্রেয়সী কেমন যেন ভূতের মত আমাদের কাঁধে চেপে আছে। এতকাল মন্দাকিনীই তার সব কিছু সহ্য করেছে। এবার আমার পালা।

সকাল বেলার আধো ঘুমন্ত অবস্থায় শ্রেয়সীর গলার শব্দ পেলাম। রান্নাঘরটা হল মেয়েদের পার্লামেন্ট। গলার শব্দটা ওখান থেকেই আসছে। এই পার্লামেন্টে সারাদিন অনেক সদস্যই আসা-যাওয়া করে। অনেক সময় উদাত্ত কণ্ঠে আলোচনাও হয়। সে সব আলোচনার মাথামুণ্ডু আমি বুঝতাম না। ঘরে বসে শুনেই আমি তুরীয় ভাব ধারণ করতাম। আলোচনার অধিকাংশ এক কান দিয়ে প্রবেশ করে অপর কান দিয়ে প্রস্থান করত।

এই পার্লামেন্টের স্পিকার অর্থাৎ চেয়ারপারসন হলেন মন্দাকিনী। মাঝে মাঝেই রুলিং দেন, কোনটা করণীয় কোনটা অকরণীয়, কোনটা কথনীয় কোনটা অকথনীয় ইত্যাদি। অবশ্য এই অভাজনকে ওই সব রুলিং মেনে চলতে হয়নি কখনও। এ হেন সভাগৃহে অতি প্রত্যুষে শ্রেয়সীর আবির্ভাব নিশ্চয়ই সন্দেহের কারণ। আমি চোখ বুজে পাশ ফিরেই শুয়েছিলাম।

হেনকালে মন্দাকিনী চায়ের কাপ হাতে করে ভগ্নদূতের মত জ্ঞাপন করল, শ্রেয় এসেছে।

হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপটা নিয়ে বললাম, ভাল।

উঁহু! ভাল নয়। তোমার কাছে এসেছে।

আমার কাছে! অবাক কাণ্ড! এত সকালে? বলেই উঠে বসলাম।

শ্রেয়সী পেছন পেছন এসে দরজায় দাঁড়িয়েছিল। তাকে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, কি খবর শ্রেয়?

খুবই খারাপ খবর। আজ সকালে পুলিস এসে বড় খোকা অমরকে ধরে নিয়ে গেছে।

অপরাধ?

জানি না। ওরা বলল নকশাল।

তা ভাবনার কথা।

কি করব দাদাবাবু। আপনি তো জানেন বাণ্টুকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। তাকে চিরকালের মত অক্ষম করে দিয়েছে। বাণ্টুকে বলত সমাজবিরোধী। অমর তো

তা নয়।

এর সঙ্গে সমাজবিরোধী কাজের অনেক ফারাক। এটা হল রাজনৈতিক ব্যাপার। তাই তো, ভাবনায় পড়লাম। বাণ্টু যা করত তার মাশুল সুদে-আসলে বুঝে পেয়েছে। কিন্তু এটা তো আলাদা ব্যাপার। বে-সরকারী ভাবে সরকারী নির্দেশে এই সব সন্দেহভাজনদের গুলি করে খতম করে দিচ্ছে পুলিস। এখন পর্যন্ত যতদূর জানা গেছে তাতে মনে হয় হাজার দুয়েক ভাল ভাল ছেলেকে পুলিস নানা অজুহাতে গুলি করে মেরেছে। কোন প্রতিবিধান হয়নি। প্রতিবাদ জানাতে সাহসও পায়নি কেউ। তুমি প্রতিবাদ জানালে তোমার দ্বিতীয় ছেলেটাকে একই অজুহাতে আটক করবে। দেখা যাবে তোমার কোল খালি। মহাসমস্যায় ফেললে শ্রেয়। দেখি কি করা যায়।

আপনি অতি লঘুভাবে এই ঘটনাকে নেবেন না।

না, তা নেব না। কিন্তু আমি তো বিচার করার কর্তা নই। বাণ্টু ছিল সমাজবিরোধী। ভারতীয় পুলিসের সুনাম আছে, তারা সমাজবিরোধীদের পোষে। তাদের পয়সায় মদ খায়, মেয়েমানুষ পোষে কিন্তু নকশাল আলাদা জীবন। সমাজ-বিরোধীদের সঙ্গে ভাগে কম পড়লে পুলিস তাদের জখম করে, নকশালদের সঙ্গে তো ভাগাভাগি নেই তাই তাদের প্রাণ দিতে হচ্ছে। তবে যতদূর শুনেছি পয়সাওয়ালা লোকের নিরীহ ছেলেদের নকশাল বলে গ্রেপ্তার করে বাবা-মায়ের কাছ থেকে মুচড়ে টাকা আদায় করে ওই সব জহ্লাদরা। এদের অনেকেই শুনেছি বিদেশী ব্যাঙ্কে টাকা পাচার করে রেখেছে। যখন অবসর নেবে তখন নিরাপদে অবসর যাপন করবে বিদেশে এবং এই সব সঞ্চিত পয়সায়।

তাহলে ?

তাহলে ভাবতে হবে। সমাজবিরোধীরা চোরাই টাকার ভাগ নিয়ে টানাটানি করে আর নকশালরা শাসকের গদি ধরে টানাটানি করতে চায়। তাই নকশালদের বাঁচিয়ে রাখা শাসকদের পক্ষে নিরাপদ নয়। রাজ্য যাবে, ধর্ম যাবে, মান যাবে, ক্ষমতা যাবে। তা কি হয়। তাই নকশাল ধর আর কোতল কর আইন বাঁচিয়ে অর্থাৎ মিথ্যা অজুহাত সৃষ্টি করে। বলতে পারছি না বড়খোকার অবস্থা কেমন, তবে কিছু টাকা সংগ্রহ করে প্রস্তুত থেকো শ্রেয়। আমাদের গণতন্ত্রী দেশে সরকার যারা চালায় তাদের দুটো ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে অলিখিত সংবিধানে। প্রথম ক্ষমতা, বেপরোয়া চুরি ও শোষণ কর আর দ্বিতীয় ক্ষমতা নির্বিচারে বিনা কারণে বিরোধীদের কোতল কর।

আমার কথায় আঁতকে উঠল শ্রেয়সী।

বললাম, লালবাজারে ধরাধরি করার মত কোন 'মামা' আছে কি? কমপক্ষে একটা জনপ্রতিনিধি মানে এম-এল-এ বাবুর পারিষদ অবশ্য শাসকদলের হতে হবে। আমাদের এলাকায় তো শাসকদল নির্বংশ হয়েছে এই নির্বাচনে, অন্য এলাকায় লোক দেখতে পার। বুঝলে?

আপনি?

আমাকে যা করতে বলবে তাই করব। হুকুম কর। তবে বড় খোকার জীবনের গ্যারান্টি দিতে পারব না। আমার হাতে তো বন্দুক নেই। আছে একটা ভাঙা কলম। তা দিয়ে কতটা সাহায্য করতে পারি তা ভেবে দেখ। বে-সরকারী গুণ্ডাদের চেয়ে সরকারী গুণ্ডারা বেশি ভীতিপ্রদ। বেসরকারী গুণ্ডাদের বিচার করার ব্যবস্থা রয়েছে, সরকারী গুণ্ডাদের বিচার করার কেউ নেই। কবে পরলোকে ধর্মরাজের আদালতে চিত্রগুপ্ত পাপ-পুণ্যের ফাইল দাখিল করবে তার অপেক্ষা না করে কিভাবে আত্মরক্ষা করা যায় সেটাই ভেবে দেখতে হবে। তুমি বাড়ি যাও, আমি আসছি।

শ্রেয়সী আশ্বাস না পেলেও আমি তার সঙ্গী হতে রাজি হয়েছি জেনেই মোটামুটি খুশী মনে ফিরে গেল।

হাত মুখ ধুয়ে প্রস্তুত হচ্ছি এমন সময় মন্দাকিনী সকালের জলখাবার হাতে করে এসে দাঁড়ালেন সামনে, বললেন, কখন ফিরবে তার তো ঠিক নেই। কিছু ভাল করে খেয়ে বের হও।

অগত্যা! বিনা ওজর-আপত্তিতে খেতে খেতে বললাম, বড়ই কঠিন কাজ।

তা বটে। মন্তব্য করলেন গৃহিণী।

শুনেছি কাকের মাংস কাক খায় না। কিন্তু ইংরেজ যে পুলিস সৃষ্টি করে গেছে তার ঐতিহ্যবাহী বর্তমান পুলিস প্রশাসনে তাও সম্ভব হচ্ছে।

সমাজব্যবস্থাটা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে মেকি গণতন্ত্র যার সহায়ক হল পুলিস যাদের উপর নির্ভর করে ক্ষমতার অধিকারী দলসমূহ যথেচ্ছ বেআইনি অপকাজ করে চলেছে।

পরিণতি তো ভাল হতে পারে না।

সাময়িক লাভ তো হবে। পরিণতি যে কি হতে পারে তা সবাই জানে। এমন কি যারা অনাচার করছে তারাও জানে কিন্তু বিশ্বাস করে না। শোষণবিরোধী সমাজ গড়তে চায় যারা তারা প্রত্যক্ষভাবে শোষণকে প্রশ্রয় দিচ্ছে, বলতে গেলে প্রশ্রয় দিতে বাধ্য হচ্ছে গদি কায়েম রাখতে।

মন্দাকিনী আমার বক্তব্য সমর্থন করল কিনা বুঝলাম না তবে আমার কথার সঙ্গে কথা জুড়ে বলল, সংযুক্তার মা এসেছিল কদিন আগে।

সংযুক্তার মা আবার কে ?

তোমার ছেলের মামী-শাশুড়ি। এবার চিনলে তো ?

বুঝলাম। তারপর ?

সে বলল তার স্বামীকে থানা থেকে বদলি করে দিয়েছে।

তা বলতে পার। এখানেও চাকরি, ওখানেও চাকরি। তবে কিছু অমিল আছে।

যেমন ?

হিসাব করে দেখ। যারা সেপাই তাদের রুজিরোজগার ফুটপাত থেকে। মাইনের টাকায় তাদের হাত ছোঁয়াতে হয় না। অবাঙালী সেপাইরা বাংলাদেশে চাকরি করে যা সঞ্চয় করে দেশে নিয়ে যায় প্রতি বছরে তা দিয়ে বছরে দু-এক বিঘে জমিন খরিদ করে থাকে। তাদের ফুটপাতের যা আয় তার হিসাব দিতে হয় না তাদের ওপরওলাদের। তারপরের স্টেজেই দারোগা, তারা তো কলকাতা শহরে সব চেয়ে শক্তিশালী সম্পদশালী লোক। তাদের বড় বন্ধু সমাজবিরোধীরা। চোর ডাকাতের হিস্যাদার এরা। ডাকাতির এক লাখ টাকা উদ্ধার হলে পঞ্চাশ হাজার মালখানায় জমা পড়ে। পঞ্চাশ হাজার ভাগাভাগি হয় ওপরওলার সঙ্গে। ওপর-ওলারা তো নিজে হাত পাতে না ট্রাফিকের সেপাইদের মত। থানা পিছু তাদের লেভি থাকে। তুমি তো জান, এরা সৎবংশের দাবিদার, উচ্চশিক্ষার দাবিদার, বিশেষ সমাজের অভিজাত অথচ এরাই সব চেয়ে বেশী দুর্নীতিপরায়ণ এবং শোষক।

এর সঙ্গে সংযুক্তার মায়ের কি সম্পর্ক ?

মন্দাকিনী বলল, সম্পর্ক আছে। সংযুক্তার মা বলল, যে থানা ওপরওলার লেভি দিতে পারে না তারা সব সময়ই বদলির শিকার হয়। সংযুক্তার বাবা হলেন পাকা গোয়েন্দা, তাকে পাঠাল থানায়। কিন্তু লেভি ? এখানেই গোলমাল। তাই ঘর বদল করতে হল তাকে। দুর্নীতির মূল কেন্দ্র যারা তাদের ওপর নির্ভরশীল সরকার, তারা জানে পুলিসকে অসন্তুষ্ট করলে তাদের ক্ষমতার বনিয়াদ ভেঙে পড়বে। তাই পুলিসকে তোয়াজ করে চলছে। গদি পাকা রাখতে জহলাদদেরও খোসামোদ করতে হচ্ছে।

বললাম, জান তো ইতিহাসের কোন পরিবর্তন হয় না। আজ যারা ক্ষমতায় রয়েছে তারা স্থানচ্যুত হলে অন্য কোন দল সরকার গঠন করলেও একই অবস্থা চলবে। নতুনত্ব কিছু আশা কর না। আর কথা নয়, এবার যাচ্ছি। ওদিকে শ্রেয়সী

আমার অপেক্ষায় রয়েছে।

মন্দাকিনী বলল, দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়। শ্রেয়সীর বড় খোকার কি পরিণতি হবে সেটাই ভাবছি।

তুমি বসে বসে ভাব। আমি চললাম।

শ্রেয়সী আমার অপেক্ষায় বসে ছিল। যতীন বেরিয়েছে তার কোন বন্ধুর সাহায্যে যদি কিছু করা যায়।

শ্রেয়সীকে নিয়ে রওনা হলাম।

পথে এবং লালবাজারের পুলিস দপ্তরের বারান্দার ভাঙা চেয়ারে বসে শ্রেয়সী চোখ মুছছিল আর কত কথাই না বলছিল। আমি কখনও দাঁড়িয়ে কখনও সেপাই-দের টুলে বসে তার কথা শুনছিলাম।

শ্রেয়সী বলেছিল, সেদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, হ্যাঁরে খোকা, এত রাত অবধি কোথায় থাকিস ?

মুচকি হেসে খোকা বলেছিল, সব কিছুই তোমাকে জানাতে হবে ?

আমি যে মা, সাবালক না হওয়া অবধি তোদের সব কিছুর ওপর নজর রাখা আমার কর্তব্য। তার ওপর যা শুনছি তাতে ভয় পাই। আজকাল চারদিকে গোল-মাল, বাইরে থাকা ভাল নয়। সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি ফিরবি।

আমি তো সামনেই থাকি। অমলকে জিজ্ঞস করে জেনে নিতে পার।

শ্রেয়সী আর কোন প্রশ্ন করেনি সেদিন। গোপনে অমলকে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিল।

দাদার নতুন নতুন বন্ধু জুটেছে। সমীরদের বাড়িতে বসে কি যে করে তা ওরাই জানে। তবে কোন নেশাভাং করে না, সাট্টাও খেলে না।

তবুও চিন্তার অবসান ঘটল না। অমরকে ডেকে বলল, তুই কলেজে ভর্তি হ খোকা। কলেজ খোলার সময় হয়েছে। আগেভাগে চেষ্টা না করলে পরে জায়গা পাবি না। জানিস তো, যার নেই কাজ তার হয় খৈ ভাজা কাজ সেজন্য কোন কিছু করতে হয়।

আমি আর পড়ব না মা।

কেন ?

ইংরেজ স্কুল কলেজের পত্তন করেছিল তার শাসনব্যবস্থা কায়েম রাখতে একদল অনুগত কেরানী তৈরী করতে, আজও সেই ব্যবস্থা চলে আসছে। ওটা হল গোলাম তৈরীর কারখানা। অনেক লেখাপড়া শিখে অনেক বড়মানুষ কজন হয়। অনেক

অনেক বড় বড় অমানুষ তৈরী হচ্ছে। এসব স্কুল-কলেজ-ফেরতা অমানুষের দলের হাতেই ক্ষমতা, প্রশাসন অথচ দুর্নীতি, অনাচারে দেশ ভর্তি হয়ে গেছে। তথাকথিত এই শিক্ষা আমি নিতে চাই না। যতদিন শিক্ষাব্যবস্থা বদল না হবে ততদিন ওসব গোলাম তৈরীর কারখানায় নাম লেখাব না বরং গতর খাটিয়ে নিজের পেটের ভাত উপার্জন করব।

শ্রেয়সী বিস্মিত ভাবে বলল, কি বলছিস খোকা ?

ঠিক বলছি মা, এমন শিক্ষার প্রয়োজন নেই। এখন শিক্ষা অশিক্ষার নামান্তর।

তোর মতিগতি ভাল নয়। আমি বলছি, তুই কলেজে যা। পাস করলে একটা হিল্লে হবে।

অমর ঘাড় কাত করে বলল, তোমাকে ভাবতে হবে না। ভগবানের ওপর তোমার অগাধ বিশ্বাস। সব ভগবানের ওপর ছেড়ে দাও। তুই দিদির বিয়ে আমরা যেমন সহজ ভাবে মেনে নিয়েছি তেমনি সহজভাবে আমার কাজকেও মেনে নাও।

শ্রেয়সীকেই ভাবতে হয়েছে।

যতীনকে বলতেই সে ক্ষেপে উঠল।

মরুকগে হারামজাদা।

মরবে ঠিকই কিন্তু চারদিকে যখন গোলমাল তাতে তুমিও মরবে। মেয়েদের নিয়ে যত অশান্তি করেছ, ছেলেদের নিয়ে তার চেয়ে বেশি অশান্তি করলে গলায় দড়ি দেব।

যতীনের যেন ঘুম ভাঙল। শেষ অবধি সেও চিন্তিত হল। শ্রেয়সীর অনুরোধে নয়, তার আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই এগোতে হয়েছিল অমরকে পুলিসের হাত থেকে বাঁচাতে। হন্যে হয়ে তাকে পথে পথে ঘুরতে হয়েছে, অনেক নিকৃষ্ট ধরনের লোকের দয়া পেতে হাত জোড় করে দাঁড়াতে হয়েছে। মাত্র একবারই তাকে পুলিসের হেফাজতে যেতে হয়েছিল, তাও সাময়িক, দিগম্বর ও নিভাননীর কৃপায় সে মুক্ত হয়েই মনে করেছিল, পৃথিবীটা তার দুষ্টবুদ্ধি ও অঙ্গুলি হেলনে চলবে। অমরের জন্য ঘুরতে ঘুরতে সে বুঝেছিল, ন্যায়-অন্যায়ের তুলাদণ্ডে তাকে শাস্তি পেতেই হবে। এ থেকে রেহাই নেই।

মাঝে মাঝেই বোমার শব্দ। মাঝে মাঝেই গুলির শব্দ। মাঝে মাঝে করুণ কণ্ঠে তরুণদের আর্তনাদ শোনা যায় বাঁচাও বাঁচাও। তার পরই বোমার শব্দ গুলির শব্দ। তারপর চুপচাপ। কয়েকদিন পরে সংবাদপত্রে খবর বের হয়, পুলিস আর নকশালদের ভয়ঙ্কর লড়াইয়ের। এই লড়াইয়ে প্রাণ হারায় নকশালরা, একটি পুলিসের গায়ে

আঁচড়ও লাগে না। মৃতের সংখ্যা তিন পাঁচ দশ যতই হোক একজন নকশালপন্থী জীবিত নেই, একজন গ্রেপ্তারও হয়নি, আর পুলিস হল ফায়ারপ্রুফ, ওয়াটারপ্রুফ এবং আইনপ্রুফ। এই সব মক্-ফাইটিং—এ করে কেবলমাত্র নকশালপন্থীরা। সাধারণ মানুষ খবর পড়ে মাত্র হাসে, ব্যঙ্গ করে নিজেদের মধ্যে, জোরে কথা বলতে সাহস পায় না। বক্তাদের জওয়ান ছেলে-মেয়ে থাকলে বক্তাদের বক্তব্যের প্রতিক্রিয়াতে তাদেরও গ্রেপ্তার করবে, গুম করবে, খুন করবে পুলিস, তাই সবাই সংবাদগুলো অবিশ্বাস করলেও প্রতিবাদ জানাতে সাহস পায় না মৌখিক ভাবেও।

বিশেষ শঙ্কিত অভিভাবকরা যাদের ঘরে তরুণ-তরুণী রয়েছে। কখন কার সন্তানের ওপর পুলিসের নেক নজর পড়বে সেই চিন্তায় অভিভাবকদের চোখে ঘুম নেই। শেষ রাতে কারও দরজায় শব্দ হলে আগে উঁকি দিয়ে দেখতে হয় আগন্তুক পুলিস কিনা। পুলিসের হাত থেকে বাঁচলেও মার্কসবাদী ও কংগ্রেসের পোষা সমাজবিরোধীদের হাত থেকে বাঁচা প্রায় অসম্ভব। কংগ্রেসী সরকার পুলিসের জহ্লাদবাহিনীকে নিয়োগ করেছে। কংগ্রেসের সমাজবিরোধীদের প্রবেশ করিয়েছে নকশালপন্থীদের দলে। এরা সুযোগ পেলেই পরিচিত নকশালপন্থীদের তুলে দিচ্ছে পুলিসের হাতে, সন্দেহভাজনদের নিজেরাই পিটিয়ে মারছে। মার্কসবাদীরা আরও চৌকস, তাদের সমাজবিরোধীরা পুলিসের গাড়িতে চড়ে নকশালপন্থীদের বাড়ি বাড়ি হামলা করছে। ভবিষ্যতের পথ খোলা রাখছে পুলিসকে সাহায্য করে।

সকাল বেলায় ঘুম থেকে উঠেই প্রতিবেশীরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে কার ঘর খালি হয়েছে গত রাত্রে এমন একটা দুঃসংবাদ শুনতে। গত রাতের শেষ প্রহরে কার ঘরে হামলা করেছে পুলিস অথবা সমাজবিরোধীরা তারই ফিরিস্তি তৈরী হয়। সংবাদপত্রের চেয়ে খাঁটি খবর দেয় গতরাতে যারা সন্তানহারা হয়েছে।

শ্রেয়সী এ সবই জানে।

পাশের পাড়ায় গত সন্ধ্যা থেকে বোমা ফাটছে।

শ্রেয়সী ছেলে-মেয়েদের খোঁজ করেছে। দেখল অমর তার ঘরে নেই। উদ্বিগ্ন হল শ্রেয়সী। অনেক খোসামোদ করে যতীনকে পাঠাল অমরের খোঁজে।

অনেক রাতে যতীন ঘরে ফিরল, তার গলায় ব্যাণ্ডেজ।

হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল শ্রেয়সী।

যতীন বলল, কিছু না, স্প্লিন্টার।

দুইপক্ষ সমানে বোমা ছুঁড়ছে। এই লড়াইয়ের মাঝখানে পড়েছিল যতীন। বোমার একটা টুকরো আঘাত করেছে তার গলায়। ক্ষত গুরুতর নয় তবে কিছু

রক্তপাত হয়েছে। আঘাত সামান্য কিন্তু মানসিক উত্তেজনা অসামান্য।

শ্রেয়সী চোখ মুছল। তার কাঁদার সুযোগ নেই। যতীন আহত, অমর ঘরে ফেরেনি, কাঁদলে তো সমস্যা মিটবে না। রাতের বেলায় অনিলাকে ডেকে পাঠাল। অনিলাই কাছে থাকে, কিন্তু তার মেরুদণ্ডও শক্ত নয়। বাণ্টু তখনও শয্যাশায়া। ছুটোছুটি করতে হলে অনিলা পারবে কি!

খবর পেয়ে অনিলা ছুটে এল।

সবারই প্রশ্ন, তাই তো, কি হবে!

অমর সবার প্রিয় ও স্নেহের। যতীনেরও অমর সম্বন্ধে দুর্বলতা আছে যথেষ্ট।

অনিলার দায়িত্বে যতীনকে রেখে অমলকে নিয়ে শ্রেয়সী বেরোবার উপক্রম করছে এমন সময় হাসতে হাসতে হাজির হল অমর।

ঝঙ্কার দিয়ে উঠল অনিলা, কোথায় গিয়েছিলি হতভাগা!

কেন, কি হয়েছে? আমি তো পাড়াতেই ছিলাম।

বোমা গুলির শব্দ শুনতে পাসনি?

পেয়েছি। ও তো রোজই শুনতে পাই। নতুন কিছু নয়।

নতুন নয়! শেষে তোকে নিয়ে টানাটানি করবে রে হতভাগা!

শ্রেয়সী ছুটে এসে অনিলার মুখ চেপে ধরে বলল, চুপ!

অনিলা চুপ করে গেল। তার গলার শব্দ পাশের বাড়ির কেউ যাতে শুনতে না পায় তার জন্যই সাবধানতা। অকারণে বিপদ ডেকে আনা উচিত নয়।

শ্রেয়সী বলল, খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়।

অমর সুবোধ বালকের মত খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ল।

কথায় বলে দেওয়ালেরও কান আছে। অন্তত পাড়ায় পুলিসের কাছ থেকে সোর্স মানি পাওয়া অনেক গুপ্তচর থাকে। গুপ্তচরের জাল যে কত ভয়ঙ্কর তা নিরীহ লোকেরা মাঝে মাঝেই হাড়ে হাড়ে বোঝে। এদের সত্য মিথ্যা খবরের ভিত্তিতে সমাজবিরোধীরা যেমন আইনের হাত থেকে বেঁচে যায় তেমনি নিরীহরাও নির্যাতিত হয়ে থাকে। পাড়ার তরুণ সম্প্রদায়ের একাংশ যখন বিপ্লবীদের খাতায় নাম লেখাতে আরম্ভ করেছে তখন পুলিসের দোসর এই সব গুপ্তচররা মেকি বিপ্লবী সেজে দলে প্রবেশ করে গোপন সংবাদ পৌঁছে দিচ্ছে পুলিসকে।

সরকার নকশাল আন্দোলন দমনের জন্য নকশাল সেল গঠন করেছে লালবাজারে। এই সেলের কর্মী ও পরিচালকদের প্রশংসা করার মত লোক জনসমাজে বিরল। এদের একাংশ রক্তলোলুপ ভাড়াটিয়া জহ্লাদ যারা দেশের ও দশের জন্য সামান্য

মাত্র ত্যাগ স্বীকার কখনও করেছে এমন পরিচিতি সন্দেহজনক।

শ্রেয়সী এই সব খবর জানে। সে কারণেই অমরকে নিয়ে চিন্তিত। কয়েকবার তাকে বলেছে, তোরা কি চাস জানি না, তবে চাওয়া আর পাওয়ার মধ্যে শূন্যস্থান পূর্ণ করার অবস্থা এখনও আমাদের দেশে সুলভ্য নয়। ব্যক্তিহত্যা করে এত বড় প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রব্যবস্থাকে কাবু করার কোন সম্ভাবনা নেই। ওদের অর্থ আছে অস্ত্র আছে, ভাড়াটিয়া লোক আছে; মুষ্টিমেয় কজনের সামর্থ্য আছে কি লড়াই করার! যতদিন জনসমর্থন আদায় করতে না পারছিস ততদিন এর ব্যর্থতাই প্রমাণিত হবে। সবার আগে প্রয়োজন জনমত গঠন, জনতার তথা যাদের জন্য লড়াই তাদের পূর্ণ সমর্থন লাভ করা।

অমর মাথা নীচু করে মায়ের বক্তব্য শুনছে। ভেবেছে তার মা কত বেশী খবর রাখে সাধারণ মানুষের সম্বন্ধে। সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ না করলেও তার যোগাযোগ তো অস্বীকার করা যায় না।

অমরকে গ্রেপ্তার করল পুলিস।

এই ঘটনার পরই শ্রেয়সী গিয়েছিল তার দিদি মন্দাকিনী আর দাদাবাবুর কাছে সাহায্য ও সহযোগিতার আশায়, যতীন গিয়েছিল তার পরিচিত জনের সাহায্য নিতে। কোনপক্ষই অমরকে মুক্ত করার কোন সূত্রই খুঁজে না পেয়ে ফিরে গিয়েছিল স্বস্থানে।

যতীন বাড়িতে গুম হয়ে বসেছিল।

শ্রেয়সী সামনে পেয়েই বলল, ডম্বরমল শর্মা।

সে আবার কে?

আরে ওই লাল বাড়িটা। চেন তো? ওটা হল সজ্জনলাল বজরঙ্গলাল চটপটিয়ার বাড়ি। ওদের ম্যানেজার হল ডম্বরমল। অনেকে বলে ম্যানেজার না ছাই, স্রেফ মুনিমজি।

তাতে তোমার কি?

ওর মেয়ে ঝনকা। দেখেছ নিশ্চয়ই মেয়েটাকে। চিনতে পেরেছ? শুনলাম ওই মেয়ের সঙ্গে গাঁট বাঁধতে চায় তোমার সুপুত্র অমর।

ওসব হেঁয়ালি ছেড়ে আসল কথাটা বল দিকি। ঝনকা আর অমর প্রেম করছে তাতে গ্রেপ্তারের কি আছে!

হঠাৎ চটে উঠে যতীন বলল, তোর মাথায় ঢুকবে না। ডম্বর হল বামুন। খাঁটি মারোয়াড়ী বামুন। আর তোর ছেলে হল? তুই কায়েতের মেয়ে আমি হলাম বারুই।

তোর ছেলের কি জাত বলতে পারিস! ঝন্‌কা আর অমরের লটঘটি ওরা টের পেয়েছে। সইবে কেন ওরা। ডম্বরমলের আরও দুটো মেয়ে আছে। তাদের তো বিয়ে দিতে হবে। তোর ছেলে যদি ও মেয়েকে নিয়ে ঘর করতে বসে তা হলে ওদের সমাজে আর কেউ ওদের জলও ছোঁবে না। তাই তোর ছেলে ঢুকেছে হাজতে, ওরা ঢুকিয়েছে।

এসব তুমি জানলে কি করে?

লালবাজারে গিয়ে শুনলাম। ফিসফিসানি। নকশাল সেলের কোন এক বড়-বাবুকে তিন বোতল হুইস্কি আর নগদ দশ হাজার টাকা দিয়েছে ডম্বরমল। তার মেয়ের ধর্মনাশ যাতে না হয় তার জন্যেই একেবারে পাকাপোক্ত বন্দোবস্ত। এখনও জানি না ওকে খতমের তালিকায় ঢুকিয়েছে কিনা। তবে ছাড় পাওয়া খুবই কঠিন। জানি না, কোন্ শালার ক্ষমতা কত, শেষে খোকার প্রাণটা না যায়।

অবাক হয়ে শ্রেয়সী বলল, তা হলে নকশাল-ফকশাল মিছে কথা।

তা তো বটেই। সবাই শোধ তুলছে। ওদিকে দশ হাজার, ফল হল গ্রেপ্তার। এদিকে দশ হাজার বলা হলে খালাস। ভাল বিজিনেস, এই তো তাদের গণতন্ত্র।

সব শুনে শ্রেয়সীর বুদ্ধি বিদ্যা লোপ হবার উপক্রম। চুপ করে বসে মা কালীর নাম জপ করতে থাকে।

যতীন অস্থির ভাবে বলল, কি ভাবছ?

ভাবছি এরপর কি। ডম্বরমলের মেয়ে প্রেম করছে অমরের সঙ্গে। তার শোধ তুলতে অমরকে পয়সা খরচ করে জহ্লাদের হাতে তুলে দিয়েছে। আশ্চর্য!

যতীন বলল, এটাও যেমন সত্যি তেমনি সত্যি হল এই সব জহ্লাদরা পয়সা পেয়ে যেমন অমরকে আটক করেছে, তেমনি পয়সা পেয়ে ডম্বরমলের মেয়েকেও আটক করতে পারে। ভাড়াটে জহ্লাদদের কি কোন ধর্ম আছে।

আমি ভাবছি প্রেমটা তো একপক্ষীয় হয় না। উভয় পক্ষই এতে জড়িয়ে থাকে।

তা ঠিক, তুই যদি দশ হাজার টাকা দিতে পারিস তা হলে সাত দিনের মধ্যে ঝন্‌কাকেও হাজতে নেবার ব্যবস্থা করতে পারি। পারবি দিতে? ওরা মক্কেল খোঁজে। দুদিক থেকে পয়সা খাওয়ার ধান্ধা।

তা হলে দেশে কোন সরকার নেই বলতে চাও?

নিশ্চয়ই। সরকার আছে। জুলুমবাজির রাজত্ব। জুলুমবাজ সরকার আছে।

কোন মন্ত্রীর কাছে ধর্না দিলে কেমন হয়?

মন্ত্রী ! ওরে বাপরে ! ওরা বলে, আমরা জনপ্রতিনিধি। মন্ত্রী হবার পর জনতার সঙ্গে ওদের কোন সম্পর্কও থাকে না। সব সময় পুলিস পাহারায় ওদের চলতে হয়। সামাজিক জীবন ওদের থাকে না। যন্ত্রে পরিণত হয়। মুখে বড় কথা বললেই তো কাজের কাজ হয় না। ওরা বোধ হয় সমাজের বহিভূত সং সেজে বেড়ায়। সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অনেক দূরে থাকে, গদি রাখার দায়ে সব কিছু হজম করে নির্বিবাদে।

শ্রেয়সী এসব কূট আলোচনা করতে চায় না। নীরবে ভাবছিল কি করে অমরকে খালাস করে আনা যায়। ভাবতে ভাবতে উঠে পড়ল।

এবার একাই গেল লালবাজার।

কয়েক ঘণ্টা পরে অমরকে নিয়ে ফিরে এল।

অবাক কাণ্ড!

কি করে সম্ভব হল ? জানতে চাইল যতীন।

পথটা তুমিই দেখিয়ে দিলে। ওরা দশ হাজার দিয়েছিল। আমি পারিনি। হাত-পা ধরে আট হাজারে রাজি করে অমরকে নিয়ে এসেছি।

যতীন বলল, তোফা। তবুও তো দু হাজার বাঁচল।

শ্রেয়সী বলল, অত সহজে হয়নি। পুলিস বলল, একটা জীবনের দাম মাত্র আট হাজার, তা কি হয়। আরও আট হাজার নিকালো।

বললাম, কোন জীবনের দাম লাখ টাকার বেশী, কোনটা কম। কিন্তু বাঙালীর ঘরের ছেলে মেয়ের দাম একটা কানাকড়িও নয়। ইংরেজ যখন রাজা ছিল, জওয়ান ছেলে পেলেই জেলে আটক করত, তাদের জীবন নিয়ে ছেলেখেলা করলেও রাস্তায় দাঁড় করিয়ে গুলি করে মারত না কিন্তু এখন এটাও হয় তাই আমাদের ঘরের ছেলেমেয়েদের কোন জীবনই তো নেই, তার আবার দাম কিসের। অনেক তর্কাতর্কি করে রফা হল আট হাজারে। তবে তারা বলল, আপনার ছেলেকে কয়েকটা কাজ করতে হবে। জানতে চাইলাম, কি কাজ ? আপনার ছেলেকে কয়েক মাসের জন্য বাইরে পাঠাতে হবে। ভুলেও যেন সে ডম্বরমলের মেয়ের সঙ্গে দেখা না করে। আর জানাশোনা নকশালপন্থীদের ঘাঁটিগুলো চিনিয়ে দিতে হবে।

বললাম, ছেলের সঙ্গে একবার কথা বলতে চাই।

বেশ। অমরকে নিয়ে এস পাহারায়।

অমর সব শুনল, কিন্তু প্রথম দুটো সর্ত মানতে রাজি। শেষেরটা নয়। কয়েক মাস সে আলিপুরদুয়ারে অসীমার কাছে গিয়ে থাকবে। ডম্বরমলের মেয়ের কাছে

যাবে না। তবে ঝনকা যদি আসে তাহলে তাকে তাড়াতে পারবে না। শেষের সর্তটা ভেবে দেখবে।

এই ভাবে অমরকে খালাস করে এনেছি।

যতীন প্রশ্ন করল, এত টাকা কোথায় পেলে ?

আমার বাবা আমাকে একটা বাড়ি দিয়েছিল তা তো তোমার ভাল জানা আছে। সেই বাড়ির ভাড়া থেকে কিছু কিছু সঞ্চয় করেছিলাম, তাই দিয়ে আজকের দায় মেটালাম।

বাড়িতে এসে সব ঘটনা শুনে অমর বলল, শালা ডম্বরমলকে শেষ করে ফাঁসিতে চড়ব।

শ্রেয়সী বাধা দিয়ে বললে, ও কাজটি কর না খোকা। বাপের সুপুত্র হয়ে আলিপুরদুয়ার যাও। তাতেই তোমার মনের পরিবর্তন ঘটবে। তারপর অবস্থা বুঝে খুনোখুনি যা হয় করবে। ডম্বরমল তার মেয়ে ঝনকাকেও বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছে। শুনলাম রৌঢ়কেল্লার কাছাকাছি কোথাও।

অমর আলিপুরদুয়ারে অসীমার বাড়িতে পৌছল।

এর মধ্যে একদিন সংযুক্তার মা এলো, সব শুনে বলল, পুলিসকে বিশ্বাস কর না দিদি। একবার টাকার গন্ধ পেয়েছে। এরপর বারবার হামলা করবে টাকা আদায় করতে। সাবধান! অমর যেন এই শহরে সহজে পা না দেয়। সহজে আসতে দিও না।

অসদাচারীদের লোভ মেটাবার সাধ্য নেই শ্রেয়সীর। ছেলের জীবন বাঁচাতে বাধ্য হয়েছিল, তার শেষ সম্বলটুকু তুলে দিয়েছিল ওসব দ্বিপদ নেকড়েদের খুশী করতে। মা সন্তানকে ফিরে পেল সাক্ষাৎ যমের কবল থেকে, এটাই তার সৌভাগ্য।

আলিপুরদুয়ার থেকে অমরের চিঠি এসেছে।

শ্রেয়সী পৌছনো সংবাদ পেয়ে নিশ্চিন্ত।

অসীমাও লিখেছে, অমর ইচ্ছা করলে কোচবিহারে বি. এ. পড়তে পারে।

শ্রেয়সী খুশী হল তবে অসীমাকে লিখল তিন চার বছর পড়া বন্ধ রেখে নতুন করে অমর পড়বে কিনা সেটা যাচাই করে তাকে যেন কলেজে ভর্তি করা হয়। বিশেষ করে বিনয় আর অসীমাকে অনুরোধ করেছিল, অমর যেন কোন দলের হাতে না পড়ে। মায়ের চিঠি পড়ে অসীমা কৌতুক অনুভব করেছিল। অমর তো শিশু নয়। যার দল করা অভ্যাস তার দল নিজেই খুঁজে নেয়। তাকে বাধা দিয়ে কোন ফল হবে না।

অমর কয়েকদিন ঘরে বসেই কাটাল। তারপর মনে হল সে যেন নতুন জীবনের সন্ধান করছে। নতুনত্বের মাঝে নিজেকে হারাতে পারলে যেন বেঁচে যায়।

সঠিক কিছু না বলে মাস দুয়েক পর অমর ফিরে এল কলকাতায়।

শ্রেয়সীর মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল। জিজ্ঞেস করল, হঠাৎ ফিরে এলি কেন? ওখানে কষ্ট হচ্ছিল?

পরে বলব।

কিন্তু অমরকে ঠিক বুঝতে পারল না শ্রেয়সী। আগের মত আটটায় রোয়াকে যায় না, বসে না। মাঝে মাঝেই কোথায় যেন যায়। দু-একটা বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ফিসফাস করে। এসব বন্ধুদের শ্রেয়সী চেনে। এরা কোন দল করে না, বরং দল ভাঙার শিক্ষা নেয়। তাহলে অমরের মতলবটা কি?

সপ্তাহ না কাটতেই অমর বন্ধুদের কাছ থেকে ধার করে একটা গাড়ি নিয়ে এল নিজের বাড়ির দরজায়। তর্-তর্ করে দোতলায় উঠেই শ্রেয়সীকে বলল, মা, কাপড় বদলে চল আমার সঙ্গে।

অবাক হয়ে শ্রেয়সী জিজ্ঞেস করল, কোথায়?

তাতে তোমার কি দরকার। আমার সঙ্গে যাবে। নিশ্চয়ই কোন দরকারী কাজ আছে।

শ্রেয়সী কেমন ভীত হয়ে পড়ল। বলল, না, আমি যাব না।

জোর দিয়ে বলল তোমাকে যেতেই হবে। গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। গাড়িতে বসে সব বলব।

গাড়িতে অমরের দুই বন্ধু বসেছিল। তারা জায়গা করে বসতে দেওয়া মাত্র গাড়ি ছুটল।

আমরা কোথায় যাচ্ছি!

অত প্রশ্ন কর না। শোন। ঝন্‌কাকে নিশ্চয়ই কোনদিন ভুলবে না। ঝন্‌কার বাবা আমাকে হাজতে পাঠিয়েছিল। এটাও জান। কিন্তু আসল ঘটনা ঘটবে আজ। ঝন্‌কার সঙ্গে আজ আমার বিয়ে। ঝন্‌কার পরপর চিঠি পেয়েই কলকাতায় এসেছি। তার চিঠি পড়লেই বুঝতে পারবে ঝন্‌কাই আমাকে টেনে এনেছে কলকাতায়। চিঠিগুলো আমার দরকার আছে। যত্ন করে রেখে দিও।

তা তো বুঝলাম। কিন্তু তুই খাওয়াবি কি?

এখন তুমি ভরসা। একটা কোন কাজ খুঁজে নিতে হবে আর কি। কাজ একটা পাবই।

তাই তো!

এত ভাবছ কেন। এর মাঝে তুই মেয়ের তো বিয়ে দিয়েছ। এবার ছেলের বিয়ে দাও। ঝন্‌কা হয়ত এসে গেছে তার বন্ধুদের নিয়ে। ডম্বরমল এবার বুঝবে। ঝন্‌কা রৌঢ়কেল্লা থেকে কদিন আগে এসে তার এক বন্ধুর বাড়িতে আছে। বিয়ে হয়ে গেলেই এসে উঠবে তোমার কাছে।

শ্রেয়সী পড়ল বিপাকে। মুখে কোন কথা নেই। সরকারী খাতায় সই করে আইনসম্মত স্বামী-স্ত্রী হয়ে শ্রেয়সীর আঁচল ধরে নিজের বাড়িতে উঠল।

বাড়িতে এসেই শ্রেয়সী বলল, দেখ, ডম্বরমল এটা সহ্য করবে না। জানাজানি হবেই। তুই বউমাকে নিয়ে আলিপুরদুয়ারে চলে যা অসীমার কাছে। ডম্বরমল তোকে রেয়াত করবে না।

একটা কিছু ফ্যাসাদ বাধাবেই। দু-একদিনের মধ্যেই কলকাতার বাইরে চলে যা। সব সময় বিয়ের সার্টিফিকেটটা সঙ্গে রাখিস।

ঘটনাটা চাপা থাকার মত নয়। পরের দিন ঝন্‌কার বন্ধুদের মুখেই ডম্বরমল খবর পেল। কিন্তু কেউই বলল না, অমর আর ঝন্‌কার বিয়ে হয়ে গেছে। বলেছিল, অমর আর ঝন্‌কা গাড়িতে করে কোথায় যেন গেছে।

তারপর?

সদলে পুলিসের সঙ্গে ডম্বরমল হাজির হল যতীনের বাড়িতে।

সামনেই অমর আর ঝন্‌কা।

পুলিস তাদের গ্রেপ্তার না করেই ফিরে গেল। শ্রেয়সী পুলিসের সামনে পেশ করল ওদের বিয়ের সার্টিফিকেট। পুলিস নির্বাক। তাদের তো করার কিছু নেই। সাবালিকা মেয়ের সঙ্গে সাবালক ছেলের বিয়েতে নিমন্ত্রণ খাওয়া যায়, গ্রেপ্তার করা যায় না। অতএব পুলিস বিদায় নিল।

আগুনের হল্কা দেখা গেল ডম্বরমলের চোখে।

ঝন্‌কার দিকে তাকিয়ে বলল, ইন্‌কা নতিজা বুরি হোগী।

ঝন্‌কা কোন কথা না বলে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল শ্রেয়সীর হাত ধরে। ডম্বরমল চলে যাবার পর আঁচল দিয়ে চোখ মুছল। ফিরে যাবার কোন লক্ষণ ছিল না।

শ্রেয়সী বুঝল, এটা সূচনা, পরবর্তী অধ্যায়ে আরও কঠিন কিছু হতে পারে।

যতীন ঘরে বসে তড়পাতে থাকে। যত ক্রোধ গিয়ে পড়ল শ্রেয়সীর ওপর। সাহস করে কিছু বলতেও পারছিল না।

পরের দিনই অমর আর ঝন্‌কাকে কামরূপ এক্সপ্রেসে তুলে দিয়ে কিছুটা

নিশ্চিন্ত হল।

কেন হঠাৎ ফিরে এসেছিলাম তা তো বুঝলে, বলেই অমর মৃদু হেসে গাড়িতে জায়গা করে নিয়েছিল।

অমর আর ঝন্‌কা নোটিশ দেবার পরেই ডম্বরমল অমরকে কয়েদ করার ব্যবস্থা করেছিল। তিন মাসের মধ্যে বিয়ে না করলে নোটিশ বাতিল হয়। ঝন্‌কা চিঠিতে বারবার এই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে অমরকে। চিঠি পড়েই সব কিছু বন্দোবস্ত করে অমর ফিরে এসেছিল কলকাতায়, ঝন্‌কাও তার রৌঢ়কেল্লার আত্মীয়ের বাড়ি থেকে কিছু না বলে পালিয়ে এসে উঠেছিল তার বন্ধুর বাড়িতে।

ঝন্‌কাকে আলিপুরদুয়ারে নিয়ে গেলেও সমস্যা রইল বেকার জীবনের। এবার অমর নিজেও চিন্তা করছে কি করে প্রতিপালনের দায় সে নিজেই বহন করতে পারে। তাই সুস্থির হয়ে থাকতে পারল না আলিপুরদুয়ারে। তিন চার মাস পরে ফিরে এল কলকাতায়।

এসেই সুখবর দিল, ঝন্‌কা মা হতে চলেছে।

অমর, ঝন্‌কা ও শ্রেয়সীর পক্ষে অবশ্যই এটা সুখবর কিন্তু যতান খবর শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। বেকার পুত্রের সন্তান মোটেই যতীন কামনা করে না। জনসংখ্যা বৃদ্ধি যতীন সহ্য করতে রাজি নয়। ঝন্‌কা এসে সংসারের জনসংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। এরপর ঝন্‌কার সন্তান মানেই নানা ভাবে ব্যয়বৃদ্ধি।

রাতের বেলায় যতীন শ্রেয়সীকে বলল, অমর বেকার।

তাতে কি হয়েছে ?

যে নিজের পেট চালাতে পারে না সে তার ছেলেকে কি খাওয়াবে, কি করে বড় করবে, এসব ভেবেছ কি ?

ওসব ভগবানের ওপর ছেড়ে দাও। ছেলে চিরকাল বেকার থাকবে এমন চিন্তা কেন করছ ? দায় ঘাড়ে নিয়েছে। দায়িত্ব পালনের চেষ্টা তাকে করতেই হবে। সে চিন্তা তোমাকে করতে হবে না।

যতীন ক্ষিপ্তের মত বলল, তুই চিন্তা করেই তো দুটো মেয়েকে বেচে দিয়েছিস। আর দুটোও একই পথ ধরবে। এটাও নিশ্চত। ছেলেটা মেয়েমানুষ ধরে এনেছে। তাদের ভোজন করাতে হবে আমাকে।

বললাম তো, সে চিন্তা তোমাকে করতে হবে না।

করতে হবে না ! গুণধর ছেলে। তার জন্য অতগুলো টাকা জলে গেল। আবার তার বউ পালতে হবে, ছেলে পালতে হবে। চমৎকার।

ছেলেকে খালাস করতে তুমি একটা পয়সাও খরচ করনি। অনর্থক দোষারোপ কর না।

তোর টাকা। তা বটে, তবে ওদের আমি পালতে পারব না বলে রাখছি।

শ্রেয়সী চুপ করে গেল। কথায় কথা বাড়ে, অশান্তির সৃষ্টি হয়। যতীনের মত পাষণ্ড যা-তা করে বসতে পারে। তার চেয়ে যতীন বলুক। বাদপ্রতিবাদ করে লাভ নেই। পথ একটা খুঁজতেই হবে। অমরকে চাপ দিতে হবে কাজ খুঁজে নেবার। অন্তত নিজেদের খরচটা তুলতে পারলেই যথেষ্ট। অমরকে বুঝিয়ে বলে কিন্তু অমর সারাদিন জায়গায় জায়গায় ঘুরে নিরাশ হয়ে ফিরে আসে। তার ওপর জুলুম করাটা অন্যায় হবে। অথচ প্রতিদিন যতীনের ঝক্কি শুনতে শুনতে অস্থির হয়ে উঠতে হয়েছে।

প্রতিদিনই মায়ের অনুরোধ শোনে কিন্তু জবাব খুঁজে পায় না অমর। সকাল থেকে হন্যে হয়ে ঘোরে কাজের চেষ্টায়। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের দরজায় দরজায় ঢুঁ মেরেও কোন ফল হয়নি। বিকেলবেলায় শ্রান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে চুপ করে ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়ে। ঝন্‌কা বুঝতে পারে সবই, প্রবোধ দেয়, উৎসাহ দেয় তবুও সে সজাগ থাকে ঘটনার গতিপথ সম্বন্ধে।

ঝন্‌কা বলে, আমার সঙ্গে কিছু টাকা আছে, তা দিয়ে বর্তমানে খরচ চালিয়ে যাও।

যা তোমাকে দিতে পারিনি তা আমি নিতে পারব না ঝন্‌কা। তোমার বিপদ সামনে। সেই বিপদ থেকে বাঁচার পথ খুঁজছি।

ঝন্‌কা যেমন অমরকে উৎসাহিত করে অমরও তেমনি নিজের মনোভাব গোপন রেখে ঝন্‌কাকে নানা কথায় ভুলিয়ে রাখতে চায়।

এতদিন যতীন ঝন্‌কা সম্বন্ধে কোন আগ্রহ দেখায়নি। হঠাৎ দেখা গেল ঝন্‌কার স্বাস্থ্য নিয়ে সে বেশী চিন্তিত। একদিন সরাসরি অমরকে ডেকে বলল, বউমাকে ডাক্তার দেখাও।

অমর লজ্জিত ভাবে বলল, ভাবছি তো নিয়ে যাব ডাক্তারের কাছে, কিন্তু!—

কিন্তু কি? টাকা? সেজন্য তোকে ভাবতে হবে না। তিন মাস তো হয়ে গেল এই সময় মেয়েদের নাকি যত্নে ও সাবধানে রাখতে হয়।

অমর মনে মনে খুশী হল কিন্তু ডাক্তার দেখাবার প্রয়োজন কতটা জানে শুধু শ্রেয়সী। এ বিপদে সে কোন কথাই বলেনি। সামনে যে ভয়ঙ্কর পরিণতি হাতছানি দিচ্ছে তা বুঝেই সে চুপ করে গেছে।

অমর মাকে জিজ্ঞেস করল, বাবা ঝন্‌কাকে ডাক্তার দেখাতে বলেছে।

ভাল। প্রথম পোয়াতি, প্রথম থেকেই ব্যবস্থা নেওয়া ভাল। তোর বাবা বলছিল স্নেহময় ডাক্তারের নার্সিং হোমে নিয়ে যেতে। সেই হয়ত নিজেই নিয়ে যাবে।

ঝন্‌কাকে নিয়ে অমর আর শ্রেয়সী গিয়েছিল নার্সিং হোমে। নার্সিং হোমের অধিকর্তার সঙ্গে আগেই কথা বলে রেখেছিল যতীন।

অনেক পরীক্ষানিরীক্ষার পর ডাক্তার অভিমত দিল রুগীর অবস্থা ভাল নয়। রুগীকে বাঁচাতে হলে গর্ভপাত করানো দরকার। এর জন্য বিলম্ব করা উচিত নয়।

চমকে উঠল অমর। ভয়ও পেল।

ঝন্‌কার জীবন বাঁচানোটা অমরের কাম্য।

শ্রেয়সীও অমরকে বলল, গর্ভপাত না করালে ঝন্‌কার জীবনসংশয় হবে। যতীন কপট অভিনয় করে বলল, তা হলে গর্ভপাত করাও। কিন্তু ঝন্‌কা রাজি হবে কি ?

রাজি করাতে হবে।

দরকার কি ওর সম্মতি নিয়ে। ডাক্তারের সঙ্গে পাকা বন্দোবস্ত করে আসছি। নার্সিং হোমে নিয়ে গেলেই যা করার ডাক্তাররাই করবে।

আবার ঝন্‌কাকে নিয়ে যাওয়া হল নার্সিং হোমে। সব বন্দোবস্ত করেই রেখেছিল যতীন।

ঝন্‌কা হারালো মাতৃত্ব লাভের অপরিসীম আনন্দ। যখন তার জ্ঞান হল তখনই বুঝতে পারল কি সর্বনাশ তার ঘটেছে। ঝন্‌কা চিৎকার করে উঠল।

এ কি করলেন ডাক্তারবাবু!

আপনার স্বামীর ইচ্ছাতেই আমাদের করতে হয়েছে।

স্বামীর ইচ্ছা শুনেই ঝন্‌কা প্রথমে নেতিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যে ক্ষিপ্তের মত বলল, অমর কোথায় ?

বাইরে অমর দাঁড়িয়েছিল। ঝন্‌কার ডাক শুনে ভেতরে এসে দাঁড়াল ঝন্‌কার বেডের পাশে।

আমার সর্বনাশটা তুমিই করলে ?

অমর মুখ নীচু করে বলল, তোমাকে বাঁচাতে এটা করতে হয়েছে।

না। তোমরা চক্রান্ত করে এটা করেছ। এর ফল তোমাকে পেতে হবে।

অমর মুখ নীচু করে কিছু বলতে উদ্যত হতেই ঝন্‌কা তার চুলের মুঠি চেপে ধরে ক্ষিপ্তের মত চিৎকার করে বলল, মিথ্যা কথা। আমার কোন রোগ ছিল না, নেইও। তোমরা চক্রান্ত করে আমার সর্বনাশ করেছ। কোন দিনই তোমাদের ক্ষমা করব না, করব না।

অমর কোন রকমে চুলের মুঠি ছাড়িয়ে বলল, চক্রান্ত নয়। প্রয়োজন ছিল। আমি বেকার। আমার সামর্থ্য নেই তোমাদের দায় বইবার। তাই।

তাই নরহত্যা করলে। আমাকে মাতৃত্বের স্বাদ থেকে বঞ্চিত করলে। বেশ। তোমাকে তো বলেছিলাম, তুমি কাজ খোঁজ। পাঁচ বছর তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। আমিই চালিয়ে নেব। প্রতি মাসে তোমাকে যথেষ্ট টাকা দিচ্ছি, তাতেও খুশী নও। একি করলে অমর। তোমাদের তো আর মানুষ মনে করতে পারছি না। তোমরা অমানুষ, পশু।

ঝন্‌কা রাগ সম্বরণ করতে করতে কেঁদে ফেলল।

নার্সিং হোম থেকে ঝন্‌কা বাড়ি ফিরেছে।

তার কাঁদার যেন শেষ নেই।

ঝন্‌কা বিছানা ছেড়ে নড়াচড়া করছে।

শ্রেয়সী রান্না করছিল। ধীরে ধীরে তার পাশে এসে বসল ঝন্‌কা।

কিছু বলতে চাও বউমা?

আমি জানতে এসেছি আপনি মা হয়ে আমার এমন সর্বনাশ কেন করলেন?

সর্বনাশ কেন বলছ বউমা?

হ্যাঁ, আপনারা যুক্তি পরামর্শ করে আমার সন্তানকে খুন করেছেন। কেন? কি অপরাধ করেছি? আপনি তো মা। মা হয়ে অন্যায়টা কেন করলেন, সেটা জানতে এসেছি। আপনার ছেলে স্বীকার করেছে, আমার সর্বনাশ করতে আপনারা জোটবদ্ধ হয়েছিলেন।

আমার কথা বিশ্বাস কর বউমা। আমি এর কিছুই জানি না। অমর আর তার বাবা বোধ হয় যুক্তি পরামর্শ করে এই কাজ করিয়েছে।

যে যা করে তার ফল তাকেই পেতে হয়।

শ্রেয়সী মুখ নীচু করে ডালকাঁটা ঘোরাতে থাকে।

ঝন্‌কা বলল, ওরা তো আমাকে বলতে পারত। আমার সম্মতি নেবার কোন দরকার কি ছিল না?

আমার মনে হয় তুমি সম্মতি দিতে না বলেই গোপনে কাজ করেছে ওরা। আমিও হয়ত সম্মতি দিতাম না। সারা জীবন নিরুপায়ের মত দিন কাটিয়েছি, আজও আমি নিরুপায়। আমি অসম্মত হলেও তোমার শ্বশুর, কোন বাধানিষেধ শুনত না। কদিন আগেই বলেছিল, বিয়ের বছরেই বউ যদি বিয়োতে আরম্ভ করে তাহলে বাড়িতে আর পা দেবার জায়গা থাকবে না। পেটভর্তি কেউ খেতেও পাবে না।

বাড়িতে ঘুঘু চরবে। এর ওপর আমি কি বলতে পারি অথবা করতে পারি তুমিই বল। জোর করতে পারতাম যদি অমরের কিছু কাজ থাকত। তবে অমরও সম্মতি দিল।

মিছে কথা। অমর কদিন আগেও সন্তানকে কি ভাবে বড় ক'বে তার চার্ট তৈরী করেছে। অমরকে সম্মতি দিতে বাধ্য করা হয়েছে।

তা বলতে পার। তবে খারাপ তো কিছু হয়নি।

আপনারা তা বলতে পারেন। মা হবার যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করতে মাতৃত্বের আনন্দ, বিরাট পরিতৃপ্তিটা আপনিও তো জানেন।

ঠিক একই ভাবে শ্রেয়সী যতীনকেও আক্রমণ করল। যতীনের এই কাজকে কোন মতেই সমর্থন জানাতে পারেনি শ্রেয়সী। তার বাক্যবাণে যতীন অস্থির হয়ে উঠল, যতীন বুঝল প্রথম বয়সের শ্রেয়সী আর নেই। এখন সে মস্ত বড সংসারের সর্বময়ী কর্ত্রী। তাকে আর চোখ রাঙিয়ে লাঠিপেটা করে শান্ত করতে পারবে না। যতীন কেবলমাত্র বলল, বেশ করেছি। তারপর পালিয়ে আত্মরক্ষা করল।

সেদিন দুপুরে ঝন্‌কাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে শ্রেয়সী বলল, তোমাকে সব রকম সহযোগিতা আমি দেব। এমন ঘটনা আর কখনও ঘটতে দেব না। ওদের দুষ্ট বুদ্ধির কাছে হার মানতে হবে মাঝে মাঝে। মৃত সন্তান তো আর ফিরে পাবে না তবে এই অন্যায়ের উপযুক্ত জবাব আমি দেব। তুমি কেঁদ না। আমি এর একটা বিহিত না করে ছাড়ব না।

কয়েকদিন বিনা উত্তাপে কেটে গেল। রাতের বেলায় ঝন্‌কা এসে শ্রেয়সী পাশে শুয়ে থাকে। অমর নানাভাবে চেষ্টা করেও ঝন্‌কাকে তার ঘরে ফিরিয়ে আনতে পারেনি। অমর যত কথাই বলুক ঝন্‌কা একটা কথারও উত্তর দেয়নি। তবে কয়েক দিন যাবৎ দুপুরবেলায় খাওয়াদাওয়া করে ননদ অমিয়াকে নিয়ে বাপের বাড়িতে যেত। সারাদিন সেখানে কাটিয়ে সন্ধ্যাবেলায় ফিরে আসত। এতকাল সবাই মনে করেছে, ঝন্‌কার বিয়ে তার বাবা-মা মেনে নিতে পারেনি। সেজন্য ঝন্‌কা আর সহজে বাবা-মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু ঝন্‌কার ঘন ঘন বাপের বাড়ি যাওয়া দেখে সবাই বেশ আশ্চর্যই হয়েছিল। কেবলমাত্র শ্রেয়সী মনে মনে খুশী হয়েছিল বাবা-মায়ের কাছে ঝন্‌কাকে ফিরে যেতে দেখে। অমিয়া এসে যখন বলত, ঝন্‌কাকে তার বাবা-মা স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করেছে তখন পিতামাতার সঙ্গে মেয়ের এই মিলনকে বিশেষ ইঙ্গিতবহ মনে করেছিল। ক্রোধ ও অভিমানের সমাপ্তি ঘটল আর অপত্যস্নেহ পিতামাতাকে সন্তানের নিকট পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য করেছে জেনে উৎফুল্ল হল শ্রেয়সী।

ঝন্‌কাও মায়ের স্নেহ পেত শ্রেয়সীর কাছে। এই স্নেহবন্ধন মনে হয়েছিল ঝন্‌কার জীবনের সব বেদনা মুছে দেবে। অনিমা মাঝে মাঝেই আসত, বসে গল্প করত, কোন কোন দিন ঝন্‌কাকে নিয়ে মার্কেটিং-এ বের হত অথবা সিনেমায় যেত। সব কিছুই আপাতদৃষ্টিতে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। আজকাল মায়ের কাছে যেত কিন্তু কোন সময়ই অমিয়াকে ডেকে নিত না। একাই যেত, একাই ফিরে আসত।

একটি জায়গায় ঝন্‌কা ছিল ভীষণ জেদী। কোনক্রমেই তাকে অমরের ঘরে পাঠানো যায়নি। নার্সিং হোম থেকে ফিরে আসার পর থেকে স্বামী-স্ত্রীর বাক্যালাপও বন্ধ ছিল।

ঘটনার গতি পরিবর্তন হল মাস দুয়েক পরে।

সেদিন ঝন্‌কা একাই গিয়েছিল মায়ের কাছে। প্রতিদিনই বিকেলবেলায় সে ফিরে আসে অথচ সেদিন বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যা হল। সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত হল ঝন্‌কা তখনও ফিরল না। রাত দশটা বাজতেই সবার খেয়াল হল ঝন্‌কা তখনও ফেরেনি। শ্রেয়সী পাঠাল অমিয়াকে, ভম্বরমলের শরীর ভাল নয় শুনেছিল। কিছু খারাপও হতে পারে, সেজন্য দেরি হচ্ছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে অমিয়া সংবাদ নিয়ে এল, বউদি আজ তার বাপের বাড়িতে যায়নি।

সে কি! কোথায় গেল! একই প্রশ্ন সবার কাছে।

শ্রেয়সী যতীনকে পাঠাল সংবাদ আনতে। অমর অস্থির হয়ে উঠল।

অমরকে সঙ্গে করে যতীন গেল থানায়। নিরুদ্দেশের তালিকায় নামটাম দিয়ে যখন ফিরে এল তখন অনেক রাত।

যতীন ভেবেই পাচ্ছিল না এরপর কি করা যায়।

অমর পাগলের মত সবার কাছে যাচ্ছে, কোন সংবাদ যদি কেউ দেয় তারই প্রত্যাশায়, বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের দরজায় দরজায় ঘুরছে। কিন্তু নিষ্ফল চেষ্টা।

ঝন্‌কাকে খুঁজে না পেলেও তিনদিন পর চিঠি পেল ঝন্‌কার।

সংক্ষিপ্ত চিঠি, "তোমার মত পাপীর সঙ্গে এবং তোমার পরিবারের মত খুনী পরিবারে আমি থাকব না বলেই বাড়ি থেকে চলে এসেছি। তোমাদের সঙ্গে এখানেই আমার সম্পর্ক শেষ। আমি আমার এক বন্ধুর বাড়িতে যাচ্ছি। যথাসময়ে বিবাহ-বিচ্ছেদের নোটিশ পাবে।"

শ্রেয়সীর হাতে চিঠি তুলে দিয়ে অমর বলল, আমাকে বিনা অপরাধে পুলিসের হাতে তুলে দেবার শোধ নিয়েছিলাম ঝন্‌কাকে বিয়ে করে এবার উল্টোরথের দড়ির

টানে ভয়ঙ্কর শোধ নিল ডম্বরমল। যা ঘটল তার বুদ্ধিদাতা ডম্বরমল ভিন্ন আর কেউ নয়।

শ্রেয়সী চিঠি পড়ে ফেরত দিল অমরকে।

তুমি তো কিছু বলছ না মা?

ভাবছি, আমাকে অসহায় দুর্বল পেয়ে তোর বাবা যে অত্যাচার করেছে তার কণামাত্র যদি তুই করতিস তা হলে কি সর্বনাশা পরিস্থিতি হত। ঝন্‌কা খারাপ কিছু করেনি। অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে, জানিয়ে দিয়ে গেল, সবাই আমার মত মুখ বুজে স্বামীর শ্বশুড়বাড়ির অত্যাচার সহ্য করে না। অন্য কোন অঘটন ঘটেনি এটাই আমাদের ভাগ্য।

কি বলছ তুমি?

ঠিক বলছি। তবে ভাবতেও পারিনি ঝন্‌কা এ ভাবে এতদূর এগোবে। ও বুঝতে পারেনি ডাক্তারের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে তোরা ওর গর্ভের সন্তান নষ্ট করবি। অবশ্য তার মানসিকতা গড়ে তুলতে তার বাবা মা কলকাঠি নেড়েছে এটাও সত্যি। ঝন্‌কার তেজ আছে নইলে তোকে বিয়ে করত না। কিন্তু সেই তেজকে সম্মান করতে পারিসনি। বিশেষ করে তোর বাবা এখনও মনে করে মেয়েরা দাসীবাঁদীর জাত, সে ভাবেই তাদের রাখতে হবে।

তুমি বলতে চাও ঝন্‌কা কোন দোষ করেনি?

হ্যাঁ। তোর এবং তোর বাবার অপরাধ অমার্জনীয়। তবে একটি বড় ত্রুটি চোখে পড়ছে। মেয়েরা সব সময়ই মানিয়ে নিয়ে চলে, সেটা সে করতে পারত কিন্তু তা পারেনি কারণ সে তোদের কাউকেই বিশ্বাস করেনি। বিশ্বাসের ভিতে যদি ঘুণ ধরে তাকে মেরামত করা খুবই কঠিন।

অমর কোন উত্তর দিল না, কোন যুক্তিতর্ক করল না।

শ্রেয়সী মনে করল, অমর বোধহয় অবস্থাটা বুঝেছে, অবস্থা অনুসারে নিজের কর্তব্য পালন করবে।

চমকে উঠল অমরের চিৎকারে।

শালা ডম্বরমলকে আমি খুন করব। ওই শ্যালার পরামর্শেই ঝন্‌কা পালিয়েছে।

বলাটা যত সহজ করাটা অত সহজ নয়। তুই তোর বাবার পরামর্শে তোর সন্তানকে হত্যা করেছিলি, সেটা যতটা সহজে আইনের বেড়াজালকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হয়েছিল এটা অত সহজ নয়। মেয়েদের আলাদা সত্তা আছে এটা মেনে নিয়ে পথ খুঁজে দেখ যাতে ঝন্‌কাকে নিয়ে শান্তিতে ঘর করতে পারিস। আমিও বুঝতে

পারিনি ওর মনের কথা। স্নেহের আঁচল দিয়ে ওকে ঢেকে রেখেছিলাম ওর মনের ব্যথা দূর করতে। হেরে গেছি। এখন ভাবছি, আমি কে? তুই তো পারিসনি ওর মন জয় করতে। অবিশ্বাস আর ঘৃণা আর প্রতিহিংসা নিয়েই সে ফিরে গেছে।

আমিও জানি কি করে শোধ নিতে হয়।

শ্রেয়সী বাধা দিয়ে বলল, জাহাজের হাল ভেঙে গেলে জলের স্রোতেই তাকে ভাসতে হয়, ইচ্ছামত তা চালানো যায় না। তোর জাহাজের হাল ছিল ঝন্‌কা, সেই ভেঙে গেছে, যা করবি তাতেই বেহাল হতে হবে। সব কিছুই মেনে নিতে হয়। পথ খুঁজতে হয়। বিপথটা পথ নয়।

শালা ডম্বরমলকে তা বলে আমি ছাড়ছি না।

ওরকম কথা বলতে নেই খোকা। তোর বাবার মুখে ওসব খিস্তি খেউড় শুনেছি। তোর মুখে আর শুনতে চাই না। ওসব করলে কোন ফায়দা হয় না। সংসারে মান-সম্মান বাঁচিয়ে ভাল ভাবে থাকতে হলে সহ্যশক্তি দরকার হয়। একটা ভুল করে জ্বলে মরছিস, আর ভুল করিস না খোকা। এসবের পরিণতি কখনও ভাল হয় না। তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর কত ব্যথা বেদনা যন্ত্রণা অবমাননা সহ্য করে আমি ঘর করছি তোর বাবার সঙ্গে, কেন জানিস? তোদের মুখ চেয়ে কিন্তু তাও তো সুখের হয়নি। তোরা মানুষ হবি এই তো ছিল আশা, সে আশা পূরণ করতে পেরেছিস কি?

শ্রেয়সী চোখ মুছল। অমর একটি কথাও না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

।। ছয় ।।

অমর পর্বের তখনও যবনিকাপাত হয়নি এমন সময় সমস্যা হয়ে দেখা দিল অমিয়া।

আজকাল অমিয়া স্কুলে যায় না। মাধ্যমিক পাসটা যাতে করে তার জন্য শ্রেয়সীর চেষ্টার অবধি নেই কিন্তু অমিয়া সে পথে হাঁটতেই চায় না। পরপর দুবার অকৃত-কার্য হয়ে সে এখন পাঠ বিষয়ে জড়ত্ব লাভ করেছে। বাড়িতে আর থাকতে চায় না। বিকেল হলেই সেজেগুজে সে বেরিয়ে পড়ে। কোথায় যায় তা কারও জানা নেই। ফিরে আসে রাত দশটায়।

কিছুকাল যাবৎ সে খেয়েদেয়ে দুপুরেই বেরিয়ে পড়ে। ফেরে রাত দশটায়। শ্রেয়সী ক্রমেই যেন হতাশায় ভেঙে পড়তে থাকে। যখনই কোন সমস্যা দেখা দেয় ছুটে আসে মন্দাকিনীর কাছে। নানা পরামর্শ করে।

মন্দাকিনী তার কেউ নয় অথচ দিদি। প্রথম শ্রেয়সী এসেছিল অনেক কাল আগে অসীমাকে কোলে করে, আজও সে আসে। কোলের ছেলেরা এখন আর কোলে নেই। তারাই কোল পেতে নিজেদের ছেলে মেয়ে নিয়ে ঘুরে বেড়াবার বয়সে পৌঁছেছে। যত বার নতুন নতুন সন্তান কোলে করে শ্রেয়সী এসেছে মন্দাকিনীর কাছে ততবারই তাকে বলেছে, এবার রেহাই নে শ্রেয়। আর নয়। শ্রেয়সী লজ্জা পেয়েছে। ক্ষিপ্ত হয়েছে। বলেছে, আপনার ভাইকে বলুন দিদি, সে যে একটা দানব। তার কথা অমান্য করলে আমার পিঠের চামড়া যাও বা আছে তাও থাকবে না। আমাদের মত মেয়েরা কতটা অসহায় তা তো জানেন। তবুও মন্দাকিনী বলেছে, তুই তো সংযত হতে পারিস। শ্রেয়সী বলেছে, কপাল হল বছর বছর কাঁথা সেলাই করা, সে কপাল যাবে কোথায়!

শ্রেয়সী হয়ত চায় না পর পর এত সন্তান কিন্তু দেড়-দু বছরের মাথায় নতুন শিশুটাকে কোলে নিয়ে মন্দাকিনীর কাছে এসেছে, কেঁদেছে, তার অসহায় অবস্থার কথা বলেছে।

মন্দাকিনীর অর্থভাণ্ডার সব সময় খোলা থাকে শ্রেয়সীর জন্য। শ্রেয়সীও যা কিছু সঞ্চয় করত তা এনে দিত মন্দাকিনীকে। এই লেনদেন ছিল অন্যের অজানা। মন্দাকিনী মাঝে মাঝেই শ্রেয়সীকে বলত, তোর টাকা তুই নিয়ে যা শ্রেয়। কবে মরে যাব তার ঠিক নেই, তোর টাকার হিসাব হবে না। ফেরতও পাবি না। বরং টাকাটা কোন ব্যাঙ্কে রেখে দিস। তাতে লাভ ছাড়া লোকসান হবে না। ফেরত পেতে অসুবিধা হবে না। মন্দাকিনীর ইচ্ছায় শ্রেয়সীর অ্যাকাউন্ট করে দিতে হয়েছে। এতে মন্দাকিনীও খুশী, শ্রেয়সীও নিশ্চিন্ত।

পারিবারিক যে কোন অশান্তিই-হোক না কেন শ্রেয়সী সুযোগ বুঝে ছুটে আসত মন্দাকিনীর কাছে। পরামর্শ করত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দুজনে কি যে আলোচনা করত তা অপরে জানত না। এমন কি আমিও জানতাম না। যখন কোন সমস্যা কঠিন হত এবং তারা দুজনে তার সমাধানের পথ খুঁজে পেত না তখনই গৃহিণী আমাকে বলতেন, সাহায্যও করতাম।

অমর সমস্যা নিয়ে শ্রেয়সী বার বার এসেছে। ঘুষের টাকার কিছুটা অংশ মন্দাকিনীর গরীব ভাণ্ডার থেকেও বোধহয় গেছে। আমি কোন প্রশ্ন করলে বলেছে, আমার তো কেউ নেই। না ছেলে না মেয়ে, কে ভোগ করবে আমার সঞ্চয় বরং এতে যদি ওই দুঃখী মেয়েটার কিছুটা বিপদ কাটে তাতে তোমার নজর দেবার কোন প্রয়োজন নেই। সবাই তো সুখের সংসারে নিরাপদে থাকতে চায়।

আমার টাকায় তার সুখ না হলেও কিছুটা নিরাপত্তা তো আসবে। শ্রেয়সীকে পথে পথে ঘুরতে হবে না।

মন্দাকিনীর যুক্তিকে অগ্রাহ্য করতে পারিনি তবুও বলেছি, আমাদের কোন আর্থিক অসুবিধা হলে কিন্তু কেউ আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে না।

কোনদিন অসুবিধা হবে বলে মনে করি না, তবে যদি কখনও হয় তখন নিশ্চয়ই কেউ সাহায্য করবে। তবু তুমি যে ভাবে বলছ তাতে তোমার মনের পরিচয় খুব প্রশংসার যোগ্য নয়।

এরপর আমার কোন কথা বলার নেই।

এসবই পুরনো কথা। এরই পটভূমিকায় গড়ে উঠেছে শ্রেয়সী সমাচার যার পরের অধ্যায় আমার জ্ঞাতসারে ঘটেনি। সবই শোনা কথা। বলেছেন গৃহিণী, শুনেছি আমি, তাও শ্রেয়সীর মৃত্যুর পর।

অমর সমস্যা মিটতে না মিটতে অমিয়ার সমস্যা।

শ্রেয়সী অমিয়ার চালচলন দেখে চিন্তিত। যে মনোবল নিয়ে শ্রেয়সী এতকাল সংসারের সঙ্গে লড়াই করেছে সে মনোবল এবার ভেঙে পড়ার উপক্রম। অসীমা ও অনিমা তবুও তো বিয়ে করে ঘর করছে। অমিয়ার আচরণই আলাদা। বিয়ে করে সংসার সাজাবার ইচ্ছা তার আছে বলে মনে হয় না। সে যেন মধুচক্রের মক্ষিরাণী হয়ে ঘুরতে চায়। চিন্তায় চিন্তায় শ্রেয়সী ভেঙে পড়তে থাকে। রাতে ভাল করে ঘুম হয় না, খিদে থাকলেও খেতে ইচ্ছে হয় না। অথচ সংসারের হাল ধরে থাকার জন্য অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করতে হয়।

সকাল বেলায় রান্নার যোগাড় করে সবেমাত্র ঘর থেকে বেরিয়েছে তখনই ঘটনাটা ঘটল। শ্রেয়সীর মনে হল ভূমিকম্প হচ্ছে। চোখের সামনে সব কিছু হলুদ, কানের কাছে যেন ঝিঁঝি পোকা ডাকছে। শ্রেয়সী পড়তে পড়তে কোন রকমে দেওয়াল ধরে বসে পড়ল। নিজের অজান্তেই সে চিৎকার করেছিল। চিৎকার শুনে অমর বিছানায় লাফ দিয়ে উঠে বসল। ছুটে বের হল ঘর থেকে। বেরিয়েই দেখতে পেল তার মা দেওয়াল ধরে বসে রয়েছে, তার গলা দিয়ে অদ্ভুত একটা শব্দ বেরিয়ে আসছে। অমর চিৎকার করে ডাকল সবাইকে। সবাই মিলে ধরাধরি করে তাকে শুইয়ে দিল বিছানায়। অমর ছুটল ডাক্তারের খোঁজে, অমর আর অমিয়া মাথায় জল দিতে থাকে, খুব জোরে পাখা চালিয়ে দেয়। সবাই তার মুখের দিকে তাকিয়ে, সবাই চায় শ্রেয়সী চোখ খুলে দেখুক।

যতীনও উঠে এসেছিল। অনেকক্ষণ শ্রেয়সীর দিকে তাকিয়ে বলল, মাগী ভাগ্-

মতীর খেল্ দেখাচ্ছে।

যার উদ্দেশ্য এই মন্তব্য সে তখন অচৈতন্য।

প্রতিবাদ জানাল অমল। বলল, তোমার মনে কি একটুও দরদ নেই!

কি বললি?

ঠিক বলেছি। মায়ের এই অবস্থা দেখেও তুমি তাকে গালিগালাজ করছ। যাও এখান থেকে। যা করার আমরাই করব।

অনিমা খবর পেয়ে ছুটে এসেছিল। সেও শুনতে পেয়েছিল যতীনের মন্তব্য। তার সারা দেহ রি-রি করে উঠলেও কিছু বলতে পারল না। অমর ফিরে আসতেই জিজ্ঞাসা করল, পেলি কোন ডাক্তার?

পেয়েছি। এখুনি আসবে। সকাল বেলায় ঘুম ভাঙিয়ে ডাক্তার আনা কি সহজ!

শ্রেয়সীর সন্তানরা যতীনের ওপর বীতশ্রদ্ধ হলেও তারা শ্রেয়সীর প্রথম জীবনের কোন অবস্থা দেখেনি। কিন্তু জ্ঞান হবার পর যা দেখেছে তাতেই তারা অনেক সময় যতীনের উপর মারমুখী হয়ে উঠেছে। মৃদু প্রতিবাদ না জানিয়ে কেউ ক্ষান্ত হয় না। বিশেষ করে অমর, অমল আর অনিমা সব সময়ই শ্রেয়সীকে পাহারা দেয়। কোন রকমে মায়ের যাতে কষ্ট না হয় সেদিকে কড়া নজর রাখে।

ডাক্তার এসে দেখল। পরীক্ষা করে বলল, উচ্চ রক্তচাপের জন্য এটা হয়েছে। খুবই সৌভাগ্য যে রুগী গড়িয়ে পড়েনি তা হলে আর বাঁচত না। রুগীর বিশ্রাম দরকার। মানসিক কোন রকম উত্তেজনা যাতে না হয় তা লক্ষ্য রাখতে হবে। কোন রকম পরিশ্রম করতে দেওয়া নিষেধ। অন্তত পনর দিন মাথা নীচু করে এইভাবে শুয়ে থাকবে। নুন খাওয়া কিছু কাল বন্ধ। দরকার হলেও পনরদিন পরেও বিছানা থেকে ওঠা বন্ধ। আবার আমি দেখে তবেই যা করার তা বলে দেব।

অনিমা সব শুনে ছুটে গেল মন্দাকিনীকে খবর দিতে।

ওষুধপত্রের ব্যবস্থাও হল।

মন্দাকিনী এসে দেখে যায় দু বেলা।

কয়েকদিনের মধ্যে শ্রেয়সী সামলে নিলেও তাকে কোন কাজ করতে দিত না তার দুই ছেলে।

শোন্ শ্রেয়, ছেলে-মেয়ে ছেলে-মেয়ে করেই তোর এই দুরবস্থা। ওরা বড় হয়েছে। ওদের ছেড়ে দে। নিজের মত ওদের চলতে দে।

কথাটা বলেছিল মন্দাকিনী কিন্তু শ্রেয়সী সব বুঝেও অবুঝ থেকে গেল। সারা

জীবন দুঃখ কষ্ট নির্যাতন অপবাদ লাঞ্ছনা সহ্য করেছে। তবুও সে চিন্তা করেছে, ছেলে-মেয়েরা দাঁড়াতে পারলে আমার কোন দুঃখ থাকবে না।'

বিধির বিধান অলঙ্ঘনীয়।

একটা ভুলের মাশুল সারা জীবনে দিয়ে শেষ করতে পারেনি।

শ্রেয়সী উঠে বসেছে। ছোটখাটো গেরস্থালি কাজও করছে এমন সময় উকিলের

ঝন্‌কার উকিল বিবাহবিচ্ছেদের নোটিশ পাঠিয়েছে।

অমর বোধহয় এর জন্য প্রস্তুত ছিল। শ্রেয়সীর সামনে নোটিশটা তুলে ধরে বলল, একটা অধ্যায় শেষ।

শ্রেয়সী গম্ভীরভাবে বলল, ওর যা ইচ্ছে করুক তুই যেন আদালতে যাসনি। যা হয় একতরফা হবে। ভাঙা কাঁচ জোড়া দেওয়া যায় না। বুঝলি!

এটা অনেক দিন আগেই অমর বুঝেছিল তাই তার মন্তব্য হল, একটি অধ্যায় শেষ।

অমর বলল, আমি বিবাহবিচ্ছেদ মেনে নেব। ঝন্‌কাকে নিয়ে ঘর করতে পারব না তা অনেক আগেই বুঝতে পেরেছি। এরা ঘর ভাঙে, জোড়া দেয় না। বাপের ঘর ভেঙে আমার কাছে এসেছিল। আমার ঘর ভেঙে আরেকজনের ঘরে যাবে, সেটাও ভাঙবে।

শ্রেয়সী মৃদু প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, দোষটা একতরফা নয় খোকা। আমাদের ত্রুটিটা ছোট করে দেখিস না।

তা ঠিক তবে একটা অন্যায়কে সংশোধন করতে আরেকটা অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া কি উচিত?

শ্রেয়সী গম্ভীরভাবে বলল, আমরা বিচারক নই। অন্যায় কে যে করেছে তা সময়কালে ফলাফলের ওপরই প্রমাণিত হবে।

ঝন্‌কা মুক্ত হয়েছে আদালতের আদেশে। অমর আদালতে হাজিরও হয়নি আত্মপক্ষ সমর্থনও করেনি। তার বিরুদ্ধে যতগুলো অভিযোগ ছিল তা নতমস্তকে মেনে নিতে হয়েছে।

যতীনের পরিবারের হালচাল দেখলে মনে হয় কোথাও কোন অশান্তি নেই। ঝন্‌কার নিষ্ক্রমণ পূর্ণ শান্তি এনে দিয়েছে বলেই মনে হয়েছে।

অমিয়া কোথায় যায় তার কোন খবর কেউ রাখে না। একদিন তার মুখে শোনা গেল, শুনছ মা, বউদির সঙ্গে আজ দেখা হয়েছিল।

শ্রেয়সী শুধু হুঁ বলে প্রসঙ্গ চাপা দিতে চাইলেও অমিয়া থামল না।

তার সঙ্গের মেয়েটা বলল, ঝন্‌কা বউদি নাকি আজকাল মডেল হচ্ছে, অনেক পয়সা উপায় করছে।

ভাল।

তোমার কথা বললাম। বলল, তোমার মা! মস্ত বড় শয়তান। ওর কথা শুনতে চাই না। দাদার কথা বলতেই রাস্তার মধ্যে তেড়ে এল। বলল, ওকে আমি ঘৃণা করি। তারপরই বেশ শান্ত হয়ে বলল, ওসব পুরনো কথা শুনতে চাই না। ওটা দুঃস্বপ্নের দিন। ভুলতে চাই।

শ্রেয়সী সব শুনে চুপ করে রইল।

ঝন্‌কাকে সে কতটা ভালবাসত তা অন্যে না জানলেও ঝন্‌কা তো জানত। অথচ যাক। কয়েকদিন পর সত্যি সত্যিই সাবানের কার্টুনে ঝন্‌কার ছবি দেখে সবাই বিশ্বাস করল।

কিন্তু কেন সে এই জীবিকা গ্রহণ করেছে সে বিষয়ে কারও কোন কৌতূহল ছিল না। তবে ঝন্‌কা সুন্দরী, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, সব দিক থেকেই মডেলের উপযুক্ত এটা কেউ অস্বীকার করতে পারেনি।

অমর খবরটা শুনেছিল। কার্টুন দেখে আশ্চর্য হয়নি।

ঝন্‌কা নেই। তার স্মৃতির বেদনা শ্রেয়সীকে অনেক সময় অন্যমনস্ক করে তোলে। কিন্তু পৃথিবীর গতি তো স্তব্ধ হয়ে থাকে না, যেমন চলছিল তেমনি চলছে। মনের কোনায় আঁচড় ছিল তাও ধীরে ধীরে ঝাপসা হতে থাকে। গোটা পরিবারে ঝন্‌কা নিয়ে কেউ আর আলোচনা করে না।

ব্যথাটা যে কারণ হয়ে শ্রেয়সীর বক্ষপঞ্জর ভেদ করছিল তা সে কাউকে বলতে পারছিল না। সত্যি সত্যি ঝন্‌কা চিরদিনের জন্য পর হয়ে গেল। শ্রেয়সীর কাছে জমা রইল গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলার অবকাশ।

মন্দাকিনী কয়েকদিন ধরে একনাগাড়ে সকালে বিকালে বাড়ির কাজ করার মেয়েটাকে পাঠাতো শ্রেয়সীর খবর নিতে। এ সব আমার জানার কথা নয়। তবুও মন্দাকিনীর উপরোধে একদিন তার সঙ্গে যেতে হল শ্রেয়সীর বাড়িতে।

সদরেই যতীনের সঙ্গে দেখা। দেখামাত্র হাঁক ছাড়ল, ওরে ও অমিয়া তোমার মাকে বল দিদি আর দাদাবাবু এসেছেন।

মন্দাকিনী দোতালার সিঁড়িতে পা দিলেন।

আমি যতীনকে জিজ্ঞাসা করলাম, শ্রেয় কেমন আছে ?

একটু ভাল। ওষুধপত্র করে প্রেসারটা কমেছে। তবে বিশেষ নড়াচড়া করে না। কিন্তু দাদাবাবু, এতটা প্রেসার যে বেড়েছে তা কখনও কাউকে বলেনি।

হেসে বললাম, রুগী রোগকে ভোগ করে। রোগের ডাইগোনেসিস সে করতে পারে কি ? ডাক্তার বলতে পারে রোগটা কি। এ এমন রোগ যা সাধারণ মানুষ বুঝতেই পারে না। আগের দিনে এ রোগে মানুষ মারা গেলে বলত, সন্ন্যাস রোগ। অর্থাৎ মরণটা অতি সহজভাবে গ্রহণ করত।

ডাক্তারবাবু যা বললেন তাতে মনে হচ্ছে ছেলে-মেয়েদের জন্যেই রক্তের চাপ বেড়েছে। সারাদিন যদি নানা ভাবে চিন্তা করে উত্তেজনা হবেই। তাতে রোগ বৃদ্ধি পায়। চলুন ওপরে। আর কি বলবে! সারাদিন ছেলে-ছেলে, মেয়ে-মেয়ে করে পাগল। তারপর তাদের কীর্তি তো শুনেছেন। এসব ঝক্কি ঝামেলা সইতে পারছে না। নিজের দেহটার ওপর নজর দেবার সময় কোথায় বলুন! আসুন এই ঘরে, পাশের ঘরেই আপনাদের শ্রেয় আছে। দিদিও ওখানেই বোধহয় গেছে।

যতীনের সঙ্গেই শ্রেয়সীর ঘরে ঢুকলাম।

দেখলাম শ্রেয়সী বালিশ হেলান দিয়ে বসে আছে। মন্দাকিনী তার পাশে বসে।

জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন শ্রেয় ?

মোটামুটি তবে বিশ্বাস নেই।

বললাম, তুমি বলতে চাও, ভালও নও, মন্দও নও।

শুকনো হাসি ফুটে উঠল তার মুখে, বলল, আর ভাল কখনও হব না দাদাবাবু। ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে আরও কিছুকাল কাটিয়ে দিতে পারলেই যথেষ্ট।

আমার যে অনেক কাজ বাকি।

কাজ, বলেই থেমে গেল শ্রেয়সী। অনেকক্ষণ মন্দাকিনীর মুখে দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, ছাই, আমি কাজ করার কে! যাঁর কাজ তিনিই করবেন।

মন্দাকিনী আমাকে বললেন, তুমি পাশের ঘরে গিয়ে বস। যতীনের সঙ্গে গল্প কর।

যথা আজ্ঞা, যতীনের সঙ্গেই পাশের ঘরে গিয়ে বসলাম।

যতীন বেশ ক্ষোভের সঙ্গে বলল, শুনলেন তো, যেতে পারলেই বাঁচে! কঠিন মহিলা। ওর ভরা সংসার। ছেলে মেয়ে নাতি নাতনী নিয়ে স্বাদ আহ্লাদ করবে, তা নয়, গেলেই বাঁচে। এখন কি যাবার সময় হয়েছে!

চেয়ার টেনে বসতে বসতে বললাম, অনেকে বেঁচে মরে, অনেকে মরেই বাঁচে।

যতীনের চোখ ছলছল করছিল। তাই দেখে আমি আর কথা বাড়ালাম না। বিমূঢ়ের মত তার মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম, সত্যিই যতীন শ্রেয়সীকে হারাবার ভয়ে একেবারে আত্মহারা হয়ে গেছে।

বললাম, ভয় পেও না যতীন। শীগ্‌গিরই আরাম হয়ে যাবে। ধাক্কা কাটিয়ে তো এক মাস পেরিয়েছে, আর কোন ভয়ের কিছু নেই। এখন তো নড়াচড়া করছে। দেখবে সব সামলে নেবে। সাবধানে থাকতে হবে।

এসব কথা শ্রেয়কে বলবেন। আমার কথা মোটেই শুনতে চায় না। আপনি বললে বোধহয় শুনবে, দিদির বাক্য ওর কাছে বেদবাক্য। দিদিকে বলতে বলবেন।

সান্ত্বনাসূচক কতকগুলো অবান্তর কথা শুনিয়ে মন্দাকিনীর হাত ধরে যখন রাস্তায় দাঁড়ালাম তখন মন্দাকিনী বলল, রিক্সা ডাকতে হবে না, হেঁটেই চল।

হাঁটতে হাঁটতে বললাম যতীন তো ভেঙে পড়েছে। তার ভয় শ্রেয়সী বোধহয় বাঁচবে না।

মন্দাকিনী রুক্ষভাবে বললেন, বাঁচাটা যতীন চায় না।

কি বলছ?

হ্যাঁ গো হ্যাঁ।

কিন্তু শ্রেয়সীর কথা বলতে বলতে ওর চোখ ছলছল করে উঠেছিল।

অভিনয়। ওসব তুমি বুঝবে না। শ্রেয়সী মরতে চায়। এবার সামলে নিলেও, মৃত্যু ওর দোরগোড়ায়। তবে হঠাৎ কিছু হবে না। চলাফেরাও করবে তবুও ভয়ের। যে কোন সময় মারা যেতে পারে। যতীনের মত অমানুষ পশুর হাত থেকে বাঁচতে মৃত্যুই তার আশ্রয়। ফাঁসির আসামী ভিন্ন মৃত্যুর দিন তো কারও স্থির থাকে না, অনেক ফাঁসির আসামীও খালাস পায় কিন্তু মৃত্যুটা বিলম্বিত হয়, তাই ফাঁসির আসামীর মত শ্রেয়সীর মৃত্যুর তারিখ স্থির হয়েও তা সাময়িকভাবে বন্ধ হয়েছে। নইলে এতদিন ওর বেঁচে থাকার কথা নয়।

আমি নীরব শ্রোতা। মন্দাকিনীই জানে শ্রেয়সীর মনের কথা। তার কাছ থেকে শুনেছিলাম সবটাই শ্রেয়সীর মৃত্যুর পর।

শ্রেয়সী নানা ভাবে প্রবোধ দিত অমরকে।

অমরও ধীরে ধীরে সব কিছু ভুলে কাজের চেষ্টায় ঘুরছিল। একদিন বাড়ি ফিরেই শ্রেয়সীকে বলল, অমিয়াকে আজ দেখলাম ধর্মতলার বাসস্ট্যাণ্ডে একটা

ছেলের সঙ্গে।

আমাদের পাড়ার ছেলে?

তা হলে তো চিনতাম। বে-পাড়ার ছেলে, ভাবভঙ্গী খুব ভাল মনে হল না।

তুই কিছু বলিসনি তো?

আমাকে দেখতেই পায়নি।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, এসব আমার ভাল লাগে না।

শ্রেয়সী হঠাৎ গলার শব্দ বদলে বলল, তোর কাজটা নিশ্চয়ই ভাল হয়েছিল! কাজটা ভাল হলে আজ ঝন্‌কা কি ঘর ছাড়ত? কে যে ভাল কাজ করে তা বুঝতে খুবই সময় দরকার। কাজের ফল দিয়েই কাজের বিচার করতে হয়। যার শেষ ভাল তার সব ভাল।

তুমি তোমার মেয়েদের সমর্থন করছ?

না রে না। সমর্থন করছি না। সব সময় সতর্ক থাকি যাতে আমার মত বোকামি না করে। তবুও বলব অসীমা বিনয়ের সঙ্গে সুখেই ঘর করছে। অনিমার কোন অভিযোগ নেই বান্টুর বিরুদ্ধে। অনিমা তার পঙ্গু স্বামীকে ছেড়ে চলে আসেনি, সেও ঘর করছে। তুই পারলি না। তাই সমর্থন করার কথা না তোলাই ভাল।

অমর শক্ত ভাবে বলল, পারিনি তোমার জন্য।

আমার জন্য?

তোমার জন্য না হলেও, বাবার জন্য। বাবাই তো ডাক্তারের সঙ্গে যুক্তি করে ঝন্‌কার গর্ভপাত ঘটিয়েছিল। আমি তো নিমিত্ত মাত্র, সই করেছিলাম। তার পরিণতি যে এত খারাপ হবে তা কি জানতাম। এই ঘটনা না ঘটলে ঝন্‌কা কখনই আমাদের ছেড়ে যেত না।

তুই সই না করলে এমন ঘটনা ঘটত না।

বাবার কথায়। তখন তো বুঝতে পারিনি বাবার মতলব। যদি ভাবার সময় পেতাম তা হলে এটা হত না।

শ্রেয়সী আর কথা না বাড়িয়ে চুপ করে গেল।

অমর আরও কিছু বলতে চেষ্টা করতেই শ্রেয়সী বাধা দিয়ে বলল, আমার শরীর ভাল নেই। এসব আলোচনা ভাল লাগছে না। ভবিতব্য মেনে নিয়েই চলেছি। এখনও চলব।

অমিয়া অনেক রাতে বাড়ি ফিরল। ঘড়ির কাঁটায় দশটা বাজতে আর বিলম্ব নেই। অমিয়া সোজা রান্নাঘরে গিয়ে নিজেই ভাত নিয়ে খেয়ে উঠল। শ্রেয়সীর

ঘরের সম্মুখ দিয়ে শোবার ঘরে যাচ্ছিল। শ্রেয়সী ডাকল, অমিয়া শোন।

অমিয়া কাছে আসতেই শ্রেয়সী জিজ্ঞাসা করল, শহীদ মিনারের কাছে কি করছিলি আজ ?

প্রথমে থমকে গিয়েছিল অমিয়া। সঙ্গে সঙ্গে নিজকে সামলে নিয়ে সাহস সঞ্চয় করে বলল, কে বলল তোমাকে ?

আমার প্রশ্নের জবাব এটা নয়। তুই শহীদ মিনারের কাছে কি করছিলি সেটাই শুনতে চেয়েছি।

তাতে তোমার কি দরকার ?

এটাও আমার প্রশ্নের জবাব নয়। কে দেখেছে ? যে দেখেছে, সে-ই বলেছে। আর দরকার আমার আছে। আমি মা, আমার ছেলে মেয়ে কোথায় যায় তা জানার অধিকার আমার আছে।

যখন আমরা ছোট ছিলাম তখন। এখন আমরা যথেষ্ট বড় হয়েছি। আমাদের কাজের কৈফিয়ত দিতে হবে এটা আমি মনে করি না।

কিন্তু ছেলেটা কে ?

নৃপেনদা।

নৃপেন কোথায় থাকে ?

ভবানীপুরে, এত জানার কি দরকার তোমার ?

তুই এখানে ওখানে ইচ্ছামত ঘুরবি আর মা হয়ে তা জানতে চাইব না ! আশ্চর্য মেয়ে তো তুই।

অবশ্যই জানতে চাইবে কিন্তু উত্তরটা দেব আমি। যদি উত্তর না দিই। তবুও শোন অমরের বয়স কত ? সাতাশ বছর। আমার চেয়ে দু বছরের বড়। তা হলে আমার বয়সটা হিসাব কর। তিন বছর আগে যদি অমর বিয়ে করতে পারে তা হলে আমার বিয়ের বয়স হয়নি বলতে চাও ! দিদিদের বয়স তো হিসাব করনি। তাই তারা নিজের নিজের ঘর খুঁজে নিতে বাধ্য হয়েছে। কি দিয়েছ আমাদের ? পড়াশোনা ? তার জন্য যা দরকার তা কি দিতে পেরেছ ? আমরা যেটুকু শিখেছি তা আমাদের চেষ্টায়। কিন্তু ভাল করে লেখাপড়া যা করা উচিত ছিল তা করেছি কি ? অমরও নিজের পথ খুঁজে নিয়েছিল। আমরা জেনেছি। এই বাড়িতে বিয়ের দাবিদার আমাদের মা ও বাবা, আমরা হেলাফেলার আস্তাকুঁড়েতেই বাস করব। তা করব না। আমাদের সৃষ্টি করেছ, খেতে দিয়েছ, কাপড় জামা দিয়েছ, এর জন্য আমরা সবাই কৃতজ্ঞ কিন্তু কাউকেই তো তোমরা ঘর গড়বার সুযোগ দাওনি।

কি বলছিস অমিয়া!

ঠিক বলছি। বলতাম না। তোমাদের বাড়ি, বাড়ির পরিবেশ আমাকে বলতে বাধ্য করছে। ভগবান মানুষ সৃষ্টি করেছে তার সৃষ্টিকে রক্ষা করতে। আর তোমরা আমাদের সৃষ্টি করেছ শুধু অন্ধকার জগতে ঠেলে দিতে, আমরা কেউ-ই তা চাই না।

চুপ কর অমিয়া। ওসব কথা নোংরা কথা। বাবা-মা সম্বন্ধে কটূক্তি মোটেই রুচিসম্মত নয়।

জানি। বললাম তোমাদের আক্কেলকে। তোমাকে অথবা বাবাকে নয়।

তুই চুপ কর অমিয়া, বলেই শ্রেয়সী ফুঁপিয়ে উঠল।

অমিয়া চুপ করল না। আবার বলল, আমরা বড় হয়ে দেখেছি তোমার দুঃখ কষ্ট, লাঞ্ছনা। সব ঘটনাই আমাদের চোখের সামনে সব সময় ভেসে ওঠে। আমরা খুঁজেছি মুক্তির পথ। দিদিরা পথ পেয়েছে, আমিও পথ খুঁজছি তবে যাচাই না করে কিছুই করব না মা।

শ্রেয়সী বালিশে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

অমিয়া নিজের ঘরে না গিয়ে বালিশ টেনে নিয়ে মায়ের পাশেই শুয়ে পড়ল।

শ্রেয়সী কোন কথা না বলে অমিয়াকে বুকের কাছে টেনে নিল।

সে রাতে কারও চোখে ঘুম নেই। শ্রেয়সীও এপাশ-ওপাশ করছিল, অমিয়াও এপাশ-ওপাশ করছিল। সকালে কার্নিশের ওপর এক ঝাঁক কাক এসে কা-কা করে ডেকে উঠতেই দুজনে বিছানা ছেড়ে উঠল। আকাশ তখনও ভালভাবে পরিষ্কার হয়নি। গৃহকর্মের তাগিদে শ্রেয়সী গেল রান্নাঘরে, অমিয়া তার পিছু পিছু গেল সাহায্য করতে। বাসনের গোছা নিয়ে অমিয়া নেমে গেল কলতলায়। ঝি আসবার আগেই রান্নার যোগাড় করে নিতে হবে। দশটায় যতীন বের হবে অফিসে। এর মধ্যেই সব যোগাড় করতে হবে, রান্না শেষ করতে হবে।

যতীন খেতে বসেছে। শ্রেয়সী সামনে বসে তদ্বির করছিল। শ্রেয়সী সাংসারিক সব কথা এই সময়ই বলে থাকে। যতীনের সঙ্গে আজকাল বিশেষ দেখাও হয় না।

শুনছ।

খেতে খেতে যতীন মুখ তুলে বলল, বল।

অমিয়ার বিয়ের বয়স পেরিয়ে যাচ্ছে। তার একটা ব্যবস্থা করতে হয়।

মুখ নীচু করে যতীন বলল, কর।

তুমি পাত্রের খোঁজ কর।

ওদের তো পাত্র খুঁজতে হয় না। মেয়েরাই পাত্র খুঁজে নিতে জানে। দুটো

তো এই ভাবেই ভবনদী পার হয়েছে। এটার জন্য অত চিন্তা করছ কেন? অমিয়া ঠিক মনের মতন লোক খুঁজে নিতে পারবে।

সব মেয়ে তো সমান নয়।

তোমার পেটে তোমার মতই মেয়ে জন্মাবে তা তো জান। তুমি খুঁজে নিয়েছিলে, তোমার দুটো মেয়ে খুঁজে নিয়েছে। তোমার ছেলেও খুঁজে নিয়েছিল। এবার অমিয়ার পালা। এক যাত্রায় পৃথক ফল হয় কি!

যতীনকে বলা ছিল নৈতিক প্রয়োজন কিন্তু তার জবাবে বুঝল অনর্থক যতীনকে পারিবারিক বিষয়ে যুক্ত করার চেষ্টা। শ্রেয়সী আর কথা না বাড়িয়ে থেমে গেল। কথায় কথা বাড়বে। ঝগড়া হবে। যতীন খিস্তি খেউড় করবে। এসবের অবতারণা যাতে না হয় সেজন্য অতি সন্তর্পণে কথার মোড় না ঘুরিয়ে চুপ করে গেল।

শ্রেয়সী উঠতেই বলল, কোথায় যাচ্ছ?

দেখি, উনুনে তরকারীটা আছে। পুড়ে যেতে পারে।

তোমার মেয়েটাও তো পুড়তে পারে। কেন যে এখন জ্বালাচ্ছে তাই ভেবে পাই না।

বাবা হয়ে তুমি এ কথা বলতে পারলে?

আমি বাপ তুমি হলে পাপ। তাই বলতে হয়।

বাস্। আর নয়। অনেক দূর এগিয়েছ। রেহাই দাও। আর কখনও অমিয়ার কথা বলব না।

শ্রেয়সী রান্নাঘরে ঢুকল। বুঝল যতীনের মতলব। অসীমা ও অনিমার মত অমিয়া যদি কাউকে পাকড়াও করতে পারে তা হলে যতীনের সমস্যার আপনা-আপনি মীমাংসা হতে পারে, দায়মুক্তও হতে পারে। একই কারণে কোন মেয়ের বিয়ের জন্য ভাবতে হয়নি। তাদের ছেড়ে দিয়েছে শাঁসালো জওয়ান ছেলে পাকড়াও করতে। শ্রেয়সীরও এ বিষয়ে কোন আপত্তি না থাকলেও, সংগৃহীত পাত্রটির সবকিছু জানা দরকার। অনিমার পছন্দটা তার মনঃপূত হয়নি। যদি বাণ্টু পঙ্গু হয়ে না পড়ত, তা হলে তার স্থান হত জেলখানায়। অমঙ্গলই অনিমার পক্ষে মঙ্গল সাধন করেছে। নেপু ঘোষালের যা আছে তা দিয়ে তিন পুরুষ বসে খেলেও শেষ হবে না।

অমর যে ছেলেটার কথা বলল তার সম্বন্ধে কেউ কিছু জানে না। তার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা দরকার। বিনয় ও বাণ্টু পাড়ার ছেলে। তারা যাই করুক পালাতে পারত না। বে-পাড়ার ছেলে মেয়েটার সর্বনাশ করে যদি গা ঢাকা দেয় তা হলে তার প্রতিকার করা সম্ভব নয়।

রাতের বেলায় আবার যতীনের কাছে গিয়ে বলল, অমর বলছিল—

কি বলছিল ?

অমিয়া গড়ের মাঠে একটা ছেলের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করে।

তাকে তুমি চেন না আমিও চিনি না কিন্তু অমিয়া তো চেনে, নইলে তার সঙ্গে ঘুরবে কেন।

অমিয়ার বয়স কম, বখাটে ছেলের পাল্লায় পড়তে পারে।

ওসব ভেবে মন খারাপ কর না। তোমার মেয়েরা খুব বোকা নয়। অনিমাও তো মস্তান বাণ্টুর খপ্পরে পড়েছিল, সে তো নিরাপদে তার সঙ্গে ঘর করছে। ওসব চিন্তা করে লাভ নেই। যে আদা খাবে তার ঝাল সহ্য করতেই হবে।

তুমি একটু খবর করে দেখ। ছেলেটার নাম নৃপেন, থাকে ভবানীপুর।

এইটুকু সম্বল করে কারও হদিস করা যায়। ভবানীপুর তো ছোট জায়গা নয়। সেখানে কয়েক হাজার নৃপেন থাকতে পারে। অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ে ঢিল খুঁজে বেড়ায় বোকারা। আরও খবর নাও, তারপর দেখব।

শ্রেয়সী কোন রকমেই যতীনকে রাজী করতে পারল না। নৃপেনের খোঁজ করতে বিকল্প কোন ব্যবস্থাও করতে রাজী হল না। নিরুপায় হয়ে অমরকে বলল, তুই একটু খোঁজখবর নে খোকা। নইলে অমিয়া ভেসে যাবে। আমি কিছুই ভাল মনে করতে পারছি না।

কদিন পর শ্রেয়সীর সামনেই অমর বলল, শোন অমিয়া, তোর নৃপেনদা হল পাকা জুয়াড়ী। রাতের বেলায় জুয়ার বোর্ড বসায়। দুবার পুলিশ ধরেছে। পয়সার জোরে খালাস হয়ে এসেছে।

অমিয়া অবিশ্বাসের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, কে বলল ?

আমি নিজে দেখেছি। বিশ্বাস না হলে ভবানীপুর থানায় গিয়ে খবর নে। সন্ধ্যার পর চোলাইয়ের ঠেকে যায়। সেখানে যা পান করে তা দেবদুর্লভ বস্তু। বুঝলি ?

অমিয়া দমবার মত মেয়ে নয়। বলল, বয়সকালে ওরকম একটু-আধটু অনেকেই করে থাকে। আমার বিষয়ে তোদের নাক গলাতে হবে না। তোর বিষয়ে আমি কখনও কিছু বলেছি।

অমরের কথা যেমন শুনল, তেমনি শুনল অমিয়ার কথা, সব শুনে শ্রেয়সী গুম হয়ে বসে রইল। অনেকক্ষণ পরে শ্রেয়সী বলল, নৃপেনের বাড়ির ঠিকানা আনার চেষ্টা কর খোকা।

নৃপেনের বাড়ির ঠিকানার দরকার হল না।

অমিয়া বলল, বাড়ি আমি চিনি। নৃপেনদা বলেছে, সিনেমায় চান্স করে দেবে। কথাবার্তা অনেক দূর এগিয়েছে। তোমাদের মত আছে কি?

শ্রেয়সী বলল, সিনেমায় চান্স করে দেবে? বাঃ! তুই অভিনয় করবি? অভিনয়ের কি জানিস তুই? এ রকম টোপ ফেলে কত মেয়ের সর্বনাশ ওরা করেছে তা জানিস কি? বেঘোরে পড়ে নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করিস না।

অমিয়া দৃঢ়ভাবে বলল, সে সব তোমাদের ভাবতে হবে না। অভিনয় ওরাই শিখিয়ে নেবে। আর টোপ? আমি কি কচি খুকী? টাকা বাজিয়ে নিতে জানি, বুঝলে?

তোর ইচ্ছামত যা ইচ্ছা করতে পারিস তবুও তোর বাবাকে বলিস। আমার ভয় করছে। তোর বাবা মোটামুটি বাইরের দুনিয়ার খবর রাখে। ভাল মন্দ সে-ই বুঝবে। সবার সঙ্গে পরামর্শ করে কোন কাজ করলে আখেরে পস্তাতে হয় না। তোর বাবা হল গোঁয়ার গোবিন্দ। শেষে হিতে বিপরীত না হয়। তার চেয়ে তাকে একবার বলে নিস।

অমিয়া কিছুক্ষণ ভেবে বলল, বেশ, আমিই বলব।

যদিও অমিয়া জানে যতীন তার মতে মত দেবে না তবু বলাটা প্রয়োজন মনে করেই বলবে।

অমিয়ার অভিপ্রায় শুনেই যতীন ক্ষিপ্তের মত বলল, তোর মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করেছিস?

না। তবে তাকেও বলেছি। সিনেমায় নামতে পারলে পয়সাও হবে, নামও হবে।

নাম! দুর্নাম হবে তার চেয়ে বেশি। তোর দেখছি বিপথে যাবার নেশা চেপেছে। শুনলাম বেপাড়ার কোন একটি বখাটে ছেলের সঙ্গে মেলামেশা করছিস। এসব কি হচ্ছে? আমার বাড়িতে বসে এসব বদমাইশি চলবে না।

অমিয়া কিছু বলার আগেই চিৎকার করে বলল, ওসব চলবে না, বুঝলি?

আমাকে কি করতে বল?

ঘরে থাকবি। ঘরের কাজ করবি।

বাঃ! চমৎকার! বিয়ে দেবে না, কাজ শিখাবে না, ঘরে বসে মাছি তাড়াব। তুমি তোমার কর্তব্য করবে না শুধুমাত্র উপদেশ দেবে, চোখ রাঙাবে। তুমি-ই আমার বাবা!

মুখ সামলে কথা বলিস।

মারবে নাকি? আমি কিন্তু দিগম্বর উকিলের মেয়ে নই। ছোট বেলা থেকে দেখে আসছি তাতে আমাদের মন অনেকটা শক্ত হয়ে গেছে। মনে রেখ আমি তোমারই মেয়ে।

হতাশভাবে যতীন বলল, তুই মারবি নাকি?

অত ছোট আমি হতে পারব না। তবে তোমাকে এমন শিক্ষা দেব যাতে আর কোনদিন কারোর গায়ে হাত তোলবার আগে তোমাকে দশবার ভাবতে হবে।

অমিয়া আর দাঁড়াল না। ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ঠিকই বুঝেছিল অমিয়া। এক সপ্তাহ পার হয়নি। একদিন রাতে অমিয়া বাড়ি ফিরল না। শ্রেয়সী চিন্তায় ভেঙে পড়ল কিন্তু কাউকেই কিছু বলতে পারল না। পরের দিনও অমিয়া বাড়ি ফিরল না দেখে যতীনকে ডেকে বলল, আজ দুদিন অমিয়া বাড়ি নেই, সে খবর রাখ?

যতীন বলল, এটাই আশা করছিলাম। এবার থানায় ছুটতে হবে।

অনর্থক।

কেন?

অমিয়া বড় হয়েছে। তার ইচ্ছেতে বাড়ি ছেড়েছে। সাত ঘাটের জল খেয়ে একদিন ফিরবেই।

ফিরলেই হোল, চৌকাট ডিঙোতে দেব না। ঢুকলে মেরে ঠ্যাং ভেঙে দেব।

যতীনের পক্ষে কিছু অসম্ভব নয়। তবে অমিয়ার ফিরে আসার আশু কোন সম্ভাবনা নেই।

পরের দিন সকালবেলায় যতীন কাপড়জামা বদলে বের হবার উপক্রম করতেই শ্রেয়সী জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যাচ্ছ?

থানায়।

থানায় গেলেই অমিয়াকে ফিরে পাব কি?

সেই বখাটে নৃপেনকে শায়েস্তা করা দরকার।

তোমার বুদ্ধির বলিহারি। তোমার মেয়ে ঘর ছেড়েছে। শায়েস্তা করতে চলেছ নৃপেনকে। নৃপেন একাই বুঝি অপরাধী। মিঞা-বিবি একমত না হলে কোন কাজ হয় কি? দোষ যদি করে থাকে তা হল দুজনেই সমভাবে দোষী। আর যদি দোষ না করে থাকে তা হলে দুজনেই নির্দোষ।

খবরের কাগজ তো পড়। দেখতে পাও কত মেয়েকে প্রলোভন দেখিয়ে ঘর-

ছাড়া করে আড়কাঠির কাছে বিক্রি করে দিচ্ছে। তাদের আর কোন ঠিকানাও জানা যাচ্ছে না। আরও খবর তো জান, বিয়ের নাম করে মাথায় সিঁদুর পরিয়ে মেয়েদের নোংরাপাড়ায় পাঠাচ্ছে। এদেশের মেয়েকে ফুসলে নিয়ে আরব দেশে পাঠাচ্ছে মোটা টাকার বিনিময়ে। থানায় একটা ডায়েরী করা উচিত।

যা বললে তা মিথ্যা নয় কিন্তু আমরা কি করতে পারি বল। তবে অমিয়া বোকা মেয়ে নয়। বিপদ বুঝলে ছুটে বেরিয়ে আসবে।

তবুও থানায় ডায়েরী করা উচিত।

আজ অবধি কবার থানায় গেলে ?

কেন দরকার হলে যেতেই হবে।

তা বটে। ঝনূকা পালালো, থানায় গেলে, তার ফল কি হল ? অমরকে গ্রেপ্তার করল, থানায় গেলে। কি লাভ হল ? কয়েক হাজার টাকা আমার ব্যাগ থেকে পুলিসের পকেটে ঢুকল। এবার অমিয়া। বেশ, যাও, তোমাকে দেখলেই ওরা মুচকি হেসে ঠাট্টা করবে। সবাই মনে করবে, কি একটা নোংরা পরিবার। এই নোংরামিটা সবাইকে জানাতে হবে বইকি।

যতীন আর ধৈর্য রাখতে পারল না। তার সভ্য মুখোশটা খুলে পড়ল। চিৎকার করে বলল, তোর জন্যেই এই সব কুকাজগুলো ঘটছে। তোর মুখ দেখাও পাপ। তুই ভাল হলে সবাই ভাল হত। তুই কি করে ভাল হবি। তোর মা হল খানকি। খানকির মেয়ের পেটে ভাল পয়দা কখনও হয় কি। তোর আবার কলঙ্কের ভয়! দূর হ!

শ্রেয়সী কাঁদল।

প্রতিবাদ করল না।

বিকেল বেলায় অমর এসে জানাল, মা, একটা চাকরি পেয়েছি।

চাকরি! উৎফুল্লভাবে শ্রেয়সী বলল, ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন। কোথায় চাকরি পেলি ?

একটা দোকানে চাকরি পেয়েছি। যন্ত্রপাতির দোকান। মালপত্রের হিসাব রাখতে হবে, দেনদারের কাছ থেকে আদায় করতে হবে বিলের টাকা।

পারবি কি ?

পারব। কিন্তু এক হাজার টাকা সিকিউরিটি চায়। টাকাপয়সা নিয়ে কারবার। সিকিউরিটি না দিলে কাজ দেবে না। তবে বাড়িঘর আছে এমন লোকের জামিন পেলেও কাজ দেবে।

কাজ যদি পাস তা হলে জামিনের জন্য চিন্তা করতে হবে না। কাল যে কোন সময় আমাকে সেই দোকানের মালিকের কাছে নিয়ে যাবি। আমি ব্যবস্থা পাকা করে আসব।

তোমাকে যেতে হবে না। যাওয়ার দরকার নেই।

দরকার আছে। তোর জন্যই যেতে হবে। আমি আমার বাড়ির দলিল নিয়ে যাব। আমিই তোর জামিন হব। হ্যাঁরে নৃপেনের খোঁজ পেলি? অমিয়াকে পেতে হলে নৃপেনকে সবার আগে খুঁজে বের করতে হবে। ছোঁড়াটার বাড়িটা খুঁজে বের করতে পেরেছিস?

না। কালকে আমি খুঁজতে বের হব। তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েই বের হব। আজ হোক কাল হোক শহীদ মিনারের তলায় ও আসবেই। ভবানীপুর থানায় গেলেও ঠিকানা পাওয়া যেতে পারে কিন্তু পুলিস কি কাগজপত্র ঘেঁটে ঠিকানা দেবে। দিলেও বিনা পয়সায় তা হবে না। জান তো পুলিসের কাছে যেতে হলে পকেট ভর্তি করে যেতে হয়। বিনা পয়সায় ওরা কারও কোন কাজ করেছে এমন ঘটনা বিরল। তবে ওদের একটা রেস্টুরেণ্টে যেতে দেখেছি। ওত পেতে-থাকলে সেখান থেকেই খবর পাওয়া যেতে পারে। তবে খুঁজে বের করবই।

পরের দিন শ্রেয়সী গিয়ে অমরের চাকরির জামিন হয়ে এসে অমলকে ডেকে বলল, হ্যাঁরে তোর সেজদি কোথায় কোথায় যেত তা জানিস? তার কোন বন্ধু-বান্ধবের ঠিকানা জানিস?

অমল বড় হয়েছে। মাধ্যমিক পাস করে কলেজে ঢুকেছে। কলকাতা আর শহরতলী তার নখদর্পণে। অমর চাকরিতে যোগ দিয়েছে। বাড়িতে অমলই ভরসা। এখন শ্রেয়সীর ফাইফরমাইস শোনার লোক অমল। ছোটাছুটি করতে হলে অমলের ডাক পড়ে।

এতদিন পারিবারিক কোন ব্যাপারে অমলকে ডাকা হয়নি, হঠাৎ তাকে প্রশ্ন করতে কিছুটা সে ঘাবড়ে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, ঠিক বলতে পারব না তবে বাগমারীর একটা মেয়ের সঙ্গে সেজদির খুব ভাব ছিল।

সে মেয়েটা কে?

তা জানি না। সেজদির সহপাঠিনী হতেও পারে। বাগমারীর একটা বস্তিতে থাকে। বস্তিটা আমিও চিনি কিন্তু তার নাম না জানলে বস্তির কয়েক শো মেয়ের মধ্যে তাকে খুঁজে বের করা খুবই কঠিন।

একবার চেষ্টা কর বাবা। অমিয়াটা সবচেয়ে বেশ জ্বালাতন করছে।

চিন্তা কর না মা। আজ কলেজ থেকে ফিরেই আমি খুঁজতে বের হব। এস্পার-ওস্পার একটা করবই।

যতীন কিন্তু নির্বিকার।

শ্রেয়সীর চোখে ঘুম নেই। কেঁদে কেঁদে চোখ মুখ ফুলিয়েছে।

ছোট মেয়ে অনিলা মায়ের পাশে থাকে। তখনও সে স্কুলের গণ্ডী না পেরোলেও মোটামুটি সবই বোঝে। কথা কম বলে, মনের কথা প্রকাশ করে না। তবে মাঝে মাঝেই তাকে সান্ত্বনা দিতে বলে, সেজদি ঠিক আসবে। তুমি চিন্তা কর না।

অমর খবর দিল, নৃপেনের কোন হদিস করতে পারেনি। শহীদ মিনারে পাহারা দেবার মত সময় সে পায় না। কাজে আটকে থাকতে হয় সব সময়।

অমল সকালে বিকেলে বাগমারীতে ঘোরাঘুরি করে অমিয়ার সেই বন্ধুকে খুঁজে পায়নি কিন্তু একদিন সাহস করে বস্তিতে ঢুকে পড়ল। সামনেই পেল একটা মহিলাকে।

শুনুন!

মহিলাটি দাঁড়িয়ে গেল।

কিছু বলবে?

হ্যাঁ। আপনাদের এই বস্তিতে কোন মেয়ে কি বিনোদিনী পাঠশালায় পড়ত?

হ্যাঁ। পড়ত। সে তো অনেক দিন আগে। কেন বলতো?

আমার দিদির সঙ্গে পড়ত। দিদি তাকে খবর দিতে বলেছে কিন্তু রাস্তায় আসতে আসতে তার নামটাই ভুলে গেছি। তার নাম কি বলতে পারেন? আর কোন্ ঘরটায় থাকে বলুন তো?

তার নাম নিরু। থাকে কোনার ওই শেষ ঘরটায়। সে বোধহয় এখন নেই। কিছুক্ষণ আগে একটা মেয়ের সঙ্গে বেরিয়ে গেছে। দেখ যদি থাকে। আরে এই তো নিরু এসে গেছে। এই নিরু তোকে এই ছেলেটা খুঁজছে।

নিরু এগিয়ে এসে বলল, আমি তো তোমাকে চিনি না। তুমি কে?

আমি অমল। অমিয়া আমার সেজদি। একটা খবর নিয়ে এসেছি।

আমার সঙ্গে এস।

নিরু তাকে নিজের ঘরে নিয়ে এসে বসতে দিল।

কি খাবে বল।

কিছুই না, সেজদি গত রবিবার থেকে বাড়িতে যায়নি। তারই খোঁজে এসেছি।

তার কোন সংবাদ যদি জানা থাকে তা হলে বলুন।

নিরু অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, এমন কথা তো ছিল না। নৃপেনদার রিয়ার্সেলে যাবার কথা ছিল গত রবিবারে তারপর বাড়ি যায়নি! বাড়িতে কোন ঝগড়াঝাঁটি হয়নি তো?

ঝগড়াঝাঁটি নয়। তবে সিনেমায় অভিনয় করাটা বাবা পছন্দ করেননি।

তার জন্য বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে এমন তো ভাবা যায় না। তবে গেল কোথায়? আমার সঙ্গেও কদিন দেখা হয়নি। ব্যাপারটা কি!

সেটাই তো আমরা ভাবছি।

তুমি নৃপেনদার কাছে যাও। সে হয়ত কিছু বলতে পারবে।

নৃপেনদাকে আমি চিনি না। তার পুরো নাম কি, কোথায় থাকেন?

পুরো নাম নৃপেন মজুমদার। থাকে কালীঘাট রোডে। পুলিস ফাঁড়ির কাছে। আশেপাশে জিজ্ঞেস করলেই পাবে। সবাই মোটামুটি চেনে। কি ভাবছ?

আপনি যদি সঙ্গে যেতন তা হলে ভাল হত।

আজ তো উপায় নেই। উনি আজ সিনেমার টিকিট কেটে রেখেছেন। যেতেই হবে। আগামী কাল এই সময় এলে তোমার সঙ্গে যেতে পারি। আমি তোমাকে নিয়ে যাব। বড় চিন্তায় ফেললে ভাই। অমিয়া খুব তেজী মেয়ে তবে ঘর ছেড়ে বের হবার মেয়ে তো নয়।

আপনি বুঝি অভিনয় করেন?

ছাই। সাইড রোলে মাঝে মাঝে নামতে হয়। নৃপেনদাই ব্যবস্থা করে দেন। গরীবের সংসার। একার উপার্জনে তো চলে না। এতে নিজের খরচটা চলে যায়। ওঁর ওপর চাপ পড়ে না। আমার মত আরও অনেক মেয়ে টালিগঞ্জের স্টুডিওর পাশে পাশে ঘোরে। তারাও নৃপেনদার হাতধরা। নৃপেনদা এক্সট্রা সাপ্লাই দেয়।

অমলের আর কিছু জানার ছিল না। সোজা বাড়ি গিয়ে শ্রেয়সীকে সব কিছু বলে একটা গল্পের বই নিয়ে শুয়ে পড়ল।

শ্রেয়সী এসে অমলকে ধাক্কা দিয়ে তুলল। বলল, বস, আমার সঙ্গে অমিয়াকে খুঁজতে যাবি।

অমল অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলল, কালকে তো নিরুদির সঙ্গে যেতে পারতাম।

না রে, অত দেরি করা ভাল হবে না। সময়টা বড় খারাপ। বেশী দেরি করব না অমিয়ার বিপদ হতে পারে। আমি মা, আমার মন বলছে অমিয়া বিপদে পা দিয়েছে, তাকে বাঁচাতে হবে। ওঠ, চল।

কালীঘাট পুলিস ফাঁড়ির কাছে নৃপেন মজুমদারে বাড়ি খুঁজে বের করতে সন্ধ্যা পেরিয়ে গেল। নৃপেন মজুমদার বাড়ি নেই।

খবর পেয়ে জানা গেল। নৃপেন মজুমদার কদিন আগে বোম্বাই গেছে। ফিরতে দেরি হবে। শ্রেয়সী জিজ্ঞাসা করল, নৃপেনবাবু কি একাই গেছে।

না। গ্রুপ নিয়ে গেছে।

শ্রেয়সী মাথায় হাত দিয়ে বসল, বোম্বাই! তাই তো! গ্রুপ নিয়ে গেছে যখন তখন নিশ্চয়ই নৃপেনের সঙ্গে অমিয়া বোম্বাই গেছে। কলকাতায় অমিয়াকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। অমলের হাত ধরে বাড়ি ফিরে এল শ্রেয়সী।

পরদিনই মন্দাকিনীর কাছে গিয়ে সব কিছু বলে, কি করা উচিত সে বিষয়ে পরামর্শ চাইল।

মন্দাকিনী সব কিছু শুনে নিরুপায়ের মত দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল, করণীয় কিছু ছিল না, বক্তব্যও কিছু ছিল না। একবার মাত্র জিজ্ঞাসা করেছিল, যতীন কি করছে?

যতীন কিছুই করেনি তা বলাবাহুল্য। যতীনকে ছেলেমেয়ের কথা বলতে গেলেই ক্ষিপ্তের মত খিস্তি খেউড় আরম্ভ করে। অশ্লীল অকথ্য গালাগালি করবে।

বোম্বাই হল সিনেমাওলাদের মক্কা। সিনেমা স্টার হতে আগ্রহী দুরাশাগ্রস্থরা এই মক্কার পথে পাড়ি জমায় ভাগ্য ফেরাতে, নাম করতে, আরও কত কি করতে। কিন্তু ধর্মস্থান মক্কা আর বোম্বাইয়া সিনেমার পীঠস্থান তো এক নয়। তাই ধাক্কা খেয়ে ফিরতে হয় শতকরা নিরানব্বইজনকে, বলতে পারা যায় সব কিছু হারিয়ে গলা ধাক্কা খেয়ে মাথা নীচু করে ঘরের ছেলে ঘরে ফেরে অথবা লজ্জার খাতিরে কোথাও কোন চাকরবাকরের কাজ জুটিয়ে চিরতরে দেশের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে। এইসব খবরই শ্রেয়সীর জানা কিন্তু নিরুপায়। শেষ পর্যন্ত ভাগ্য ও ভগবানের ওপর ভরসা রেখে চুপ করে গেল।

মাসের পর মাস কাটে, অমিয়া আর ফিরে আসে না।

অমিয়ার সম্বন্ধে বাড়িতে আলোচনাও হয় না আজকাল।

অমর কাজে বেরিয়ে যায়। অমল চলে যায় কলেজে। অনিলা যায় স্কুলে। যতীন সাতসকালে বেরিয়ে যায়, বাড়িতে একা থাকে শ্রেয়সী। রাজ্যের চিন্তা তার মাথার মধ্যে গিজগিজ করে। মাঝেমধ্যেই ফুঁপিয়ে ওঠে অমিয়ার জন্যে।

দিন কাটে, রাত কাটে তবুও কাটে না মনের জ্বালা।

এমন সময় একদিন অমল এসে খবর দিল নৃপেন মজুমদার বোম্বে থেকে ফিরে এসেছে।

প্রেয়সী আর অপেক্ষা করল না। অমলকে সঙ্গে করে গেল নৃপেন মজুমদারের সন্ধানে।

দরজায় কড়া নাড়তেই যে দরজা খুলে দাঁড়াল সেই-ই নৃপেন মজুমদার।

কেউ কাউকে চেনে না।

নৃপেন জিজ্ঞাসা করল, কাকে চাই ?

নৃপেনবাবুকে।

কোথা থেকে আসছেন ?

আমরা আসছি উত্তর কলকাতা থেকে।

কেন বলুন তো ?

আমরা নৃপেনবাবুর সঙ্গে কথা বলতে চাই।

আমিই নৃপেন মজুমদার। আমাকে বলুন কি দরকার। ভেতরে এসে বসুন।

আমরা বসতে আসিনি, একটা খবর নিতে এসেছি। আমি অমিয়ার মা। আমি আমার মেয়ের খোঁজে এসেছি। অমিয়ার নাম শুনেই নৃপেনের মুখ শুকিয়ে গেল। আমতা আমতা করে বলল, অমিয়া! অমিয়া তো এখানে নেই।

নেই জেনেই এসেছি। আপনি জানেন সে কোথায় আছে।

তা তো জানি না।

আপনি জানেন। আপনাকে বলতেই হবে। জওয়ান মেয়েদের সিনেমায় অভিনয় করে দেবার সুযোগ দেবেন এই প্রলোভন দেখিয়ে বোম্বাইতে চালান করেন। আমরা পুলিসে ডায়েরী করে রেখেছি, অভিনেত্রী হবার প্রলোভন দেখিয়ে বহু মেয়েকে বাড়িছাড়া করে দেন, এবার আপনার লীলাখেলা শেষ হবে। এখনও বলুন আমার মেয়ে কোথায় আছে। কার কাছে বিক্রী করেছেন বলুন।

অমিয়া বোম্বাই গেছে শুনেছি।

আপনি শোনেন নি, আপনি নিজে তাকে নিয়ে গেছেন। আপনাকে তিনদিন সময় দিলাম, তার মধ্যে আমার মেয়েকে এনে দেবেন, নইলে হাজত বাস করতে হবে। রেহাই পাবেন না।

কিন্তু ?

কোন কৈফিয়ত শুনতে চাইনা।

আমার কথাটা শুনুন। বোম্বাই গিয়ে অমিয়া প্রোডিউসার নরপতিলালের সঙ্গে অভিনয়ের চুক্তি করেছে। চুক্তি শেষ না করে তো সে ফিরতে পারবেনা। তার সঙ্গে পনর ষোল দিন আগে দেখা হয়েছিল। ভালই আছে, থাকে নরপতিলালের

বাড়িতেই। এর বেশি আমি জানি না। আমার দোষ কোথায় বলুন।

বোম্বাই যাবার বুদ্ধি কে দিল?

অমিয়া ছবিতে অভিনয় করতে চায়। টালিগঞ্জে কোন ব্যবস্থা করতে পারিনি, শেষে তারই ইচ্ছায় বোম্বাইতে নিয়ে গিয়েছিলাম, সেখানে তার চান্স হয়েছে। আমার এক বন্ধু নরপতির সঙ্গে যোগাযোগ করে দেওয়াতে সে চান্স পেয়েছে।

বুঝলাম। চল অমর। এবার অন্য পথ দেখতে হবে। সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না।

অন্য পথ দেখা যে মোটেই সম্ভব নয় শ্রেয়সী তা জানে। সাবালিকা মেয়ে যদি কোন চুক্তি করে থাকে তা রদ করার কোন অধিকার কারও নেই। সাবালিকা মেয়ের ওপর খবরদারী করাটা মোটেই সম্ভব নয়। অমিয়া যদি উল্টোকথা বলে তা হলে করার কিছুই নেই।

বাড়িতে গিয়েই অনিমার কাছে শুনল, বড়দার নতুন খবর। অমর আবার বিয়ে করবে।

অবাক হয়ে অনিমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে শ্রেয়সী প্রশ্ন করল, সত্যি!

হ্যাঁ মা, সত্যি। বড়দা বিয়ে ঠিক করেছে। সবাই জানে। আজই আমরা শুনলাম।

শ্রেয়সী হাসল।

হাসছ! বড়দা চাকরি করে। মোটা টাকা মাইনে পায়।

শ্রেয়সী এবারও হাসল।

হাসছ কেন মা? বড়দার মতিগতি ভাল নয়।

শ্রেয়সী প্রশ্ন করল, এ বাড়ির কার মতিগতি ভাল বলতে পারিস!

অনিমা উত্তর দিতে পারল না।

আমি কি করব বলতে পারিস? একটা দিক সামলাতে গেলে আরেকটা দিক ভাঙতে থাকে। কি যে করব ভেবে পাচ্ছি না। খোকার সঙ্গে তাল রেখে চলা কঠিন। কখনও নকশাল, কখনও প্রেমিক, কখন যে কি তা ও নিজেই জানে না। আবেগের দাস। যে বিষয়ে আবেগ সৃষ্টি হয় সেদিকে ছোটে। তবে খবরটা শুনলাম। আবার বউ নিয়ে হাজির হলে তোর বাবা যা অশান্তি করবে তা ভাবতে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। অশান্তির ঝাপটায় আমি দিশেহারা হয়ে পড়ব। এটাই চিন্তার বিষয়, অন্য কিছু চিন্তা করছি না। তুই এসবে মাথা দিস না অনিমা। আমাদের বাড়িতে পড়াশোনার কোন পরিবেশ নেই, তুই যদি এসব নিয়ে ভাবতে বসিস তাহলে

তোর পড়াটা নষ্ট হবে। তোর আর অমলের ওপর ভরসা করে এখনও বেঁচে আছি। আর গুলোকে তো মানুষ করে গড়তে পারিনি। তোরা দুজন যদি মানুষের মত মানুষ হতে পারিস তাহলে সব দুঃখ ভুলে যাব।

অনিমা তাঁর ছেলে শেখরের হাত ধরে নীচে এসে হাঁক দিল, মা! ডাক শুনেই অনিলাকে পাশ কাটিয়ে নেমে গেল।

আজ শেখরকে স্কুলে পাঠাব। হাতে খড়ি দিয়ে এনেছি। তোমাকে প্রণাম করতে এসেছে শেখর।

শেখরের মাথায় হাত বুলিয়ে শ্রেয়সী বলল, মানুষ হও। এই আরম্ভ যেন শুভ হয়। হ্যাঁরে অনিমা, বান্টু এখন কেমন আছে?

সেই রকমই। ক্রাচ নিয়ে যাওবা একটু চলাফেরা করছিল তাও বোধহয় আর পারবে না। বাঁ দিকটা ক্রমেই অসাড় হয়ে আসছে।

তোর শ্বশুর কেমন আছে?

তারও সময় হয়ে এসেছে। বান্টুর অবস্থাই তাকে কাবু করেছে। বড়ই চিন্তায় আছি। শ্বশুরমশাই সংসারটা চালিয়ে গেছেন, তাঁর অবর্তমানে এই পঙ্গু স্বামীটা নিয়ে আমার যে কি হবে তা ভগবান জানেন। তোমার জামাইয়ের আশা ছেড়ে দিয়েছি। একমাত্র ভরসা শেখর। কবে যে বড় হবে! দেওররা সরে পড়েছে। আলাদা সংসার পেতেছে। তারা ফিরেও তাকায় না।

শ্রেয়সী আর ভাবতে পারে না। মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করতে থাকে। কোন রকমে সামলে নিয়ে দোতলায় উঠে গেল। অনিমাকে ডেকে বলল, একটা বড়ি দে তো। শরীরটা ভাল লাগছে না।

অনিলা বুঝতে পেরেছিল। সেও ওপরে এসে মাকে বিছানায় শুইয়ে খুব জোরে পাখা খুলে দিল। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, একবার তোমাকে যমের দুয়ার থেকে টেনে আনা গেছে, আবার যদি একই অবস্থা হয় তাহলে তুমি বাঁচবে না।

শ্রেয়সী কোন উত্তর না দিয়ে চোখ বুজে শুয়ে রইল।

অনিলা অনেকক্ষণ পর জিজ্ঞাসা করল, কেমন আছ মা?

ভাল। তুই বসে থাকিস না। স্কুলের সময় হয়ে গেছে। শেখরকে নিয়ে রওনা দে।

বারোটার সময় স্কুল। এখনও অনেক দেরি। তুমি চুপ করে থাক। কথা বল না।

ওঃ। বলে শ্রেয়সী পাশ ফিরে শুলো।

আজ বিকেলে শরীর যদি ভাল থাকে তাহলে ডাক্তারের কাছে যেও। রক্তের

চাপটা মেপে এস। ওষুধটা সময়মত খেও। আমি বিকেলে এসে তোমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব। বুঝলে! তোমার জামাই কি বলে জান, সে বলে আমাদের রক্ষা করার কেউ নেই, একমাত্র তোমার মা। তাকে বাঁচিয়ে রাখবে, কেমন!

কে কাকে বাঁচাবে! মরণ কি বলে-কয়ে আসবে! মরণ শিয়রে নিয়ে বাঁচার আশা করলেই কি বাঁচা যায়! আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে।

বিকেলে অনিলা এসেছিল।

শ্রেয়সী তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে, বলেছে, আজ খুব ভাল আছি। কালকে যাব। ডাক্তার তো আছেই। যখন ইচ্ছে তখনই যেতে পারব। আজ যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

অমর তার কার্যক্ষেত্র থেকে ফিরেই মায়ের কাছে এসে বসল।

কেমন আছ মা?

এখন ভাল। সকালের দিকে রক্তের চাপটা বোধহয় হঠাৎ বেড়ে গিয়েছিল।

শ্রেয়সী কথা শেষ করেই মুখ ঘুরিয়ে চুপ করে শুয়ে রইল।

তোমার শরীর এখনও ভাল হয়নি মনে হচ্ছে।

শ্রেয়সী কোন কথাই বলল না।

কথা বলছ না কেন?

শ্রেয়সী মৃদুস্বরে বলল, চুপ কর খোকা। আমি খুব ভাল আছি। যেদিন মরব সেদিন বুঝবি আমার শরীর কতটা ভাল ছিল। তোরাই আমাকে মেরে ফেলবি।

আমরা আবার কি করলাম?

কি শুনছি! আবার বিয়ে করতে চাস তা তো বলিসনি! বিয়েপাগল হয়ে একবারে তোর শিক্ষা হয়নি, আবার তুই ক্ষেপে উঠেছিস। বিয়েপাগলদের হ্রস্বদীর্ঘ জ্ঞান থাকে না রে খোকা, কর্তব্যকর্ম সব নষ্ট হয়।

অমর মৃদুস্বরে বলল, বিয়ের প্রয়োজন নেই বলতে চাও?

তা বলছি না। বাড়ির অবস্থা তো দেখছিস। অমিয়া নিরুদ্দেশ। অসীমা আসে না তার বাপের ভয়ে। অনিমা যা কিছু দেখাশোনা করে। অমল আর অনিমার পড়া শেষ হয়নি। ভরসা একমাত্র তুই। যদি সংসারের দিকে না তাকাস তা হলে গাড়ির চাকা বন্ধ হয়ে যাবে। আমার বাঁচা মরা সমান। বিয়েতে আমার অমত নেই। কিন্তু তোর বাবার কানে উঠলেই যা তাণ্ডব শুরু করবে তা তো তুই জানিস। কার অপরাধ? অথচ আমাকে অপরাধী স্থির করে যা করবে তা বলে শেষ করা যায় না।

আমি ভাবছি তোমার যা শরীরের অবস্থা তাতে তোমার সাহায্যকারী দরকার।

অর্থাৎ তোর বউ এসে আমাকে সাহায্য করবে! যেমন করেছিল ঝন্‌কা। সকালবেলায় গরম চায়ের পেয়ালা তার সামনে না ধরলে তার চোখ থেকে ঘুম ছুটত না। নতুন বউ এলে তার চেয়ে বেশি কিছু করতে হবে। এই তো?

তুমি রাগ করছ মা। এবার তা হবে না। এই বউ বাঙাল মেয়ে। বরিশালের মেয়ে।

উরে বাবা! সাতাশ নম্বর বাড়ির বরিশালের বউ আর হাওড়ার শাশুড়ীর ঝগড়া তো রোজই শুনছি। না বাপু, অন্য মেয়ে দেখ।

আহা কি যে বল! আমরা সবাই তো একই দেশের লোক। বরিশাল হলেই ভাল হবে না এ কথা কি করে ভাবলে। ভালমন্দ সব জায়গাতেই আছে। সাতাশ নম্বরের হাওড়ার শাশুড়ী নিশ্চয়ই মানিয়ে নিতে পারেনি। এ বউ ঘরকন্নাই করবে না, চাকরিও করবে।

চাকুরে বউ! বাস্! সকাল বেলায় উঠে চাকুরে-ছেলের চাকুরে-বউয়ের অফিসের ভাত দিতে হবে। ওটা পারব না খোকা।

সব কিছু না জেনেই আঁতকে উঠছ কেন? দেখবে তোমাকে হীরের টুকরো বউ এনে দেব।

দেখি, তবে তোর বাবাকে বলতে হবে। অমত করলেও তো বিয়ে আটকাবে না। তবুও তার সম্মতি নিতে চেষ্টা করব।

অমর কিছুটা নিশ্চিন্ত হল।

নতুন বউ আসবে শুনে যতীন প্রথমে অসম্মতি জানিয়েছিল কিন্তু যখন শুনল নতুন যে বউ আসবে সে সরকারী চাকরি করে তখন আর কোন বাদপ্রতিবাদ করেনি। অর্ধেক রাজ্য আর রাজকন্যা যদি ঘরে আনতে পারে অমর তাতে লাভ বিনা লোকসান নেই।

অমিয়া বাড়ি থেকে চলে গেছে প্রায় দশ মাস হল। নৃপেনের কাছে আর কেউ যায়নি। অমিয়াও কোন চিঠি দেয়নি। শ্রেয়সীর মনে হয়েছে মেয়েটাকে বোধহয় বিক্রি করে দিয়েছে নৃপেন। কিন্তু প্রকাশ না পেলে কিছুই করার নেই। আর অমিয়া ফিরে এলে তাকে সবাই গ্রহণ করবে কিনা সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। তবে বাড়িতে অমিয়াকে নিয়ে কোন আলোচনা হত না।

কদিন পরে হঠাৎ সদরের কড়াটা খুব জোরে বেজে উঠতেই শ্রেয়সী নীচে নেমে

গেল। বাড়িতে সে সময় কেউ ছিল না। দুপুরে ফেরিওলাদের উৎপাতে প্রায়ই শ্রেয়সীর দিনের ঘুম নষ্ট হয়। যেদিন অমল কিম্বা অনিলা থাকে তারাই দরজা খুলে দেয়। ফেরিওলাদের মিষ্টি কথায় তুষ্ট করে ফেরত পাঠায়। আর শ্রেয়সী সে সব দিনে মন্দাকিনীর কাছে আসে। আজ বাড়িতে কেউই নেই। শ্রেয়সীকেই নামতে হল নীচে। কিন্তু দরজা খুলেই অবাক।

অমিয়া!

হ্যাঁ। বলেই অমিয়া প্রণাম করল।

সঙ্গে কেউ আছে কি?

এই স্যুটকেশ।

ভেতরে আয়।

অমিয়া স্যুটকেশ টানতে টানতে শ্রেয়সীর পেছন পেছন দোতালায় উঠল। শ্রেয়সী জিজ্ঞেস করল, কোথায় ছিলি?

বোম্বেতে।

কাজ শেষ হয়েছে?

কাজ! বলেই অমিয়া চুপ করে গেল।

অমিয়ার উত্তরটা ঠিক মনোমত হল না। শ্রেয়সী অন্য প্রশ্ন করার আগেই অমিয়া বলল, পরে সব বলব। কিছু খাবার থাকে তো দাও। আমি স্নানটা করে আসি।

অমিয়া স্যুটকেশ খুলে কাপড়-জামা নিয়ে বাথরুমে ঢুকে পড়ল। শ্রেয়সীও রান্নাঘরে গেল খাবার আনতে।

স্নান করে মাথা মুছতে মুছতে যখন অমিয়া ঘরে ঢুকছিল তখন শ্রেয়সী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলল, অমিয়া শোন!

মায়ের কণ্ঠস্বরই অমিয়াকে জানিয়ে দিয়েছে তার মা কি বলতে চায়।

অমিয়া স্থির হয়ে দাঁড়াল।

এ সর্বনাশ কেন করলি?

অমিয়া মুখ চোখ লাল করে বলল, পরে বলব।

তোর বাবা জানতে পারলে আর রক্ষে রাখবে না।

রাখবে। রাখবে। বলেই স্যুটকেশ খুলতে খুলতে বলল, কিছু খেতে দাও, খিদে পেয়েছে। তারপর স্যুটকেশ থেকে একগাদা একশো টাকার নোট শ্রেয়সীর হাতে দিতে দিতে বলল, এই দিয়েই বাবার মুখ বন্ধ হবে। সবটা দিও না। কিছুটা

তোমার, কিছুটা আমার। সামান্য কিছু বাবার। টাকায় মুখ বন্ধ হবে।

শ্রেয়সী কেঁদে ফেলল। পরিণত বুদ্ধি মায়ের চোখ ফাঁকি দিতে না পারায় অমিয়াও বিব্রত বোধ করছিল তবুও বলল, কাঁদছ কেন? খেতে দাও।

অমিয়াকে খেতে দিয়ে শ্রেয়সী গেল মন্দাকিনীর কাছে।

সব কিছু বলে জিজ্ঞেস করল, কি হবে দিদি?

কিছুই হবে না। সন্তানকে পৃথিবীর আলো দেখতে দিতে হবে।

মানসম্মান রক্ষা করতে গর্ভপাত করালে কেমন হয়?

মোটেই ভাল হয় না। গর্ভপাত করিও না শ্রেয়।

কিন্তু ছেলের বাবার পরিচয় তো নেই। অমিয়াও তো সমাজে সহজ ভাবে চলতে পারবে না। সবাই নাক সিঁটকে বলবে, জারজ সন্তান।

মন্দাকিনী বলল, বৈধ ও অবৈধ এই দুটি শব্দ ভুলে যা শ্রেয়। সন্তান সন্তানই। বিবাহ বন্ধন না থাকলে পিতার পরিচয় দিতে পারে না ঠিকই কিন্তু সন্তান তো আকাশ থেকে পয়দা হয় না। কেউ না কেউ তার বাবা নিশ্চয়ই। সেটা স্থিরভাবে জানে সন্তানের মা। এই শিশু তো ভুঁইফোড় নয়। ভ্রূণহত্যা কি নরহত্যা নয়? কোন কোন ক্ষেত্রে ভ্রূণহত্যা আইনসম্মত হলেও সর্বক্ষেত্রে নয়। এরকম ঘটনা ঘটিয়ে তোরা অমর ও ঝন্‌কার সর্বনাশ করেছিস। মাতৃত্বের স্বাদ থেকে অবৈধ উপায়ে যদি বঞ্চিত করিস তা হলে তার পরিণতি ভাল হবে না।

কিন্তু এই সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব নেবে কে?

মা। বাবা তার দায়িত্ব পালন না করলে মা কি সন্তানকে পথে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে?

মায়ের যদি সামর্থ্য না থাকে?

সমাজ দায়িত্ব নেবে। বহু অনাথ আশ্রম আছে সেখানে স্থান করতে হবে। এ তো ভবিষ্যতের কথা। যখন যেমন অবস্থা হবে, তেমনি ব্যবস্থাও করতে হবে।

আমাদের সমাজ এরকম সন্তানের দায়িত্ব নিতে চায় না।

এটা আমাদের দুর্ভাগ্য। আমাদের এরকম মানসিকতা গড়ে ওঠেনি। তবে ভবিষ্যতে যে হবে না এমন হতাশা যেন আমাদের পেয়ে না বসে।

অমিয়াকে নিয়ে আমি খুবই চিন্তিত।

চিন্তার কোন কারণ নেই। সমাজব্যবস্থা বদল হচ্ছে, আমাদের সামাজিক দৃষ্টি-ভঙ্গীও বদল হবে। তুই তো জানিস ইউরোপীয় দেশে এই সব সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব নেয় রাষ্ট্র। ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর হাইল্যাণ্ডরাদের অধিকাংশই পিতৃপরিচয়-

হীন। এরাই পরবর্তীকালে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নতুন জীবনের সন্ধান পায়। সমাজে অপাংক্তেয় থাকে না।

কিন্তু অমিয়াকে কি সমাজ স্বীকার করবে? আবার তার বিয়ে দেওয়া কি সম্ভব হবে? জেনেশুনে কি কেউ তাকে বিয়ে করবে?

তোর কোন কথাই অস্বীকার করছি না। হিন্দু সমাজে একবারের বেশি মেয়েদের বিবাহ ছিল শাস্ত্রগতভাবে ও আইনত অসিদ্ধ। বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের পর মেয়েরা নিজেদের আর ভাগ্যের কাছে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়নি। তারপর বর্তমান ভারতীয় আইনে, বিবাহ-বিচ্ছেদ ও পুনঃবিবাহ স্বীকৃত। আমি যখন বলি আমার বাবা হরিচরণ তখন এটাই বোঝায় আমার পিতৃপ্রদত্ত সম্পদে অধিকার আছে। অমিয়ার সন্তানের সে সৌভাগ্য না হতে পারে কিন্তু সে তো মানুষের বাচ্চা, তাকে মানুষের মত দয়া, মায়া, মমতা দিয়েই বড় হবার সুযোগ দিতে হবে। পুরুষ যদি প্রথম স্ত্রীর সন্তান নিয়ে দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে পারে নারী কেন তার পূর্ব-স্বামীর সন্তান নিয়ে দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে পাববে না? যাক এসব কূট আলোচনা। অমিয়াও থাকবে, তার ছেলেও থাকবে।

আমি আমার মেয়েকে বিশ্বাস করতে পারছি না।

ভালমন্দ বিচার হবে পরে। হত্যা করে অমিয়াকে মাতৃত্বের স্বাদ থেকে বঞ্চিত করিস না। দেখবি এই সন্তানের জন্যই অমিয়া নিজের সবকিছু পাল্টে নতুন জীবন শুরু করবে।

আপনার ভাই তো মানবে না!

মানবে। অবশ্য সময়সাপেক্ষ। তার অতীতও নিষ্কলঙ্ক নয়। এটা সে জানে। সে মানতে বাধ্য হবে। তবে হতাশাবোধ থেকে উদ্ভূত মানসিকতা তাকে মাঝে মাঝে ক্ষিপ্ত করে তুলবে। তুই বাড়ি যা। অমিয়াকে সযত্নে রাখিস। ভবিষ্যৎ তোরও অজানা আমারও অজানা। মনে রাখিস, তোদের অপরিণামদর্শিতার জন্য ঝনুকা বাড়ি ছেড়েছে। এটা আর হতে দিস না।

শ্রেয়সী সব শুনে মাথা নীচু করে বসে রইল।

মন্দাকিনী বুঝলেন। তার যুক্তি সহজে স্বীকার করতে পারছে না শ্রেয় তাই বলল, যতীন যদি অশান্তি করে আমাকে খবর দিস।

লাভ হবে কি?

লাভ-লোকসানের হিসেব এখন করতে হবে না, কার্যকালে দেখা যাবে।

সন্ধ্যাবেলায় যতীন বাড়ি ফিরতেই শ্রেয়সী পাঁচ হাজার টাকা তার হাতে তুলে

দিয়ে বলল, অমিয়া এসেছে। অনেক টাকা উপায় করে এনেছে। তোমাকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছে।

যতীন অবাক হয়ে বলল, অমিয়া আমাকে এত টাকা দিতে বলেছে!

হ্যাঁ গো হ্যাঁ, অনেক টাকা উপায় করেছে বোম্বেতে।

অনেক টাকা! বোম্বেতে! অমিয়া কোথায়?

এসেই বাজারে গেছে। তোমার আমার জন্যে কিছু সওদা করতে।

তাই নাকি! ফিরে এলে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। আচ্ছা মেয়ে তো! আট-দশ মাস বেপাত্তা তারপর এতগুলো টাকা! নিশ্চয়ই সিনেমায় সে নাম করেছে! আচ্ছা বেশ! আজকাল তো কত বড় বড় ঘরের মেয়েরা হামেশাই সিনেমায় নামছে। দোষের তো কিছু দেখছি না। ভালই হয়েছে। কলকাতায় বসে বনের মোষ তাড়ালে কি পয়সা পেত, না নাম হত! যাই বল শ্রেয়, অমিয়ার বাবা-মায়ের ওপর বেশ টান আছে। কি বল?

শ্রেয়সী .মুখ ফিরিয়ে হেসে বেরিয়ে যেতে যেতে ভাবল, অমিয়ার কথাই ঠিক। টাকা দিয়েই মুখ বন্ধ করা যায়। যতীন টাকা পেয়ে উল্টোসুরে গান গাইতে আরম্ভ করেছে। অশেষ মহিমা টাকার!

অমিয়া আর যতীনের কি কথাবার্তা হয়েছিল তা কেউ জানে না তবে অমিয়া সগৌরবে এবং বহাল তবিয়তে শ্রেয়সীর আঁচলের তলায় আশ্রয় পেয়েছিল।

কোন হৈ-হাঙ্গামা না হলেও শ্রেয়সী নিশ্চিন্ত হতে পারেনি।

॥ সাত ॥

সবে মাত্র খবরের কাগজ পড়া শেষ করেছি এমন সময় মন্দাকিনী বললেন, শ্রেয়সীর ছেলে অমর আবার বিয়ে করেছে।

ভাল। নেমন্তন্ন করেছে বুঝি!

মন্দাকিনী বললেন, ওদের বিয়ে হল বোষ্টমদের কণ্ঠিবদলের মত তবে ওদের কণ্ঠিবদল হয় ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে। তাই নেমন্তন্ন পায় সীমাবদ্ধ বন্ধু-বান্ধবরা।

তুমি পিসি তোমাকে নেমন্তন্ন করা উচিত ছিল।

ঠাট্টা করছ?

তুমি একটুতেই অত সিরিয়াস হও কেন? মানুষ ঠাট্টা তামাসা হাসিকে

বাদ দিয়ে যদি বাঁচতে চায় তাহলে সে বাঁচা হবে ছন্নছাড়া দার্শনিকের বাঁচা। এর চেয়ে মরাও অনেক ভাল।

তা তো বুঝলাম। আজ অবধি শ্রেয়সী কোনদিন আমাদের নেমন্তন্ন করেনি, বোধহয় সে মনে করে আমরা প্রত্যাখ্যান করতে পারি, তবে তার বাড়িতে গেলে এক কাপের জায়গায় তিন কাপ চা দিতে কখনও কার্পণ্য করে না।

এ তো কম কথা নয়।

আবার ঠাট্টা! কাল শ্রেয়সী এসেছিল। বলছিল খোকার বউটা তো ভালই।

এটা তো সুখবর।

সুখবর নয়। এটা হয়েছে জ্বালা। অমিয়া কেন যেন সহ্য করতে পারছে না খোকার বউকে।

বললাম, অমিয়ার ছেলেটা কোথায়?

শ্রেয়সীর কাছে। সেটাই তো সমস্যা। শ্রেয়সী ব্যস্ত থাকে অমিয়ার ছেলেকে নিয়ে। নতুন বউকে রান্নাবান্না করতে হয় তারপর নাকেমুখে গুঁজে দৌড়তে হয় অফিসে। অমিয়া সাংসারিক কাজ একটাও করে না। হুকুম করে। তাকে ডাকলে মুখ ঝামটা দিয়ে ওঠে। আগের মত বের হয়। ফেরার কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। কেউ বলতে সাহস পায় না। এখন যতীন তার স্বপক্ষে, টাকার কি মহিমা! যতীনের মত দুর্জন টাকা পেয়েই খুশী। তবে নতুন বউ মুখ বুজে সব এখনও সহ্য করছে। কতদিন এই অবস্থা থাকবে সেটাই সন্দেহ।

বললাম, তারপর লড়াই। স্বাভাবিক।

আসল ঘটনা হল অমিয়া ছেলে পেয়েছে কিন্তু সংসার পায়নি। এই দুটোই তো মেয়েরা চায়। নতুন বউ সায়নী বিয়ের পর সাজানো সংসার পেয়েছে। সন্তান পাবার আশায় দিন গুনছে। দুজনের দৃষ্টি দুই মেরুতে। অমিয়া সহ্য করতে পারছে না।

বললাম যে কোন সংসারে তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতি অশান্তি ডেকে আনে। বিশেষ করে আইবুড়ো অথবা বিধবা ননদরাই অশান্তি ডেকে আনে। আমার মনে হয় অমিয়ার আশঙ্কা হল, যদি সায়নীর কোন সন্তান হয় তা হলে সবার আদর পাবে সায়নীর সন্তান। পিতৃপরিচয়হীন অমিয়ার সন্তানকে কেউ আর সাদরে গ্রহণ করবে না।

শ্রেয়সী নাতিকে যেমন ভালবাসে তেমনি ভালবাসে সায়নীকে। তাঁর কোন পক্ষপাত নেই। শ্রেয়সীর মত উদারপন্থী মেয়ে পাওয়া দুর্লভ।

তোমার সার্টিফিকেট সবাই মনে রাখবে না মন্দা।

তাতে আমার কি! ভালকে ভাল বলবই। এতে কারও কোন অভিযোগ থাকা উচিত নয়।

বললাম শ্রেয়সী সমাচারটা আমার জানার কথা নয়। তোমার কাছ থেকে যেটুকু শুনি সেটুকুই মনে রাখার চেষ্টা করি। অবশ্য তাতে আমার তোমার ও শ্রেয়সীর কোন লাভলোকসান হয়নি এবং হবার কোন সম্ভাবনাও নেই। আমাদের দেশের আইন হল, শোনা কথার কোন দাম নেই। তবুও মাঝে মাঝে মনে হয় তোমার শ্রেয়সীর ইচ্ছা অনুসারে এইসব ঘটনা নিয়ে একটা কাহিনী গড়ে উঠতে পারে। বড়ই জটিল এই শ্রেয়সীর চরিত্র। তুমি বলতে পার আজ অবধি কোন পুরুষ কোন মেয়েকে চিনতে পেরেছে! মনে কর আমি আর তুমি একসঙ্গে চল্লিশ বছর বাস করছি কিন্তু কেউ কাউকে চিনতে পেরেছি কি? মেয়েরা চিরকালই কেমন ধাঁধা মনে হয় আমার আছে।

আমিও উল্টোটা বলতে পারি। তবে তোমার হিসেবটা একেবারে বেঠিক নয়।

এর জবাব দিতে পারব না।

মন্দাকিনী হেসে বললেন, মনে কর তুমি বিচারক। তুমি যুক্তি দিয়ে বল দেখি শ্রেয়সীর শতেক যন্ত্রণার যখন শেষ নেই তখন অমিয়া আর সায়নীর ঠাণ্ডা লড়াইটা সে কিভাবে গ্রহণ করবে! তুমি হলে কি করতে? এই লড়াই যখন ময়দানে এসে যাবে তখন তার ফয়সালা কিভাবে হতে পারে?

শ্রেয়সীর কবর রচনা হবে। কিন্তু জিতবে কে?

সায়নী। তার জয় সুনিশ্চিত।

শ্রেয়সীর স্নেহ-ভালবাসা ছিল নিখাদ ও নিরপেক্ষ। অমিয়া মনে করত তার মা সায়নী সম্বন্ধে দুর্বল এবং তাকে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে। অমিয়া কথায় কথায় মাকে বলে, দেখেছ নতুন বউয়ের আক্কেল। রাত নটা বাজতেই সোয়ামীকে নিয়ে ঘরে খিল এঁটে দেয়। বড়ই বেহায়া মেয়ে। এর চেয়ে ঝন্‌কা ছিল অনেক ভাল। ভদ্র এবং সংসারধর্মী।

শ্রেয়সী চুপ করে শোনে কোন উত্তর দেয় না।

একদিন দু'দিন করতে করতে শ্রেয়সী বলল, আমি নতুন বউটাকে সকাল পাঁচটা থেকে কাজ করতে দেখছি। নটার মধ্যে রান্নাঘরের কাজ শেষ করে নাকে-মুখে ভাত গুঁজে নিজের কাজে বের হয়। আর সেই সূর্য ডুবলে তিন মাইল রাস্তা ঠেঙিয়ে বাড়ি ফিরেই হেঁসেলে আমাকে সাহায্য করে। এরপর তার তো বিশ্রাম

দরকার। কই তুই তো একবারও আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসিস না। আমাকেই বাকি কাজগুলো করতে হয়। অনিলা পড়া ছেড়ে আমাকে সাহায্য করে। তুই তো নজর দিস না কখনও। খেয়েদেয়ে বের হোস। কোনদিন রাত নটায়, কোনদিন রাত দশটায় ফিরিস। তোকে আর কি বলব। কাউকে ওভাবে ছোট করিস না অমিয়া।

বুঝেছি।

কি বুঝেছিস?

তোমার প্রশ্রয়ে নতুন বউ কাউকে গ্রাহ্য করে না। আর তোমার ছেলেও মেনি-মুখো। বউ ঘরে ঢুকলেই পেছনে পেছনে ঘরে ঢোকে। তুমি কিছু না বলতে পার আমি কিন্তু বড়দাকে ঝেড়ে কাপড় পরিয়ে ছাড়ব। এসব অসভ্যতা সহ্য করব না।

শ্রেয়সী বাধা দিয়ে বলল, এ কাজ কখনও করিস্ না অমিয়া। তোর নিজের কাপড়টা আগে ঝেড়ে পরিষ্কার করে তবেই অন্যের দিকে নজর দিস।

ক্ষিপ্তের মত অমিয়া বলল, তার মানে?

মানে তুই তো নিজেও জানিস। তুই তো গঙ্গাজলে ধোয়া তুলসীপাতা নোস। নিজের দিকে তাকিয়ে তবেই অন্যের দিকে তাকাতে হয়। জীবনভর ভুলের দণ্ড ভোগ করছি। আমার আশঙ্কা ছিল তোরাও ভুল করবি, দণ্ড পাবি। এখন দেখছি আমার ভুলের চেয়ে তোদের ভুলগুলো আরও জটিল। আমি মরলে তোকে দেখবার কেউ নেই রে। এখন আমার প্রতি ওদের যা শ্রদ্ধা আছে তারই মুনাফা নিয়ে চলতে হবে, ভবিষ্যৎ গড়তে হবে। নরপতিলালের দেওয়া টাকাগুলো ফুটো কলসীর জলের মত বেরিয়ে যাবে। তখন হা-হুতাশ করতে হবে।

তুমি নরপতিলালের কথা বলছ কেন?

নরপতিলালকে পথে বসিয়ে এসেছিস। এটা তো মিথ্যে নয়। তার অন্যায়ের জন্য যা শাস্তি সে পেয়েছে। তুই তো সুদেআসলে তার কাছ থেকে হিসেব মিটিয়ে এসেছিস, এরপর তো আর পাওনা নেই।

রাগে চোখ মুখ লাল করে অমিয়া ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ঘটনাটা যে সহজে মিটবে না তা কারও বুঝতে দেরি হয়নি। শ্রেয়সী যতই সত্যি কথা বলুক, অপ্রিয় সত্য যখনই কারও দুর্বলস্থানে আঘাত করে তখন আহত ব্যক্তি হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়। অমিয়া ব্যতিক্রম নয়। মায়ের কাছে তাড়না পেয়ে তার সব রাগ গিয়ে পড়ল সায়নীর ওপর। অমিয়া নিজেও জানে সায়নীর আচার-আচরণে কোন ত্রুটি নেই। যার জন্য তাকে কোন রকমে দোষের ভাগী করা যায় কিন্তু যার

দুষ্টবুদ্ধি ও খলতা হল আশ্রয়স্থল তার পক্ষে অশান্তি সৃষ্টি করা মোটেই কঠিন নয়।

পরদিন সকালবেলায় অমিয়া গিয়ে ঢুকল রান্নাঘরে।

সায়নী অবাক হয়ে গেল সাত সকালে অমিয়াকে রান্নাঘরে দেখে। বাধা দিয়ে বলল, তুমি কেন এসেছ সেজদি, এ কাজ তো তোমার নয়।

আজ থেকে আমিই সব করব। তোমার শাশুড়ী রাগ করে। বলে, বউটা খাটতে খাটতে মরে যাবার উপক্রম। আমরা নাকি গায়ে বাতাস দিয়ে বেড়াই। তুমি বাড়ির কাজ কর। পয়সা উপায় করে সংসারে সাহায্য কর। আর আমরা নাকি বসে বসে গিলি। বউদি, তোমাকে এভাবে জীবনপাত করতে দেব না।

এসব কি কথা বলছ সেজদি? মা এমন কথা বলতেই পারেন না।

আমি কি মিথ্যে বলছি। মাকেই জিজ্ঞেস করে নিতে পার। তুমি যাও, সময়-মত তোমার অফিসের ভাত ঠিকই পাবে।

আমি খুবই দুঃখিত।

কেন?

তুমি যা বললে তা ঠিক নয়। কেউ যদি এসব কথা বলে থাকে সে সত্যি কথা বলেনি। তুমি রাগ কর না সেজদি। আমি তো নতুন। কে কি বলে তা আমি জানি না। বুঝিও না। আমি তো চুপ করে বসে থাকতে পারি না। কিছু না কিছু কাজ আমি করতে চাই। কোন কিছু কাজ আমাকেও করতে দাও।

তুমিই যদি সব কর আমি কি করব।

এটা তোমার রাগের কথা ঠাকুরঝি। তুমি উঠে যাও, তোমার ছেলে উঠে পড়েছে, এখুনি কান্নাকাটি করবে। আমি বাচ্চার খাবারটা তৈরী করছি, তুমি ওর মুখ ধুইয়ে নিয়ে এস। যাও সেজদি, তাড়াতাড়ি কর, নইলে আমি রাগ করব।

অমিয়া হার মানল সায়নীর কাছে।

হার মানবার মেয়ে নয় অমিয়া। সুযোগের অপেক্ষা করছিল।

অমরকে কেন্দ্র করে আজকাল প্রায়ই বাক্‌বিতণ্ডা হয় ভাইবোনদের মধ্যে, কেউ সপক্ষে কেউ বিপক্ষে। কখনও নীচু গলায়, কখনও সবই শোনে না, কখনও উঁচু গলায়। সায়নী সবই শোনে, কখনও মুখ খোলে না। বাদপ্রতিবাদ করে না। নীরব শ্রোতা মাত্র। এখানেও অমিয়া হার মানতে বাধ্য হল।

সায়নী বুঝল, বোবারও শত্রু থাকে। তবে বোবার প্রতি আক্রমণের ধারটা ততটা তীক্ষ্ণ হয় না। বিষ দাঁত বসাতে চেষ্টা করলেও নীরব শ্রোতার মনে তার বিষ প্রবেশ করে না।

যতীন পাঁচ হাজার টাকা পেয়ে সাময়িক খুশী হলেও তার প্রত্যাশা ছিল অনেক বেশি। তাকে জানতে দেওয়া হয়নি অমিয়ার অর্থলাভের গূঢ় রহস্য, একমাত্র শ্রেয়সী অনুমান করে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আসল ঘটনা জেনেছিল।

যতীন জিজ্ঞেস করলেই অমিয়া বলত, কলকাতার প্রোডিউসাররা পয়সা দিতে চায় না। যা দিতে চায় তাতে কোন ক্লাস ওয়ান আর্টিস্ট কাজ করলে তার মান সর্বদা থাকে না তাই ঠিক করেছি আবার বোম্বেতেই যাব। বোম্বাই হল অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সোনার খনি। এখানকার স্টুডিও হল জানোয়ারের খাঁচা, আর বোম্বাই—উঃ, যেন স্বর্গ! ভাবছি বোম্বেতেই যাব। যেতে পারছি না ছেলেটার জন্য। একটু বড় হলেই বের হব।

তুই তো রেডিওর নাটকে দু-একবার কাজ করেছিস। এখন কেন পাস না?

আমি অনেক দিন কলকাতায় ছিলাম না। ওরা ডেকেও পায়নি। তাই প্রোগ্রামও পাই না তবে বোম্বে যাওয়া না হলে এখানে ছোট কাজও নিতে হবে। অসুবিধে হয়েছে বাচ্চাটা নিয়ে। কেউ সামলালে আমি বের হতে পারতাম।

যতীন চিন্তিতভাবে বলল, বউমার কাছে রেখে যেতে তো পারিস।

গোটা দিনটা কোথায় থাকবে।

তোর মায়ের কাছে। সে-ই তো এতকাল তাকে সামলাচ্ছে।

মায়ের তো শরীর ভাল নয়, বউদির চাকরি, ছোটদা আর অনিলার কলেজ। কে দেখবে বল। রাতের বেলায় তো আমিই সামলাই। দিনের বেলার হাঙ্গামাটা সামলাতে পারছি না।

যতীন বলল, দেখি কি করা যায়!

ছাইয়ে ঢাকা আগুন দেখা না গেলেও উত্তাপ থাকে। বাইরে থেকে অনুমান করা না গেলেও হঠাৎ যে কোন কারণে উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ে। তখন সামান্য থেকেই ভয়ঙ্কর অবস্থা দেখা দিতে পারে।

এতকাল আগুন চাপা ছিল। উস্কানি দিতে গিয়ে ছোঁয়া লাগল, উত্তাপ তখনই বোঝা গেল।

মাঝে মাঝেই বিকেলবেলায় উৎকট সাজসজ্জা করে অমিয়া বাড়ি থেকে বের হয়। ফেরে অনেক রাতে। আগেও যেমন সে কাউকে কিছু না বলেই যেত এখনও তাই যায়। বাড়ির লোকের চোখ এড়াতে পারলেও পাড়ার লোকের চোখ এড়াতে পারেনি। অনেকেই তাকে চৌরঙ্গী এলাকায় দেখেছে। কানঘুষো থেকে প্রকাশ্যে এসেছে আলোচনা। অমরের কানে উঠতেই কেমন বিব্রত বোধ করছিল

সে। শ্রেয়সীকে ডেকে গোপনে সব কথা বললেও শ্রেয়সী সাহস পেল না অমিয়াকে কিছু বলার।

ক্রমে ক্রমে গোটা পাড়ায় খবরটা চাউর হতেই শ্রেয়সী বাধ্য হল অমিয়াকে জিজ্ঞেস করতে।

অত রাত অবধি কোথায় থাকিস অমিয়া ?

সকাল বেলায় অমিয়া ঘুম থেকে ওঠে না। সাড়ে সাতটায় ব্রাশ নিয়ে বাথরুমে ঢুকছিল এমন সময় শ্রেয়সীর প্রশ্নে কোনরকম উত্তেজনা দেখা গেল না। নির্বিকার ভাবে বলল, তোমার জানার দরকার আছে কি ?

আছে। পাড়ার ছেলেরা বলাবলি করছে তোকে নাকি রোজই চৌরঙ্গী পাড়ায় রাতের বেলায় দেখা যায়। কথাটা মোটেই ভাল নয়।

ওরা বুঝি আমার অভিভাবক ? ওদের কথার দাম কি ?

সমাজে থাকতে হলে কিছু শৃঙ্খলা মেনে চলতে হয়।

তুমি চলেছিলে ?

কি বললি ! আর কিছু বলার আগেই কাঁপতে কাঁপতে ধপাস করে বসে পড়ল শ্রেয়সী। দূর থেকে মাকে বসতে দেখে অনিলা চিৎকার করে উঠল। পাশের ঘর থেকে ছুটে এল অমর, রান্না বন্ধ করে সায়নী এসে দাঁড়াল। অমর আর সায়নী তাড়া-তাড়ি শ্রেয়সীকে শোবার ঘরে নিয়ে গেল ধরাধরি করে। অমিয়া চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। ব্রাশ দিয়ে দাঁত ঘষতে ঘষতে বাথরুমে ঢুকবার মুখে অনিলা জিজ্ঞেস করল, তুই কিছু বলেছিস কি মাকে ?

অমিয়া গম্ভীরভাবে বলল, মাকে জিজ্ঞেস করিস।

যতীন নীচে ছিল। চিৎকার শুনে সেও ছুটে এসেছিল।

অনিলা বলল, মা হঠাৎ পড়ে গেছে।

কোথায় সে ?

দাদার ঘরে দাদা-বউদি তাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছে।

বিরক্তির সঙ্গে বিড়বিড় করে যতীন বলল, মাগী মরবেও না, হাড় জ্বালাবে।

এ কি বলছ বাবা ! প্রতিবাদ করল অনিলা।

ঠিক বলেছি। বলেই অনিলার গালে ঠাস্ করে চড় কষিয়ে দিল যতীন।

অনিলা চিৎকার করে বলল, খুব আক্কেল তোমার। মা মরতে চলেছে। আর তুমি তাকে গাল দিচ্ছ। সামান্য প্রতিবাদ করলাম। তাই আমার কপালে জুটল চড়। তোমার মত বাবা যাদের তারা কেন যে গলায় দড়ি দিয়ে মরে না ! হায়

কপাল! তোমার লজ্জা হল না আমার গায়ে হাত তুলতে! এমনি করে মাকে দগ্ধে দগ্ধে মেরেছ। এখন বাকি আমরা।

চিৎকার শুনে অমর ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

তাকে দেখেই যতীন হনহন করে নীচে নেমে গেল।

কিছুটা সুস্থ হয়ে শ্রেয়সী পাশ ফিরে শুয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, মা!

তার অচেতন মন থেকে এই ছোট শব্দটি অসাড়ে বেরিয়ে এসেছিল। সায়নী প্রথমে বুঝতে পারেনি। পরে মনে হল শ্রেয়সী তার নিজের মাকেই স্মরণ করছে। কিন্তু কোথায় তার মা তা তো কেউ জানে না। মা জীবিত কি মৃত তারা জানে না। এতদিন শ্রেয়সীর সংসারই দেখেছে। তার মায়ের কথা কখনও শোনেনি।

অমরকে রাতের বেলায় জিজ্ঞেস করল, তোমার মা তোমার দিদিমাকে বোধহয় খুঁজছিল। তিনি কতদিন আগে মারা গেছেন।

কোন উত্তর না দিয়ে মাথা নীচু করে অমর বসে রইল।

কথা বলছ না কেন?

বলার কথা হলে নিশ্চয় বলতাম।

এতে না বলার মত কি আছে। তোমাকে বলতে হবে কতদিন আগে তোমার দিদিমা মারা গেছেন।

তোমার এত আগ্রহ কেন? ওটা শুনে তোমার কি লাভ?

লাভলোকসানের কথা নয়। তোমার মা আজ তোমার দিদিমার কথা বারবার স্মরণ করছেন। তাঁর একটা ছবিও তো রাখতে পারতে। মা যে কি সম্পদ তা তো জান!

ছবি! তা বটে। তবে সব কথা তোমাকে বলতে পারিনি, বলতেও চাইনি। আমাদের এই অভিশপ্ত পরিবারে তোমার মত গুণী মেয়ে মোটেই শোভা পায় না। এটা জানি ও বুঝি! সেজন্য অনেকবার বলতে চেয়েও বলতে পারিনি। তুমি তা হলে আর আমাদের ভালবাসতে পারবে না, শ্রদ্ধা থাকবে না, ঘৃণা জন্মাবে। শেষে তুমিও হয়ত ঝন্‌কার মত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়বে।

সায়নী হেসে বলল, তোমার সব কিছু জেনে শুনেই তো বিয়েতে রাজি হয়েছিলাম। ঝন্‌কা আর সায়নী এক পথের ও মতের 'নাও হতে পারে। ভবিষ্যৎ চিন্তা করার চেয়ে বর্তমানকে স্বীকার করে এগোতে হয়। অতীত না থাকলে তো বর্তমান গড়ে উঠতে পারে না, তাই পালিয়ে যাবার ভয় নেই, পালিয়ে যাবও না।

অমর অনেকক্ষণ মুখ নীচু করে থেকে নীচুগলায় বলল, দিদিমা মরেননি, বেঁচেই

আছেন।

বেঁচে আছেন! কোথায় আছেন?

মথুরা বৃন্দাবনে তীর্থ করতে যাননি, তবে কলকাতার আশেপাশেই আছেন। পুরোপুরি হদিস দিতে পারব না। এলাকাটা আমি জানি, সঠিক ঠিকানা জানি না, কখনও তাকে দেখিনি, মায়ের কাছে শুনেছি, হঠাৎ বোধহয় নিজের অজান্তেই বলেছিল।

সায়নী উৎসাহ দেখিয়ে বলল, একটা কাজ করলে কেমন হয়। আমরা দুজন গিয়ে হাজির হই তাঁর কাছে, তারপর ধরে নিয়ে আসি এখানে।

যেতে পারি। খুঁজতে পারি কিন্তু তাঁকে আনা যাবে না। সব কথা শুনে তোমার কাজ নেই। সব তো বলাও ঠিক হবে না। শুনলে তোমার মাথা খারাপ হবে সায়নী। যতীন সরকার আর শ্রেয়সী সরকারের বিচিত্র জীবন, বিচিত্র তার পরিবেশ, বিচিত্র তার পরিণতি। সব কিছু তুমি সহ্য করতে পারবে না।

তুমি সব জান?

সব না হলেও বেশিটা জেনেছি। কিছুটা অনুমান করে নিয়েছি। অবশ্য সবই জেনেছি ধীরে ধীরে। মতামত দিতে পারিনি। সে যে কি জ্বালা তা তুমি বুঝবে না, মর্মে মর্মে অনুভব করছেন আমার মা। আমার দাদামশায় দিগম্বর উকিল মৃত্যুকালে তাঁর একমাত্র কন্যাকে একটি বাড়ি আর নগদে আর গয়নায় তৎকালে লক্ষাধিক টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন। সব গেছে, আছে শুধু একটা বাড়ি। তাও যেত, মাকে দিয়ে দলিলে সই করতে পারেনি বলেই থেকে গেছে এখনও। ওই বাড়ি-ভাড়ায় আমাদের পেট চলেছে, লেখাপড়া শেখা হয়েছে। বাবার মাইনের টাকায় আটদশজনের খোরাকিরও সঙ্কুলান হত না, এখনও হয় না। গয়না যা ছিল বোনেদের ভাগ করে দিয়েছে। নগদ কড়ি তলানি পড়েছে। এখন যা দেখছ, উপভোগ করছ, তা ওই বাড়িভাড়া আর আমাদের দুজনের উপার্জনের ফসল। অমল পাস করে বের হলে তাকেও খুঁজতে হবে জীবিকা। অনিলার বিয়েটাও বাকি। এসব শেষ করে মা গঙ্গাস্নান করে হয়ত কাশীবাসী হবেন।

সায়নী বাধা দিয়ে বলল, ওসব শুনতে চাই না। কাল তুমি অফিস থেকে হাফ্‌ডে করে আমার অফিসে আসবে। দুজনে বের হব তোমার দিদিমার সন্ধানে।

এর চেয়ে ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে বের হলে সাফল্য লাভ করবে।

ঠাট্টা রাখ। এই ব্যবস্থাই পাকা রইল, কেমন?

খুব ভাল হবে কি?

মন্দ কিছু হবে না। তার ঠিকানা বের করতে কদিন পেরিয়ে যায় তারই বা ঠিক কি!

পরের দিন অমর আর সায়নী বেরিয়ে পড়ল নিভাননীর সন্ধানে। সন্ধান পাওয়া তো সহজ নয়। এলাকাটা জানলেও রাস্তার নাম বাড়ির নম্বর কিছুই জানা ছিল না। লোকমুখে শুনেছে প্রকাশ সরকার ব্যবসায় করছে। কিসের ব্যবসা তাও জানা নেই। রাস্তার ধারে ধারে সারি সারি দোকান। কোন্‌টার মালিক যে কে তা আবিষ্কার করা দেবতারও অসাধ্য। ঘুরতে ঘুরতে দুজনেই ক্লান্ত। এমন সময় সায়নী অমরের হাত ধরে টান দিল।

অমর মুখ ফিরিয়ে বলল, কি?

ওদিকে তাকাও।

অমর তাকিয়ে দেখল, দরজার ওপর সাইনবোর্ড ঝুলছে, 'নিভাননী স্টোর্স।

সায়নী বলল, এখানে একবার ট্রাই করলে কেমন হয়?

বেশ, চল।

দুজনে দোকানে ঢুকেই জিজ্ঞাসা করল, এটা কি প্রকাশবাবুর দোকান?

বিক্রেতা মুখ নীচু করে বলল, হ্যাঁ। কি চাই?

প্রকাশবাবুকে।

তিনি তো আজকাল আসতেই পারেন না। বাড়িতেই থাকেন।

আপনি বুঝি দেখাশোনা করেন?

হ্যাঁ। আমি তাঁর জামাই।

ভাল হল। তার লোকই পেয়েছি। বাড়ির ঠিকানা দিতে পারেন?

আপনারা কোথা থেকে আসছেন? কি দরকার বলুন?

সায়নী এগিয়ে এসে বলল, আমরা বালিগঞ্জ থেকে আসছি। তাঁর ভাইপো যতীন সরকার পাঠিয়েছেন একটা খবর দিতে, যতীন সরকার আমার শ্বশুরমশায়। তিনি কিছু টাকা ধার নিয়েছিলেন প্রকাশবাবুর কাছ থেকে। টাকাটা এনেছি। তাঁকেই দিয়ে যাব।

আমাকে টাকাটা দিয়ে যেতে পারেন।

সেটা সম্ভব নয়। আপনি তাঁকে বলবেন আমরা এসেছিলাম। দু-একদিনের মধ্যে আবার আসব।

প্রকাশ সরকারের জামাতা কিছুক্ষণ ভেবে বলল, তার চেয়ে আপনারা সামনের গলি দিয়ে যান। বাঁ দিকে ঘুরলেই আঠার নম্বর বাড়ি। সেখানে গিয়ে ওঁর নাম

বললেই চিনিয়ে দেবে।

ধন্যবাদ বলেই দুজনে এগিয়ে গেল।

নির্দিষ্ট দরজার সামনে এসে কড়া নাড়তেই মধ্যবয়সী একটি মহিলা এসে দরজা খুলেই জিজ্ঞাসা করল, কাকে চান ?

নিভাননী দেবীকে।

কোথা থেকে আসছেন ?

অমর বলল, তাঁকে বলুন শ্রেয়সী পাঠিয়েছে।

মহিলাকে চিৎকার করে ডাকল, মা ! এদিকে এস, কে একজন শ্রেয়সী তোমার কাছে দুজনকে পাঠিয়েছে।

ওপরতলা থেকে উত্তর এল, পাঠিয়ে দে।

উপরে উঠেই দেখল একটা খাটে প্রায় সত্তর বৎসরের এক বৃদ্ধা শুয়ে আছে।

বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করল, কাকে খুঁজছ তোমরা ?

নিভাননী দেবীকে।

আমিই নিভাননী। কোথা থেকে আসছ ?

অমর এগিয়ে এসে বলল, আমি শ্রেয়সীর ছেলে।

বৃদ্ধা নিভাননী কানে খাটো হলেও শ্রেয়সীর নাম শোনা মাত্র কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল। কে যেন অলক্ষ্যে তার মুখে কালো কালির একটা পোঁচ এঁকে দিল।

আমাদের বসতে বললে না তো দিদিমা।

দিদিমা ! চমকে উঠল নিভাননী। প্রায় চল্লিশ পয়তাল্লিশ বছর আগের কলঙ্কজনক স্মৃতি বোধহয় নিভাননীর বাক্‌রোধ করেছিল। কেমন একটা আবেগ অথচ উষ্ণতা নেই। নিভাননীর দৃষ্টিশক্তি যদিও কমে এসেছিল তবুও হাত বাড়িয়ে অমরকে বসতে বলল।

আর বসব না দিদিমা। শুনেছিলাম তুমি বেঁচে আছ। অনেক দিন তোমাকে দেখবার ইচ্ছা ছিল। ছিল কিছু প্রশ্ন। প্রথমটা হয়েছে। দ্বিতীয়টা বড়ই মর্মস্পর্শী তাই ওটা আর করব না।

তোমার সঙ্গে কে ?

আমার স্ত্রী। তোমার নাতবউ সায়নী। তুমি ভাল আছ তো ?

নিভাননী কোন উত্তর দিতে পারল না। তার দুই গাল বেয়ে চোখের জল নামতে থাকে।

তুমি কাঁদছ দিদিমা। আমার মা সারাজীবন চোখের জল ফেলেছে। তুমি তো

আজই প্রথম কাঁদলে। এতেই তোমার মন হালকা হবে। কাঁদতে কাঁদতে বিজয় মামা ঘর ছেড়েছে, আর ফিরে আসেনি। আমরা তোমাকে শুধু দেখতে এসেছি। আমার মা তার সন্তানদের জন্য কত না দুর্ভোগ লাঞ্ছনা সহ্য করেছে, কিন্তু তুমি মা হয়েও তার বিন্দুমাত্রও সহ্য করনি। তোমার মাতৃত্বে মায়া মমতা স্নেহ ভালবাসার কতটা স্থান আছে তা জানতে এসেছি। আমার মা এখনও তোমাকে খোঁজে। কিন্তু তুমি কেমন মা সেটাই ভাবতে পারছি না।

নিভাননী পাথরের মত শক্ত হয়ে বসে রইল। প্রতিবাদ করার কোন ভাষা তার ছিল না।

সায়নীর হাত ধরে টানতে টানতে অমর বলল, সায়নী যা জানার, যা দেখার সবকিছুই সম্পূর্ণ হয়েছে। এবার চল।

নিভাননীর সম্মুখ দিয়ে তার প্রথম সন্তানের বংশধর বেরিয়ে গেল। না পারল তাদের আপ্যায়ন করতে, না পারল তার নিজস্ব কোন বক্তব্য বলতে। গৃহত্যাগ করে আসার পর এমনভাবে ব্যঙ্গসূচক কথা তাকে কেউ শোনায়নি। কাউকেই জানতে দেয়নি তাদের অতীত। তার অন্তরের অন্তস্তলে এমনভাবে আঘাত করতে পারেনি কেউই। অথচ সত্য—সবটাই সত্য। সত্য যে একদিন বিকট রূপ ধরে তার সামনে আসবে তা ভাবতেও পারেনি। ওরা চলে যেতেই নিভাননী আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে চুপ করে বসে রইল।

দোতলা থেকে প্রকাশের গলা শোনা গেল। দেখ তো রতন তোর ঠাকুমা ওদিকের ঘরে কি করছে। প্রকাশের কথাগুলো শুনতে পেয়ে নিভাননী নিজেকে সামলে নিল। রতন এসে দেখল নিভাননী স্বাভাবিক ভাবেই বিছানায় বসে আছে।

রাস্তায় এসে সায়নী বলল, তোমার দিদিমাকে বুঝতে পারলাম না।

আমি বুঝেছি, তোমার আর বুঝে কাজ নেই। হতাশা আর ব্যর্থতার প্রতিমূর্তি, অনুশোচনার সমুদ্রে সাঁতরে বেড়াচ্ছে, কূলকিনারা খুঁজে পাচ্ছে না। দিদিমার নগদ টাকা আর গয়না বিক্রি করেই বোধহয় এই ব্যবসা। ব্যবসাটা দিদিমার নামেই নিশ্চয় আছে। নইলে প্রকাশ সরকারের সঙ্গে অনেক আগেই ছাড়াছাড়ি হওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক।

সায়নী অন্যমনস্ক হয়ে চলতে চলতে বলল, হুঁ!

দিদিমার মুখের চেহারাটা ভাল করে দেখেছ কি?

দেখেছি।

কিছু বুঝলে?

না। বোঝবার চেষ্টা করিনি।

আমাদের এই বাড়ির ঘৃণ্য চিত্র ফুটে উঠেছিল ওঁর মুখে। আশ্চর্য, মা হতে পারেনি বলে একজন ঘর ছেড়ে গেল, আরেকজন মা হয়েও স্বামী ছেড়ে চলে গেল। একই বাড়ির ঘটনা। অথচ আমিও দোষী নই। আমার দাদামশাই তো নির্দোষ মাটির মানুষ।

সায়নী নীচুগলায় বলল, সবই সম্ভব। আবেগ আর উত্তেজনা মানুষকে কোথায় নিয়ে যায় তা বলা কঠিন। এমন অবস্থাকে আমরা প্রশংসা করি না, কিন্তু ঘটে। তবে এসব ব্যতিক্রম। সুস্থ সমাজব্যবস্থার পরিপন্থী।

একটু জোরে পা চালাও। একটা ট্যাক্সি পেলে তাড়াতাড়ি ফিরতে পারতাম।

সন্ধ্যা নামতে না নামতে দুজনেই ফিরে এসেছিল। কারও সঙ্গে কোন কথা না বলে সায়নী ঢুকল রান্নাঘরে। অমর গেল শ্রেয়সীর কাছে।

অমল এসে বলল, ডাক্তারবাবু বলে গেলেন রক্তের চাপ খুব বেশী। সম্পূর্ণ বিশ্রাম ও ঘুম দরকার। ঘুমের ওষুধ দিয়েছে। তাই খাওয়ানো হয়েছে।

মাকে ঘুমন্ত দেখে অমর বেরিয়ে গেল।

অনেক রাতে অমিয়া ফিরে এল। এটা তার প্রাত্যহিক কাজ। অমিয়া সোজা রান্নাঘরে গিয়ে নিজেই ভাত বেড়ে খেয়ে নেয়। মায়ের কাছে যাবার অথবা খবরা-খবর দেবার প্রয়োজনও মনে করে না।

সকালবেলায় একগোছা টাকা নিয়ে যতীনের হাতে দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

কিছু বলতে চাস?

টাকা।

কত?

গুনে নাও। মা কিন্তু পছন্দ করে না আমার কাজকর্ম। ফিরতে দেরি হলে রাগারাগি করে।

ওটা আমি সামলাবো। তোকে ভাবতে হবে না। কাজ করে সবাই পয়সা উপায় করে। এতে তো কোন দোষ নেই। তোর মা সারাজীবন আমাকে জ্বালিয়েছে। এবার তোর পালা। তোকে না শেষ করে ছাড়বে না।

যতীন টাকা গুনতে গুনতে বলল, কিছু তোর কাছে রেখে দে। তোর নিজের তো খরচা আছে।

আমার টাকা আলাদা করে রেখেছি। সব টাকাই তোমার। তুমি একটা বাড়ি কিনবে বলেছিলে। আমি শীগগিরই আরও টাকা পাব। তুমি বায়না করতে পার।

যতীন টাকা বাক্সে তুলতে তুলতে বলল, যা, খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়।

কাহিনীর শেষ এখানে হলেই ভাল হত। কিন্তু সময় যেমন এগিয়ে যায় জীবনের নানা ঘটনাও তেমনি এগিয়ে যায়। যতীন সরকারের পরিবারের ঘটনাগুলো বাধাহীন ভাবে এগিয়ে চলছিল। শ্রেয়সী সুস্থ হয়ে উঠেছে। আবার সংসারের কাজে হাত দিয়েছে। সায়নী সাধ্যমত তাকে সাহায্য করছে। এমন সময় শ্রেয়সী শুনতে পেল যতীন একটা বাড়ি কেনার জন্য বায়না করছে।

সোজাসুজি যতীনকে জিজ্ঞেস করল, তুমি নাকি একটা বাড়ি কিনছ?

আমি কিনছি না, কিনবে অমিয়া।

তুমি কোনদিন জানতে চেয়েছ, অমিয়া এত টাকা কোথায় পেল?

অবশ্যই জেনেছি। চারটে ছবিতে তার কণ্ট্রাক্ট হয়েছে। অগ্রিম পেয়েছে, আরও পাবে।

তুমি কণ্ট্রাক্টের দলিল দেখেছ?

দরকার হয়নি। অমিয়া বলেছে সেটাই যথেষ্ট।

তা হবে,—বলেই শ্রেয়সী নিজের কাজে গেল।

রাতের বেলায় অমিয়াকে জিজ্ঞেস করল, তুই এত টাকা কোথায় পাস?

বাবা বলেনি তোমাকে!

বলেছে। আমার প্রত্যয় হয়নি। শুনছি তুই ফিল্মে অভিনয় করিস। আজ অবধি কোন ছবিতে তোর চেহারাও দেখিনি। সত্যি কথা বল।

বাবা যা বলেছে তাই সত্যি। বিশ্বাস না করলে আমি কি করব!

একবার ঠকেছিস, ঠকিয়েছিস নরপতিলালকে। নিজের মানসম্মান বজায় রাখতে, কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচতে তার সর্বস্ব তোকে দিতে বাধ্য হয়েছিল। তার পাপ ছিল তোর গর্ভে। তুই স্বেচ্ছায় পাপে সম্মতি দিয়েছিলি নরপতিলালের সর্বনাশ করে টাকার পাহাড়ে বসে থাকতে। তোর পাপের নমুনাকে বাঁচাতে আমাকে দুর্ভোগ সহ্য করতে হচ্ছে আজও। পয়সার লোভে আবার কিছু করতে বসেছিস, অন্যের সর্বনাশ করে তুই টাকা উপায় করছিস। এত পাপ সহ্য হবে না রে অমিয়া। এখনও সময় আছে, সাবধান হ নইলে ফেঁসে যাবি।

তুমি এসব কথা আমাকে বলছ কেন?

তোর মঙ্গল চাই। তুই ভুল করছিস, আমি মা হয়ে বাধা দেব না! এটাই তো মায়ের ধর্ম।

তোমার ভীমরতি হয়েছে।

সখেদে শ্রেয়সী বলল, ওরে ভুল করলে তার মাশুল দিতে হয়। তোকে সাবধান করি তোর মঙ্গল চাই বলে। আর নীচে নামিস না।

সে আমি বুঝব। তোমাকে ভাবতে হবে না।

শ্রেয়সীকে আর ভাবতে হয়নি। ভাবনার পরিসমাপ্তি ঘটতে বিলম্ব হয়নি।

সকালবেলায় অনিলা এসে বলল, সেজদির ঘুমই ভাঙছে না মা। ডাকাডাকি করলাম কোন শব্দ পেলাম না। শীগগির চল।

শ্রেয়সী ছুটে গেল অমিয়ার ঘরে। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকেই দেখল অমিয়া টানটান হয়ে শুয়ে আছে বিছানায়।

শ্রেয়সী অমিয়াকে ধাক্কা দিয়ে ডাকল।

চিৎকার শুনে সবাই ছুটে এল। অমিয়ার বুকে হাত দিয়ে দেখল। তখনও বুকটা নড়ছে।

অনিলা ছুটে গেল অমরের কাছে। অমর ছুটল ডাক্তারের খোঁজে। ভাগ্যি সেদিন ছিল ছুটির দিন। সবাই সেদিন বাড়িতেই ছিল।

ডাক্তার এল।

পরীক্ষা করে বলল, আমার মনে হচ্ছে ওভারডোজ ঘুমের ওষুধ খেয়েছে। হাসপাতালে নিয়ে যান। এ রুগীর চিকিৎসা করার মত যন্ত্রপাতি আমার নেই। আমি দায়িত্ব নিতে পারব না। কিছু খারাপ হলে পুলিস কেস হতে পারে। একটা ইনজেকশান দিয়ে দিচ্ছি যাতে হঠাৎ কোন ক্ষতি হবে না। চিকিৎসার সময় পাবেন। আর বিলম্ব করবেন না।

অমর রুগীকে নিয়ে ব্যস্ত। হাসপাতালে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছে। অমল বাজার করে এসে সবে বাড়িতে ঢুকে এই অবস্থা দেখে হতবাক্। সায়নী অমরকে গাড়ি ডাকতে বলে অস্থিরভাবে ঘর-বার করছে। অমল আর শ্রেয়সী অমিয়ার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে মাথায় জল ঢালছে আর বাতাস করছে। অনিমা খবর পেয়ে ছুটে এসেছে। অমিয়ার ছেলেটা দরজায় দাঁড়িয়ে কাঁদছে। আর যতীন? তখনও সে ঘুম থেকে ওঠেনি।

হাসপাতালে শ্রেয়সীকে যেতে দেয়নি। অমিয়ার ছেলেকে নিয়ে শ্রেয়সী ঘরেই চুপ করে বসে রইল।

সবাই হাসপাতালের দরজায় উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিল।

সন্ধ্যার সময় অমর ভেতর থেকে এসে বলল, অমিয়ার জ্ঞান হয়েছে।

সায়নী বলল, মেজদি আর তুমি অপেক্ষা কর। আমি ঠাকুরপোকে নিয়ে

বাড়ি গিয়ে মাকে খবরটা দিচ্ছি।

শ্রেয়সী শুনল, কোন কথা বলল না।

সায়নী গেল রান্নাঘরে।

শ্রেয়সীর গলার শব্দ পেয়ে ফিরে এল।

আমার ওষুধের একটা বড়ি দাও তো বউমা।

সকালে আপনি ওষুধ খাননি? সকালেই তো ওষুধ খাওয়ার কথা। এত দেরি করলেন কেন?

সময় পাইনি।

আপনি তো জানেন, ওষুধ খেলেই কাজ দেয় না সঙ্গে সঙ্গে। ওষুধকে কাজ করতে দিতে সময় দরকার। আপনিও ভুল করছেন।

সায়নী ওষুধ খাইয়ে আবার রান্নাঘরে ঢুকল। সকালে কারও খাওয়াদাওয়া হয়নি। তাড়াতাড়ি খাবার ব্যবস্থাটা করতেই হবে।

অমিয়া কেন বেশি করে ঘুমের ওষুধ খেল, এই প্রশ্ন সবার মনে।

অমর ও সায়নী ভেবেচিন্তে কোন কারণই খুঁজে পেল না।

তবে কারণ খুঁজতে খুব দেরি করতে হয়নি।

অমিয়া ফিরে এল হাসপাতাল থেকে। দশদিন হাসপাতালে থেকে কিছুটা সুস্থ হয়েছিল কিন্তু ফিরে আসার আগ্রহ তার ছিল না। বাড়ি এসে নিজের ঘরটায় সারাদিন শুয়ে থাকত, তার ছেলেটাকে মাঝে মাঝে কাছে ডেকে আদর করত। সায়নী সময়মত খাবার দিয়ে যেত ঘরেই। শ্রেয়সী কখনও কখনও এসে বসত তার পাশে।

তারপর পনর দিনও কাটেনি।

পুলিস হাজির হল যতীনের বাড়িতে। অভিযোগ অমিয়ার বিরুদ্ধে।

পুলিস এসেছে, সঙ্গে একজন অবাঙালী যুবক।

অমিয়া সরকারের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে।

শ্রেয়সীর কানে খবর পৌছনো মাত্র অমিয়াকে পেছনের দরজা দিয়ে বাইরে বের করে দিয়ে বলল, তুই অনিমার কাছে চলে যা।

শ্রেয়সী অনিলাকে সামনে দাঁড় করিয়ে বলল, এই তো অমিয়া।

অবাঙালী যুবক অনিলার দিকে তাকিয়ে বলল, এ নয়।

শ্রেয়সী বলল, কেউ আপনাদের মিথ্যে পরিচয় দিয়েছে। এখানে অন্য কোন অমিয়া থাকে না।

পুলিস শুনতে রাজি নয়।

দারোগা বলল, তল্লাসী নেব।

নিন। তবে আপনারা মিথ্যে হয়রান করছেন।

আপনার এই মেয়ে কি চৌরঙ্গী পাড়ায় ঘোরাফেরা করে?

না। কলেজে পড়ছে, বাইরে বের হবার সময় কোথায়। সামনে পরীক্ষা।

কিন্তু কেমন যেন ধাঁধা মনে হচ্ছে। অমিয়া হল কল গার্ল। এই গুজরাটি ভদ্রলোককে মদ খাইয়ে বেহুঁশ করে ব্যাগে যা ছিল তা তো নিয়েছে উপরন্তু এর গলায় একটা সোনার চেন ছিল সেটাও নিয়েছে। আমরা তদন্ত করে আরও ঘটনার কথা জেনেছি। সবাই তো পুলিসে খবর দেয় না, মানসম্মানের ভয়ে ক্ষতি স্বীকার করে। অমিয়া শুধু নয়, এদের একটা দল আছে যারা শাঁসালো লোককে কব্জা করে তাদের সর্বস্ব হাতিয়ে নেয়। যাক ওসব কথা। তবে আমরা ফিরে গেলেও সন্দেহ থেকে যাচ্ছে। মনে হয় কোথাও কোন ছলনা থেকেই গেছে, ওটাই আমরা আবিষ্কার করব।

শ্রেয়সী যে ভাবে অমিয়ার উপস্থিতি অস্বীকার করল তাতে সায়নী বিশেষ ভীত হয়ে পড়েছিল। পুলিস চলে গেলে অমরকে চুপিচুপি বলল, মা এটা কেন করলেন? একদিন না একদিন সেজদি তো পুলিসের হাতে ধরা পড়তে পারে। তখন ঘটনাটা অন্য রকম হতে পারে।

অমরও বিষণ্ণভাবে বলল, উপায় ছিল না সায়নী। অমিয়া খুবই নীচে নেমে গেছে, বাবাকে গোছা গোছা টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করে রেখেছে। মা তাকে বাধা দিয়েছে বারবার। বাধা দেবার বিনিময়ে পেয়েছে প্রচুর অপমান। আমরা জানলাম শুনলাম। তাকে সৎপথে ফিরিয়ে আনতে হলে এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা কি হতে পারে বল। পুলিসের হাতে তুলে দিলে খুব ভাল হত কি? বরং সংশোধনের পথ খুলে রাখতে মা এই কপট যুক্তির ও মিথ্যের আশ্রয় নিয়েছে।

সেজদির পক্ষে কলকতায় থাকা নিরাপদ নয়। কোন সময় এই সব বিপদচারীদের হাতে তার প্রাণও যেতে পারে। পুলিস মাঝে মাঝেই হামলা করবে।

অমর হেসে বলল, পুলিসের হামলা এ-বাড়িতে নতুন নয়। মা আগাগোড়া সামলেছে, এদেরও সামলাবে।

পুলিসের খপ্পর থেকে অমিয়াকে বাঁচাবার চিন্তা সবাইয়ের।

॥ আট ॥

অমিয়ার পরিণতি তখনও অজানা। এই কাহিনী শুনিয়ে মন্দাকিনী বলল, এবার তো বিশ্বাস হল। শ্রেয়সী আমার তোমার মত সংসার চেয়েছিল। সংসার গড়ে তুলতে প্রয়োজন স্বামী-স্ত্রীর বোঝাপড়া, পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও অটুট আস্থা। এর কোন কিছুই শ্রেয়সী পায়নি। ছেলেমেয়েদের মুখের দিকে তাকিয়ে লাঞ্ছিত অবমানিত মা সুখের আশা করে। সেটাও সার্থক হয়নি। একটা না একটা হাঙ্গামা এসে সব কিছুই ওলটপালট করে দিয়েছে। একটা পরিবার গড়ে ওঠে বংশগত ধারায়, রক্তের মহত্ত্বে আর সুশৃঙ্খল পরিবেশে। এর কোনটাই শ্রেয়সীকে সাহায্য করেনি। তার কোন আশাটাই পূর্ণ হয়নি।

বললাম, মোটামুটি সময়ের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

তা বটে। তবে সায়নীর প্রভাবে অমরের পরিবর্তন ঘটছে। সায়নী আর অমর কতকাল বিশ্বাস নিয়ে বোঝাপড়া করে চলতে পারবে তাও বলা কঠিন। ওদের রক্তে বিষ। বিষধর সর্প বিবরে আছে, যে কোন সময়ে মাথা তুলে দংশন করতে পারে। আমরা চাই অমর সায়নীর জীবনধারা এই পরিবারের পক্ষে আদর্শ হোক। ওরা সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করুক। আরও একজনের কথা এত ঘটনার মধ্যে চাপা পড়ে গেছে। শ্রেয়সীর ভাই বিজয় তো নোংরা ঘটনার তলায় চাপা পড়ে গেছে। মাথা তুলতে পারেনি। কিন্তু শ্রেয়সী সমাচার বিজয়কে বাদ দিয়ে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

কিন্তু বিজয় গেল কোথায়?

সেটাই তো বলব। দিগম্বর উকিলের উইল অনুসারে বিজয়ের সবকিছু দায়িত্ব ছিল শ্রেয়সীর। শ্রেয়সী চেষ্টার কোন ত্রুটি করেনি। বাস্তবত যতীন হল সংসারের কর্তা। শ্রেয়সী সামান্য প্রতিবাদ যদি করত যতীনের কাছে তা হলে সে অমানুষিক প্রহার করত শ্রেয়সীকে। বিজয় ছোটবেলা থেকে এই অনাচার দেখেছে। সাহস করে কিছু বলতে পারেনি। বিজয় বড় হতেই বাড়ির চাকরের সব কাজগুলো করতে হত তাকে। মাঝে মাঝে বিজয়কে পা টিপতে বলত যতীন। শ্রেয়সী মৃদু প্রতিবাদে তাকে অকথ্যভাষায় গালাগালি করত।

তারপর?

মৃদু প্রতিবাদ ধীরে ধীরে গুরুতর অত্যাচারে পরিণত হতে থাকে। শ্রেয়সীকে অমানুষিক প্রহার করেই ক্ষান্ত হত না, বিজয় যদি মুখে মুখে জবাব দিত তা হলে তাকেও বেদম প্রহার করত এবং অশ্রাব্যভাষায় গালাগালি করত। বিশেষ করে

নিভাননীর বিষয়ে উত্থাপন করে বিজয়কে একথায় সেকথায় খানকির বাচ্চা মধুর শব্দে আপ্যায়ন করত।

বিজয় স্কুল যাওয়া বন্ধ করল।

যতীনের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সব সময় বাইরে বাইরে থাকতে চেষ্টা করত। খাবার সময় চুপিচুপি দিদির কাছে এসে খেয়েদেয়ে আবার বেরিয়ে যেত। বিজয় যে চুপিচুপি আসে এই খবরটা তার শিশুকন্যার মুখে শুনে যতীন যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল।

শ্রেয়সী বিজয়ের হাতে চিঠি দিয়ে তার বাবার বন্ধু অ্যাটর্নি দত্তসাহেবের কাছে পাঠাল। দত্তসাহেব সব শুনে একদিন নিজেই সশরীরে এসে যতীনকে ধমকে দিয়ে গেল। বলে গেল, শ্রেয়সী ও বিজয় কারও অন্নদাস নয়। ওদের বাবা যা করে গেছে তা ওদের পক্ষে যথেষ্ট। এরা ইচ্ছে করলে এই বাড়ি থেকে সবাইকে তাড়িয়ে দিতে পারে।

এই ধমকানি কিন্তু নিষ্ফল হল। বরং অত্যাচার বৃদ্ধি পেল।

বিজয় চুপিচুপি বলল, দিদি, আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আমি একটা চাকরি পেয়েছি।

কোথায়?

বোম্বেতে।

কিসের চাকরি?

নৌবাহিনীতে কাজ পেয়েছি। বোম্বের মাজগাঁও ডকে ট্রেনিং-এ যেতে হবে। রেলের টিকিট সরকার দিয়েছে, সাতদিনের মধ্যেই কাজে যোগ দিতে হবে।

শ্রেয়সী হ্যাঁ-না কিছুই বলল না। বিজয়ের যাবার ব্যবস্থা করে তার হাতে ব্যাঙ্কের পাসবই তুলে দিয়ে বলল, এটা তোর পাসবই। আগে তো কিছু টাকা তোর নামে জমা দিয়েছি। আরও কিছু টাকা তোর নামে জমা করে দিলাম। আমি বেঁচে থাকতে থাকতে তোর হিস্যা আলাদা করে দেব, দত্তসাহেবকে বলেছি যা হয় উনি করবেন। বর্তমানে নগদ কিছু টাকা জমা রইল। বিপদের সময় এই টাকাই তোকে সাহায্য করবে। আমরা খুবই দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মেছি রে ভাই। কত পাপ করলে যে এমন অবস্থার দাসত্ব করতে হয় স্বয়ং ভগবানও বোধহয় জানেন না। ছোট কাজ হোক বড় কাজ হোক নিজের চলার মত কাজ যখন পেয়েছিস তখন তোর জন্য আর চিন্তা করব না। ভালভাবে থাকিস। তুই তো মুক্তি পেলি। কিন্তু আমি? যাক ওসব কথা। বিশেষ দরকার না হলে আমাকে চিঠি দিস না। বছরে

একবার তোর ঠিকানা জানিয়ে দিলেই যথেষ্ট। সর্বদা তোর মঙ্গল কামনা করব। তোকে নিজের সন্তানের মত বড় করব ভেবেছিলাম, তা আর হল না। আমার মত অবস্থা যেন আমার মহাশত্রুরও না হয়।

শ্রেয়সীকে প্রণাম করে সবার অজ্ঞাতে বিজয় বেরিয়ে পড়ল বোম্বাইয়ের পথে। একবার মাত্র পাসবইয়ে জমার অঙ্কটা দেখে নিল।

তারপর বহু বছর কেটে গেছে। শ্রেয়সীর দুই মেয়ে অসীমা ও অনিমা বিজয়কে ছোটবেলায় দেখলেও তাকে ভুলে গেছে। তাদের যে নিজের একটা মামা আছে তাও ভুলে গেছে। শ্রেয়সী কোন সময়ই বিজয়ের নামও উচারণ করত না। বিজয় যে বাড়ির অর্ধাংশের মালিক তাও কাউকে বলত না।

এরপর বহু বছর কেটে গেছে। শ্রেয়সী বিজয়কে কিন্তু ভুলতে পারেনি। সব সময়ই বিজয়ের জন্যও তার ছিল দুশ্চিন্তা। বছরশেষে অধীর আগ্রহে তাকিয়ে থাকত পিওনের দিকে। বিজয় কোন চিঠি দিলে তা পড়ে তার ট্রাঙ্কের তলায় সযত্নে রেখে দিত। বিজয়ের অংশ ও তার প্রাপ্যের হিসাব রাখত। দত্তসাহেবের কোম্পানী দত্তসাহেবের মৃত্যুর পূর্বে সব কিছু পাকা করে গিয়েছিল। বিজয়ের চিঠি এসেছিল বহু বছর পর কোচিন থেকে।

বিজয়ের চিঠিখানা হাতে করে শ্রেয়সী গিয়েছিল মন্দাকিনীর কাছে।

চিঠি পড়ে মন্দাকিনী বলল, কি করবি শ্রেয় ?

সেই পরামর্শ করতেই তো এসেছি দিদি। ছোটবেলায় বিজয়কে বলতাম, আমাদের মা মরে গেছে। তোমার ভাই কিন্তু সব সময়ই তাকে জানিয়ে দিত আমাদের মা ভ্রষ্টা, বিপথগামিনী ও জীবিত। নৌসেনাতে কাজ করে যখনই ছুটি পেয়েছে তখনই বিজয় গোপনে কলকাতায় এসেছে, তন্নতন্ন করে মাকে খুঁজেছে। কলকাতার মত শহরে মাকে খুঁজে পায়নি। মায়ের চেহারাও তার মনে নেই, দেখলেও চিনতে পারবে না। আন্দাজে পথে পথে ঘুরে কলকাতার হাজার হাজার নিভাননীর মাঝ থেকে তার মাকে খুঁজে বের করা অসম্ভব। তবুও সে এসেছে। মাকে খুঁজেছে। কিন্তু আমার কাছে আসেনি। হয়ত দূর থেকে আমার বাড়ির খবরাখবর নিয়েছে। বিশ বছর পর বিজয় জানতে চেয়েছে মায়ের খবর। কি যে করি ভেবে পাচ্ছি না।

তোমার বিশ্বাস আজও তোমার মা জীবিত আছেন ?

অবিশ্বাস করার মত কোন ঘটনা তো ঘটেনি দিদি। প্রকাশ সরকারের ঠিকানা বোধহয় আপনার ভাই জানে তবে কখনও ঠিকানা বলেনি। আমাকে যে ভাষায়

গালাগালি করে সে ভাষা শুনলে মায়ের ঠিকানা জানার ইচ্ছেটা আপনা থেকেই লোপ পায়। আর মার খবর নিয়ে হবেই বা কি। পেটে ধরে মা হলে তো মায়ের ধর্ম পালন হয় না। আর মা এসে তো আমার সুখদুঃখের ভাগ নেবে না। আমার সঙ্গে ঘরও করবে না। কিন্তু আমার ছেলেমেয়েদের নিয়ে তো বাস করতেই হবে। সব সহ্য করেছি। এটুকুও সহ্য করতে পারব।

মন্দাকিনী ভেবে পেল না এসব পারিবারিক বিষয়ে কি বলবে। শ্রেয়সীকে কাঁদতে দেখে বলল, তোর দাদাবাবু বাইরে গেছে। ফিরে এলে তার সঙ্গে পরামর্শ করে এ বিষয়ে আলোচনা করব। সে হয়ত কিছু বাতলে দিতে পারবে। কেঁদে লাভ নেই। চোখ মুছে বস। মানুষের দশদশা লোকে বলে, এটাও তাই।

আমার যে হাজারো দশা। অমরটা কিছু সংযত হয়েছে। অমিয়া একেবারে নরকে নেমে গেছে। অনিমা শক্ত মেয়ে। সে তার শশুরের অবর্তমানে পঙ্গু স্বামীকে নিয়ে স্বচ্ছন্দে সংসার করছে। তাকে আপনার ভাইও ভয় করে। অসীমা সেই যে গেছে বাবার আদর পেয়ে আর এমুখো হয়নি। এখন ভরসা অমল আর অনিলা। কিন্তু তারা এখনও লায়েক হয়নি। অসীমা বিজয়ার পর একটা চিঠি দিয়ে শুধু জানিয়ে দেয় তারা জীবিত আছে ও ভাল আছে। তার ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে জেনেশুনে বিনয় তাদের মামারবাড়ির পরিবেশে পাঠাতে চায় না। অমল আর অনিলার কথা তো বললাম। আমি কি করব!

ব্যর্থতায় জীর্ণহৃদয় শ্রেয়সী কথা বলতে বলতে আবার ফুঁপিয়ে উঠল। মন্দাকিনী প্রবোধ দেবার ভাষা খুঁজে পেল না। শেষে বলল, চল শ্রেয়, তোকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।

আমার প্রেসারটা বেড়েছে। একবার ডাক্তারের কাছে যাব প্রেসারটা মাপতে।

তাই চল। তোকে ডাক্তারখানাতেই নিয়ে যাই। বাইরে বের হলে তোর মনটাও ভাল হবে।

শ্রেয়সীকে ডাক্তারখানায় পৌঁছে দিয়ে মন্দাকিনী ফিরে এল।

ডাক্তারখানা থেকে শ্রেয়সী সোজা গেল তার বাড়িতে। সদর পেরোতেই শোনা গেল অনিমা আর অমিয়ার চিৎকার। দুই বোন তখন প্রতিযোগিতামূলক ভাবে গলায় মাইক লাগিয়েছে।

বাইরে থেকে মেয়েদের গলার শব্দ শুনে শ্রেয়সী জোরে পা ফেলে দোতলায় উঠল।

হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল, একি হচ্ছে? পাড়ার লোকেরাও তো তোদের

জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠেছে। তোরা থামবি কি না?

অমিয়া এগিয়ে এসে বলল, মেজদি আমাকে যাতা বলেছে।

অনিমা প্রতিবাদ করে বলল, না মা, অমিয়া আমাকে যা বলেছে তাতে এ বাড়িতে আমার আর আসা চলবে না।

কে কি বলেছে তা শোনার দরকার নেই। তোরা চুপ কর। দরকার হলে পরে সব শুনব। তোরাই আমাকে মেরে ফেলবি। আমি মরলে বুঝবি।

অমিয়া গজগজ করতে করতে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

অনিমা নীচে নামতে নামতে বলল, অমিয়া যদি এরকম অশালীন কথা বলে তা হলে আর আসব না মা।

বিকেলে অমর এসে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ শুনেও কোন মন্তব্য করল না। সায়নীও অফিস থেকে এসে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ শুনেছিল অনিমার কাছে। সেও কোন আলোচনা করল না। সবাই যেন মুখে কুলুপ বন্ধ করে রয়েছে।

রাতের বেলায় অমর সায়নীকে জিজ্ঞেস করল, কিছু শুনেছ?

কিছু কিছু শুনেছি, ও শুনে কাজ নেই। মেয়েলী ঝগড়ায় কান দিতে হয় না।

মেজদি তো খুব চাপা মেয়ে, সহজে ঝগড়া করে না। নিশ্চয়ই অমিয়া এমন কিছু বলেছিল যার জন্য ঝগড়া। আর ভালো লাগে না। আমি একটা বাসা ঠিক করেছি ওখানেই চলে যাব মনে করেছি।

যাওয়া উচিত। গম্ভীরভাবে বলল সায়নী, তার পরেই বলল, কিন্তু যেতে পারব না। আমরা চলে গেলে মা খুবই অসহায় অবস্থায় পড়বে। অনিলার ফাইন্যাল ইয়ার। তার পড়াশোনা নষ্ট হবে। ঠাকুরপো কাজ খুঁজছে। তাকে সাহায্য করা দরকার। এখনও তোমার বাপ তোমাকে কিছুটা সমীহ করে, আমরা না থাকলে আরও অনাসৃষ্টি হবে। অন্তত অসংযত অবস্থায় উঠে উপরতলায় কখনও আসেন না। এই অবস্থায় আমাদের যাওয়া উচিত হবে না।

কিন্তু!

কিন্তু নেই। সেজদি বাণ্টুদাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করেছিল। মেজদি সহ্য করবে কেন? বাণ্টুদার মত পঙ্গুলোকের কি করে সন্তান হয় তাই জানতে চেয়েছিল সেজদি। অতি নোংরা কথা। উত্তরে মেজদি বলেছে তোর ছেলের তো বাপের ঠিক নেই। আমি তো স্বামীর ঘর করি। আমার স্বামী পঙ্গু তাও সে আমার ছেলের বাবা।

অমর সায়নীর মুখ চেপে ধরে বলল, চুপ। আর শুনতে চাই না।

সায়নী হাত সরিয়ে দিয়ে বলল, এসব কুকথা ভদ্রসমাজে অচল। তুমিও যেমন পছন্দ কর না, আমিও করি না। কিন্তু তোমাদের পরিবারে এসে বুঝেছি, এই পরিবারকে বাঁচাতে হলে আমাদের এখানে থাকা দরকার। আমাদের সহযোগিতায় কারও কোন উপকার হোক অথবা নাই হোক, অন্তত মা তো বাঁচবে।

অমর চুপ করে শুনছিল।

কথা বলছ না কেন ?

আমিও ভাল ছেলে ছিলাম না সায়নী। আমার জন্য মাকে যথেষ্ট কষ্ট ও লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে। প্রতিদানে সামান্য সেবা করার সুযোগও পাইনি। তুমি আসার পর ভাগ্যের চাকা ঘুরছে, এবার চেষ্টা করছি ভাল হয়ে চলতে আর মায়ের দুঃখ লাঘব করতে। অমিয়া বাড়িতে শান্তি ফিরিয়ে আনতে দেবে না। শেষ পর্যন্ত কি হবে তা বলা কঠিন। অমিয়ার হাতে টাকা আছে। বাবা সেই টাকার অংশীদার অর্থাৎ পাপের পয়সা বাবা ভোগ করছে তাই হিতাহিতজ্ঞান হারিয়েছে। অমিয়াকে সব সময় প্রশ্রয় দিয়ে আসছে। অমলও বড় হয়েছে, অনিমাও ছোট নেই। এর প্রতিক্রিয়া তাদের ওপর কি হবে তাই ভাবছি।

আর ভেবে কাজ নেই। ঠাকুরপো আর অনিমা আমার অনুগত। সামলাবো আমি। এখন শুয়ে পড়। আবার সকালে তো মেশিনের মতো খাটতে হবে।

নিভাননীর খবর নিয়ে অমর আর সায়নী ফিরে এসে কাউকেই কোন কথা বলেনি। সংসারের কাজ ও চাকরি করে সায়নী ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ঘুমোলে তার ঘুম ভাঙানো কঠিন হয়।

সকালবেলায় বাজার করে এসে অমর দেখল সায়নী তখনও ঘুমোচ্ছে। প্রতিদিন সায়নী আকাশ পরিষ্কার হওয়া মাত্র বিছানা ছেড়ে উঠে রান্নাঘরে যায়। আজ শ্রেয়সী রান্নাঘরে। সায়নী তখনও ঘুমোচ্ছে। এও এক অভিনব ঘটনা।

অমরের ডাকে সায়নী উঠে চোখ মুছতে মুছতে লজ্জায় যেন ভেঙে পড়ল। বলল, অনেক বেলা হয়ে গেছে। কি লজ্জা ! মা বোধ হয় রান্নাঘরে।

সায়নী আর দাঁড়াল না।

শ্রেয়সী রান্নাঘরে ঢুকতেই বলল, তোমার শরীর বুঝি ভাল নেই বউমা।

একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। আপনি উঠুন। এখন আমি সামলাবো।

আবার অফিসের তাড়া।

সায়নীকে আগে রওনা হতে হয়। অমর দেরি করেই বের হয়। তবে দুজনে ফিরে আসে একই সময়ে। সেদিন অফিস থেকে সায়নী সোজা বাড়ি ফিরে কাপড়-

জামা ছেড়ে রান্নাঘরের কাজ শেষ করে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছিল, অমর অফিস থেকে বেরিয়ে বাজার করতে গেছে।

শ্রেয়সীর ডাকে সায়নী গেল সবাইয়ের থাওয়াদাওয়া মেটাতে। অমর তখনও ফেরেনি। চুপ করে শুয়ে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ গায়ে ধাক্কা লাগতেই ধড়মড় করে উঠে বসে অবাক হয়ে অমরের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, এত দেরি হল ?

এই তো সবে সাড়ে দশটা। খুব বেশী রাত কি। তুমি খেয়েছ ?

তুমি ফেরনি আমি খেতে বসব কি করে।

মা খেয়েছে ?

সবাই খেয়েছে। আমি আর তুমি বাকি।

খেতে বসে অমর বলল, দিদিমার কথা মাকে কিছু বলনি তো ?

আমি বলব কেন ? মা তোমার। যা বলার তুমিই বলবে। অনাধিকারচর্চা আমি করি না।

তা বটে। আমিই বলব। তবে আরেকটু ভেবেচিন্তে। মায়ের শরীর ও মন দুটো যখন ভাল থাকবে তখনই বলব। নইলে নয়। হিতে বিপরীত হতে পারে।

ঠিক বলেছ, মায়ের শরীর ও মন যাচাই না করে দিদিমার খবর দেওয়া ঠিক হবে না।

ওরা কেউই শেষ পর্যন্ত শ্রেয়সীকে বলতে পারেনি নিভাননীর খবর।

কয়েক দিন পরের ঘটনা।

তখনও পুরোপুরি সন্ধ্যার অন্ধকার নামেনি। কোন কোন গৃহস্থ বাড়ি থেকে সন্ধ্যার শাঁখের শব্দ ভেসে আসছে। শ্রেয়সী বসে বসে পুরনো একটা খবরের কাগজ উল্টেপাল্টে দেখছিল, সায়নী অফিস থেকে ফিরেই বাথরুমে ঢুকেছে। বিকেলবেলায় ছাদ থেকে শুকানো কাপড় একগাদা নিয়ে অনিলা নীচে নামছিল এমন সময় ইন্দ্রনীলের হাত ধরে অমিয়া এসে দাঁড়াল শ্রেয়সীর সামনে।

বিনা দ্বিধায় সহজ গলায় অমিয়া বলল, ইন্দ্রনীলকে বিয়ে করব। ইন্দ্রনীল রাজি। আমরা এসেছি তোমার সম্মতি নিতে।

শ্রেয়সী মুখ না তুলেই বলল, দুজনেই যখন রাজি তখন আমার সম্মতি দরকার হবে কি।

তবুও বলতে হয়।

শ্রেয়সী মৃদু হেসে বলল, সব সময় এটা বোধহয় মনে থাকে না। যাই হোক,

তোর বাবাকে বলেছিস কি ?

যতটা বলার তা বলেছি।

শ্রেয়সী ইন্দ্রনীলকে জিজ্ঞেস করল, তুমি তো শোভাবাজারে থাক ?

না। বাগবাজারে।

কাজকর্ম নিশ্চয়ই কিছু করছ ?

পাকাপোক্ত নয়। কমিশনে মাল সাপ্লাই করি। রোজগার মন্দ নয়।

শ্রেয়সী গম্ভীরভাবে বলল, ভাল। তুমি আমার মেয়ে অমিয়াকে তো ভাল করে জান ?

মোটামুটি জেনেছি।

জানা দরকার। পরে গোপন কথা ফাঁস হলে অশান্তি হয়। অমিয়ার একটা ছেলে আছে তা জান ?

জানি।

এই ছেলেকে নিজের ছেলের মত বড় করতে পারবে তো ?

ছেলেটা তো আপনার কাছেই থাকে। তাই থাকবে। মাসে মাসে তার জন্য টাকা দেব। আপনিই তাকে বড় করবেন। পরের ছেলে ঘরে নিলে সংসারে অনেক ঝামেলা। ছেলেটা অমিয়ার, আমার তো নয়। ছেলের অযত্ন হলে অমিয়া নিশ্চয়ই খুশী হবে না। এতে অশান্তি সৃষ্টি হবে। বউটা আমার হলেও তার ছেলেটা আমার হবে না। পরের ছেলের হ্যাঁপা অনেক। তার চেয়ে আপনি তাকে বড় করেছেন। আপনিই পারবেন মানুষ করতে।

এটা কি তোমাদের দুজনেরই অভিমত !

অবশ্যই।

কিন্তু রাতের বেলায় ছেলে মাকে খোঁজে। মাকে কাছে না পেলে কেঁদে ওঠে। তাই ভাবছি ছেলে যদি মাকে ছাড়তে না চায় তখন কি হবে ?

যাতে তোমার কাছে থাকে সে ব্যবস্থা আমি করব,—বলেই অমিয়া ফিরে দাঁড়াল।

আমার বয়স হয়েছে, আমার পক্ষে কি ছেলে সামলানো সম্ভব। দেখি কি হয়। বিয়ের দিন ঠিক করেছিস ?

এখনও ঠিক করিনি। নোটিস দিয়েছি। আরও দশ পনেরদিন অপেক্ষা করতে হবে।

তোর বাবাকে বলেছিস ?

বাবাকে বলেই নোটিস দিয়েছি।

শ্রেয়সী আর কোন প্রশ্ন করল না, তাদের বিষয়ে আগ্রহ দেখাল না।

অমিয়া ইন্দ্রনীলের হাত ধরে টানতে টানতে নিজের ঘরে নিয়ে গেল।

সায়নীও শুনেছিল অমিয়ার বিয়ের কথা।

রাতের বেলায় খবরটা দিতেই অমর গম্ভীর হয়ে গেল।

কি ভাবছ?

এই রকম হঠকারিতা একবার করেও অমিয়ার আক্কেল হয়নি। তবে এবার কাগজেকলমে বিয়ে হলে হঠাৎ কিছু হবে না। তবে বিয়ের বাঁধন কতদিন থাকে সেটাই ভাববার বিষয়। শেষ পর্যন্ত এই ভাব-ভালবাসা কতটা পোক্ত হয় তাই দেখতে অপেক্ষা করতে হবে ধৈর্য ধরে।

অমিয়ার বিয়ের কাগজে সই করল যতীন আর ইন্দ্রনীলের দুজন বন্ধু। বিবাহ-বন্ধন অফিস থেকে বেরিয়েই দুজনে বন্ধুদের সঙ্গে গেল দক্ষিণেশ্বরে পূজো দিতে। সে রাতটা তারা কাটাল একটা অভিজাত হোটেলে।

রাতের বেলায় অমিয়ার ছেলে শ্রেয়সীর গলা জড়িয়ে ধরে বলল, দিদু, মা কোথায়? মা আসছে না কেন?

শিশুর এই আকুতির কোন উত্তর দিতে পারেনি। শিশুর আবেদন তার মেদ মাংস ভেদ করে বক্ষপঞ্জরে পুরনো কথা ভাবতে ভাবতে এলিয়ে পড়ছিল। নিভাননী মা, শ্রেয়সীও মা, অমিয়াও মা। চরিত্রগত পার্থক্য যে কত তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করল শ্রেয়সী। মা হয়েও নিভাননী তার সন্তানদের কথা একবারও ভাবেনি, অথচ শ্রেয়সী তার সন্তানদের জন্য! সন্তানদের বড় করতে কত ত্যাগ, লাঞ্ছনা, অমর্যাদা স্বীকার করেছে। আবার অমিয়া বারেকের জন্য তার সন্তানের প্রতি সামান্যতম সহানুভূতিও জানাল না। তিনটি মায়ের বিভিন্ন ছবি শ্রেয়সীর মনে আলোড়ন সৃষ্টি করছিল। অসীম ব্যথায় সে যেন ভেঙে পড়ছিল। অমিয়ার সন্তান পিতৃপরিচয়হীন। কিন্তু ভুঁইফোড় তো নয়। যে ক্ষেত্রে পিতা তার পিতৃত্ব অস্বীকার করে সেখানে কি মাতার পরিচয়ই যথেষ্ট নয়!

শ্রেয়সী ডুবে গেল গভীর চিন্তায়। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল তার বাবার করুণ মুখের চেহারা। কিন্তু প্রতিবাদ জানায়নি, প্রতিরোধ করেনি, প্রতি-হিংসার বশবর্তী হয়ে কোন দুর্ঘটনাও ঘটায়নি। শ্রেয়সী নিজে মেয়ে হয়েও তার মায়ের ছলনাকে বুঝতে পারেনি। তার মায়ের ইচ্ছাতেই যতীনের সঙ্গে তার বিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল তার বাবা। কিন্তু দূরদর্শী দিগম্বর উকিল ভবিষ্যৎ চিন্তা করেই

তার সম্পদ দিয়ে গিয়েছিল শ্রেয়সী, পুত্র বিজয়কে বড় করার ভারও দিয়েছিল তাকে। কিন্তু মা! আর ভাবতে পারে না শ্রেয়সী।

নিজের সন্তানের জন্য যাদের সামান্যতম মমতাবোধ থাকে না তারা ব্যতিক্রম। স্বাভাবিক জীবনের সঙ্গে তাদের তুলনা করা মূর্খতা। রুদ্ধ আবেগে অমিয়ার ছেলেকে বুকের সঙ্গে জাপটে ধরে ফুঁপিয়ে উঠল।

তিনদিন পর সন্ধ্যাবেলায় অমিয়া আর ইন্দ্রনীল এল শ্রেয়সীর সঙ্গে দেখা করতে। শ্রেয়সীকে প্রণাম করতেই শ্রেয়সী কয়েক পা পিছিয়ে গেল। উভয়ের গা থেকে উগ্র মদের গন্ধে চারপাশ ম-ম করে উঠেছিল।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে শ্রেয়সী অমিয়াকে বলল, যা চেয়েছিস তা পেয়েছিস তো! এবার নিজেরা সংসার কর। সুখে শান্তিতে থাকিস।

সায়নী রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল। অবস্থাটা লক্ষ্য করে বলল, ঠাকুরজামাই, তোমরা পাশের ঘরে গিয়ে বস। আজ মায়ের শরীর মোটেই ভাল নয়।

ইন্দ্রনীল ইঙ্গিতটা বুঝতে না পারলেও অমিয়া বুঝেছিল। সে ইন্দ্রনীলের হাত ধরে টেনে পাশের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

অমর এসব বিষয়ে সহজে নজর দেয় না। সায়নী কোন কিছু উত্থাপন করলে তাতে সায় দেয় কিম্বা আলোচনা করে। আজ অমিয়ার কাণ্ড দেখে আর স্থির থাকতে পারেনি। বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। সায়নী কোন রকমে তাকে শান্ত করে ঘরে আটকে রেখেছিল। নইলে মারপিট দাঙ্গাও হতে পারত।

পরের দিন অমর আর সায়নী কাজে বের হবার আগে পাশাপাশি খেতে বসেছে। শ্রেয়সী পরিবেশন করছিল। খেতে খেতে হঠাৎ মুখ তুলে অমর বলল, শুনলাম তোমার মা এখনও জীবিত আছে। এটা কি ঠিক?

নিমেষে শ্রেয়সীর মুখ সাদা হয়ে গেল। কোন উত্তর দিতে পারল না।

আমার কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন?

সায়নী বাধা দিয়ে বলল, এটা না জানলে তোমার কোন্ মহাভারত অশুদ্ধ হবে বলতে পার! ওর কথার জবাব দেবেন না মা। এ রকম উদ্ভট প্রশ্ন কোন ছেলে মাকে করে না।

শ্রেয়সী নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়ে বলল, করে বউমা। মায়ের কাছেই ছেলেরা অনেক কিছু জানতে চায়। এতে দোষ কি? শোন খোকা, আমার মা জীবিত আছেন। তবে পরিচয় দেবার মত কিছু রেখে যাননি। সব কথা তো বলা

যায় না। তাই আমাদের কাছে তিনি মৃত।

অমর কিছুক্ষণ এক মনে খেতে থাকে।

আবার বলল, দিদিমার কাছে গিয়েছিলাম।

অবাক হয়ে গেল শ্রেয়সী। তার হৃদপিণ্ডের গতিবেগ বৃদ্ধি পেল। মনের ব্যথা ফুটে উঠল তার চেহারায়। সায়নী বুঝতে পারল শ্রেয়সী অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তাড়াতাড়ি খাওয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তুমি থাম, দেখছ তো মা কেমন করছেন।

সায়নী এঁটো হাতেই শ্রেয়সীকে জাপটে ধরে ভিতরে নিয়ে গেল।

অমরও ভয় পেয়ে গেল।

হঠাৎ এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করাটা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ যে হয়নি তা অমর বুঝল। আরও বুঝল এ থেকে গুরুতর পরিণতিও হতে পারে। একেই অমিয়ার আচার-আচরণে শ্রেয়সী মানসিক ভাবে খুবই বিপর্যস্ত তার ওপর নিভাননী প্রসঙ্গ এই বিপর্যয়কে দ্বিগুণ করে তুলবে। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

অমর সোজা গিয়ে মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে বলল, আমার অন্যায় হয়েছে। ক্ষমা কর মা।

শ্রেয়সী চোখ বুজে শুয়েছিল। কোন কথা না বলে হাত নেড়ে তাকে যেতে বলল। সায়নীকে মৃদুকণ্ঠে বলল, হঠাৎ কেমন অস্থির হয়ে পড়ি। ভয়ের কিছু নেই। তোমরা অফিসে যাও।

আপনাকে এই অবস্থায় রেখে কি করে যাই।

বললাম তো কোন ভয় নেই। অনিমাকে ডেকে দিয়ে যাও। দরকার হলে সে-ই সব করতে পারে। অমলও শীগগিরই ফিরে আসবে। তোমরা অফিস যাও।

আপনার ছেলেকে অফিসে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমি যাব না। ছুটি নেব।

হঠাৎ এক কাপড়ে অমিয়া এসে হাজির। গায়ে যা কিছু গয়না ছিল তার একটাও নেই। কপালে সদ্য কাটা ক্ষত ব্যাণ্ডেজ দিয়ে ঢাকা। এসেই জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল।

কান্নার শব্দ শুনে সায়নী ছুটে এল।

ব্যাপার জানতে কারও বাকি রইল না। হিসাব করে দেখল তিন মাসও অমিয়া ইন্দ্রনীলের সঙ্গে ঘর করতে পারেনি।

তিন মাসের মধ্যেই অমিয়া ঐশী জ্ঞান লাভ করেছে। ইন্দ্রনীল ধীরে ধীরে তার গয়নাগুলো হাতিয়ে নিয়ে মদে আর জুয়ায় শেষ করতেই অমিয়া সজাগ হয়েছিল

তবুও তার মোহ ভঙ্গ হয়নি। যখন টাকার জন্য চাপ দিতে থাকে তখনই বুঝতে পারল তার ভুল। তার কাছে যা ছিল তা দেবার পর নিঃস্ব হতেই ইন্দ্রনীল চাপ দিতে থাকে শ্রেয়সীর কাছ থেকে টাকা আদায় করে আনতে। অমিয়া কিছুতেই যখন রাজি হল না তখন আগের রাতে প্রচণ্ড প্রহার করে অমিয়াকে ঘর থেকে বের করে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল।

শ্রেয়সী সব শুনে পাথরের মত শক্ত হয়ে বসে রইল।

তারপর ?

এবার পুলিসের হাতে পড়বে। আমি থানা আর হাসপাতাল হয়ে আসছি। বদমাইশটা আফিং আর হেরোইনের চোরা ব্যবসা করে। এবার ধরা পড়বেই।

পরের দিন অনিমা এসেছিল। সে-ও সব শুনে হতবাক্। অমিয়াকে বলল, সবাই ভুল করে, তুই তো ভুলের পর ভুল করে চলেছিস। এবার একটু সামলে চল। এত দিন তো বাণ্টুর নিন্দায় পঞ্চমুখ ছিলি। এখন কি ইন্দ্রনীলের জয়গান করবি!

অমিয়া কোন উত্তর দিতে পারল না। নিজের ছেলেটাকে বুকের সঙ্গে জাপটে নিয়ে অনবরত আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে থাকে।

অমিয়ার জন্য দুঃখ অনুভব করল অমর কিন্তু সে ভীত হয়ে উঠল। যে কোন সময় বাড়িতে অশান্তি ডেকে আনতে পারে। সায়নীকে ডেকে বলল, তুমি ওদের কোন কথায় কথা বল না। আমরা যেমন চলছি তেমনই চলতে চাই।

এ বিষয়ে আমি খুবই সতর্ক। আজ রবিবার ছুটি আছে। সংসার গোছাবার দিন। কাজ করে সময় কি পাই অন্য কিছু চিন্তা করবার। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

অনিমার মন্তব্য হজম করার মত মেয়ে অমিয়া নয়। সাময়িক আঘাতে সে থমকে গেলেও কিছুক্ষণের মধ্যেই তার স্বরূপ প্রকাশ পেল। ওদের ঝগড়া তখন তুঙ্গে।

অমর ঘরে বসে শুনছিল কিন্তু ঝগড়া থামাবার কোন চেষ্টাই করল না। সায়নী ঘরে আসতেই বলল, আমরা কেউ ভাল নই। অবক্ষয়িত সমাজের করুণ ছবি যে কেউ আমাদের বাড়িতে এলে প্রত্যক্ষ করতে পারবে। কেন এটা হয় জান। আমরা আরও বেশি চাই। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ চায় উচ্চবিত্তের সমপর্যায়ে যেতে অথচ তাদের কোন পথ থাকে না অথবা যখন পথ খুঁজে পায় না তখন অসদাচারেই মেতে ওঠে।

শ্রেয়সী একগাদা কাপড় নিয়ে নীচের কলতলায় গিয়ে বসেছে। অমিয়া আর অনিমার ঝগড়া শুনে বার বার চিৎকার করে বলছে, ওরে তোরা থাম। কিন্তু কেউ-ই থামতে রাজি নয়। অবশেষে চিৎকার করে বলল ওরে তোরা থাম। আমার

শরীর ঝিমিয়ে আসছে, আর সহ্য করতে পারছি না। ওরে অনিমা, আমার ওষুধটা নিয়ে আয় শীগগির, ঘাড়টা কে যেন চেপে ধরছে।

অনিমা দৌড়ে কার্টুন শুদ্ধ ওষুধ নিয়ে এল।

শ্রেয়সী কটা বড়ি খেয়েছিল তা কেউ দেখেনি। ওষুধ খেয়েই শ্রেয়সী উঠে দাঁড়াল। কলতলায় কাপড়গুলো সেইভাবেই পড়ে রইল। শ্রেয়সী কোন রকমে সিঁড়িতে পা দেওয়া মাত্র টাল খেয়ে রেলিং-এ টলে পড়ল। পেছনে ছিল অনিমা। সে শ্রেয়সীকে জাপটে ধরে চিৎকার করে উঠল। সবাই ছুটল নীচে। কোন রকমে তাকে নিয়ে এসে শুইয়ে দিল বিছানায়। অমর ছুটল ডাক্তার ডাকতে। সব ব্যবস্থা করেও কোন কিছুই হল না। শ্রেয়সী গেল হাসপাতালে তখন তার আর জ্ঞান ছিল না।

এটাই শ্রেয়সীর শেষ যাত্রা। আর ফিরে আসেনি তার ঘরে।

॥ নয় ॥

আমাকে সঙ্গে করে মন্দাকিনী হাসপাতালে গেলেন। শ্রেয়সীকে দেখেই বুঝেছিলাম শ্রেয়সী আর ফিরবে না। মৃত্যু নিশ্চিত।

শ্রেয়সীর কত কথা জমা ছিল আমাকে বলার, কিছুই সে বলে যেতে পারেনি। তার কথা মোটামুটি মন্দাকিনীকে বলেছিল। সবই শুনেছিলাম মন্দাকিনীর কাছে। তাও একদিনে নয়। মাঝে মাঝে বলেছে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছে। শ্রেয়সী মারা যাবার পর তার একটি অনুরোধ বারবার মনে পড়েছে, দাদাবাবু আমাকে নিয়ে একটা গল্প লিখুন। একটা উপন্যাসও লিখতে পারেন। লিখতে পারিনি কিন্তু কালো পাথরে খোদাই করা তার কমনীয় মুখখানা ভুলতে পারিনি কখনও।

মন্দাকিনী যখন শ্রেয়সীর কাহিনী শোনাত তখন মনে মনে অস্থির হয়ে উঠতাম। তবুও ভাবতাম, মরণ তাকে শান্তি দিয়েছে, এটাই যা সান্ত্বনা।

সব কাহিনীর একটা উপসংহার থাকে। পাঠ্য পুস্তকে পরিশিষ্ট থাকে। শ্রেয়সী সমাচারের একটা উপসংহার ছিল, সেটা বলেই যবনিকাপাত করব।

প্রায় চার মাস পরে রাতের খাওয়া মিটিয়ে মন্দাকিনী আমার পাশে বসেই বলল, ঘুমিয়েছ কি? আজকের ডাকে বড়খোকা বাবলুর চিঠি এসেছে। এই নাও, পড়।

তুমি তো পড়েছ। আর পড়তে হবে না। তোমার কাছেই সব শুনব।

বাবলু আসছে, মানে বউ-ছেলে নিয়ে আসবে।

সুসংবাদ।

আরেকটি সুসংবাদ আছে, তবে তাও সংক্ষিপ্ত।

দূরদর্শনে সংক্ষিপ্ত সংবাদ শুনে থাকি। আমার বাড়ির দূরদর্শনে তুমি সংক্ষিপ্ত সংবাদ পাঠক। তাড়াতাড়ি সংবাদটা শোনাও। ঘুম পেয়েছে।

যা বলব তাতে ঘুম ছুটে যাবে। যতীনের সংবাদ কিছু জান ?

জানার দরকার কখনও হয়নি। ওটা তোমার এক্তিয়ারে। ওই বদমাইশটার নাম শুনলেই গা পিত্তি জলে যায়।

তবুও শোন। যতীন আবার বিয়ে করছে।

আরেকটা হতভাগিনীর কথা বলবে তো ? দরকার নেই। আমি কিন্তু আশ্চর্য হইনি।

আশ্চর্য হবার কি আছে। তোমাদের ইংরেজ মন্ত্রী আশী বছর বয়সে বিয়ে করেছিল। যতীন এখনও চাকরি করছে। অর্থাৎ তার বয়স আটান্ন এখনও হয়নি। এখনও আশা ভরসা পোষণ করে। এই তো সেদিন একজন মেমসাহেব তার বাহান্ন বছর বয়সে বিয়ে করতে চেয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল খবরের কাগজে। তবে পাত্রের বয়স ষাট বছর হওয়া চাই। বাহান্ন বছরের যুবতীর আরও দাবি ছিল, ষাট বছরের যুবক অবশ্যই অবসরপ্রাপ্ত কোন সামরিক অফিসার হলেই ভাল হয়।

কিন্তু…

কিন্তু নেই। যতীনের পক্ষে সবই সম্ভব।

সেদিন যতীনকে দেখলাম শ্রেয়সীর জন্য হাউ হাউ করে কাঁদছে। আর তার চিতার আগুন ঠাণ্ডা না হতেই আবার বিয়ের পিঁড়িতে বসেছে। একেই বোধহয় বলে ভবিতব্য। তার ঘরভর্তি ছেলে মেয়ে নাতি নাতনী ছেলের বউ জামাই অথচ !

মন্দাকিনী বললেন, তোমাকে বলেছিলাম ওর মুখ দেখাও পাপ। বুঝলে তো। সারা জীবন শ্রেয়সীকে যন্ত্রণা দিয়েছে। ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করেছে। প্রত্যেক-কেই কমবেশি বিপথে নামার সুযোগ করে দিয়েছে। অথচ দিগম্বর উকিলের সম্পদ তাদের কোন অভাব সহ্য করতে দেয়নি। শ্রেয়সী ভুল করেছিল ঠিকই, ও বয়সে ওটা অস্বাভাবিক নয়। অল্প বয়সে বিচারবুদ্ধি পোক্ত হয় না। ভুল করাটা সম্ভব। কিন্তু দিগম্বর উকিল কোন অবিচার করেনি। একখানা বাড়ি, নগদ টাকা, প্রচুর অলঙ্কার দিয়ে গিয়েছিল শ্রেয়সীকে। এগুলোর সদ্ব্যবহার করলে শ্রেয়সী ছেলেমেয়েদের বড়

করতে পারত। শ্রেয়সী যা চেয়েছিল তা তো যতীন চায়নি। যতীন শ্রেয়সীকে নিঃস্ব করার চেষ্টাতেই ছিল। বাড়িটা নিজের নাম করে নিতে যতীন বহুবার চেষ্টা করেছে। সফল হয়নি। কিন্তু এরপর কি!

মন্দাকিনীর মনে যে প্রশ্ন জেগেছে তার উত্তর খুঁজতে দেরি করতে হয়নি।

বাড়ি থেকে বেরবার জন্য প্রস্তুত হয়েছি এমন সময় কে যেন আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। তাকিয়ে দেখি যতীন। সঙ্গে একজন মধ্যবয়সী মহিলা। যতীন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, দাদাবাবুকে প্রণাম কর মণিকা। আমাদের আপনজন বলতে এঁরাই। শ্রেয়কে খুবই ভালবাসতেন।

মণিকার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। বয়েসের ছাপ পড়েছে মুখে, আনুমানিক বয়স চল্লিশের উর্ধ্বে। বেশ স্বাস্থ্যবতী, উচ্চতায় প্রায় যতীনের মাথার সমান।

কোন কথা নেই। যতীন চোখ ডলতে ডলতে বলল, ছেলেমেয়েরা কেউই আমার দিকে তাকায় না, শ্রেয় মরতেই ওরা আমার প্রতি বিরূপ হয়ে পড়েছে। আমি যেন ওদের মহাশত্রু, দু বেলা দু মুঠো ভাত ফুটিয়ে দিতেও কষ্ট। ছেলের বউ তো লেখাপড়া জানা মেয়ে। তারও দেখলাম বিবেক বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। অমর আলাদা হাঁড়ি করেছে। আমার ঘাড়ে পড়েছে অমিয়া আর তার ছেলে, সঙ্গে আছে অনিলা আর অমল। এরা তো আমাকে দেখলেই খেপে ওঠে। নিজের লোক না হলে বাঁচি কি করে! বয়স তো বাড়ছে। আর দু বছর পর অবসর নেব এখন তবুও কিছু করছে। তখন আর কেউ আমাকে মানুষ বলেই মনে করবে না।

বললাম, তাই বিয়ে করেছ।

যতীন মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, উপায় কি বলুন। আমার পয়সায় খাবে অথচ আমাকে খেতে দেবে না। তাতো হয় না।

যতীনকে বাধা দিয়ে বললাম, তোমার দিদির সঙ্গে দেখা করেছ? করনি। যাও মণিকাকে সঙ্গে করে তার সঙ্গে দেখা করে এস।

যতীন ও মণিকা দুজনে রান্নাঘরের দিকে যেতেই আমার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। কি যেন এক দুঃস্বপ্নের রাজ্য থেকে আমি জেগে উঠলাম।

যতীন ডাকল, দিদি।

মন্দাকিনী ফিরে তাকিয়ে বলল, কে? যতীন! বস।

যতীন কিছু বলার চেষ্টা করতেই মন্দাকিনী বাধা দিয়ে বলল, সব শুনেছি। আর কিছু নতুন বলতে হবে না। তবে বড্ডই তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে। একটা বছর পার করে বিয়েটা করলে ভাল হত।

মনিকাকে কাছে ডেকে নিয়ে যতীনকে আমার ঘরে বসার নির্দেশ দিয়ে মন্দাকিনী বেশ জাঁকিয়ে গল্প করতে থাকে মনিকার সঙ্গে। তার গলায় কোন ক্ষোভের অথবা বিরক্তির শব্দও নেই। কি ভাবে পেছনের সব কিছু চাপা দিয়ে ভদ্রতার মুখোস পরতে হয় সে বিষয়ে মন্দাকিনীকে অদ্বিতীয়া বলা যায়।

যতীন এসে বসল আমার সামনে চেয়ারে। তার সঙ্গে কথা না বলাটা অভদ্রতা অথচ বলবার মত কথা খুঁজে না পেয়ে বললাম, দেখা হল দিদির সঙ্গে ?

হ্যাঁ। আমাকে আপনার ঘরে বসতে বলে মণিকার সঙ্গে দিদি কথা বলছেন।

যতীন টেবিলের ওপর থেকে খবরের কাগজ টেনে নিয়ে পত্রিকার পাতা উল্টোতে থাকে। আমিও চুপ করে বসে থাকি। দুজনে কথা না-বলার রেস দিচ্ছি। এমন সময় মণিকাকে সঙ্গে করে মন্দাকিনী ঢুকলেন ঘরে। মণিকার হাতে খাবার আর চায়ের পাত্র। মন্দাকিনীর মুখের চেহারা দেখে ভয় পেলাম। যদি কোন রকমে বিস্ফোরণ ঘটে তা হলে আর রক্ষে নেই।

যতীন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আবার চা কেন ?

আহা নতুন বউ নিয়ে এসেছে, একটু মুখমিষ্টি করে যাও। এরপর এলে তো আর এত আপ্যায়ন নাও পেতে পার।

আমি কি গুরুতর অন্যায় কিছু করেছি দিদি ?

জানি না। সেটা ভবিষ্যতে জানা যাবে। আমাদের দেশে পুরুষরা কোন অন্যায় কাজ তো করে না, মেয়েরাই সব সময় অন্যায় কাজ করে। আর ন্যায় অন্যায় বিচার করে উত্তরপুরুষ।

যতীনের মুখ শুকিয়ে গেল।

তোমরা কথা বল, আমি রান্নাঘরটা সামলে আসি।

মন্দাকিনী চলে যেতেই আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার বাপের বাড়ি কোথায় মণিকা ?

আগে ছিল যশোর। এখন টালিগঞ্জে।

বাবা-মা বেঁচে আছেন ?

না। একটা ভাই ছাড়া আর কেউ নেই। এতদিন ভাই আমার কাছেই ছিল। গতবছর তার বউ ছেলে মেয়ে নিয়ে ঢাকুরিয়ার বাসায় গেছে। এতদিন ছিল নেহাৎ দায়ে পড়ে। ননদের অফিসের ভাত দেওয়াটা আজকাল ভাইয়ের বউরা মেনে নেয় না।

তুমি বুঝি চাকরি কর ?

হ্যাঁ। সরকারী চাকরি করি। কিন্তু বদলীর চাকরি। তবে বিশ বছর কলকাতার বাইরে যেতে হয় নি।

ভাল। যতীনও তো সরকারী চাকরি করে। অবসর নেবার সময় হয়ে এসেছে। স্বামী-স্ত্রী সরকারী চাকুরে হলে বদলিটা সহজে করে না। দুজনকে একজায়গাতেই রাখতে চেষ্টা করে।

সবই কপাল।

সেদিন মণিকা আর যতীন ফিরে গেল। অনেক দিন তাদের কোন সাড়াশব্দ পাইনি।

অনিমা এসেছিল। ফোঁপাতে ফোঁপাতে মন্দাকিনীকে বলল, জান পিসিমা বাবার কাণ্ড। মায়ের ঘরে অমল আর অনিলা শুতো। সেখানেই ছিল মায়ের এনলার্জ করা ফটো। মণিকামাসীর হুকুমে বাবা অমল আর অনিলাকে ঘরছাড়া করেছে। মায়ের ফটোও ঘরছাড়া হয়েছে।

মন্দাকিনী কোন মন্তব্য না করে চুপ করে শুনছিল।

অনিমা আবার বলল, মাসী মানে মণিকা-মা সবাইকে শাসন করতে চায়।

তবুও মন্দাকিনী কোন কথা বলল না।

অনিমা বলল, তুমি একটু বুঝিয়ে বল বাবাকে। এরপর বাড়িতে আগুন জ্বলবে।

আচ্ছা। বলে মন্দাকিনী বললেন, তোর স্বামী কেমন আছে? ছেলে?

সবাই ভাল আছে। তোমার জামাই ক্রাচ্ নিয়ে বাড়িতে কিছু কিছু নড়াচড়া করছে।

কয়েকমাস পরে অমর এসেছিল। বিনা ভূমিকায় বলল, মণিকামাসী পুরুলিয়াতে বদলি হয়েছে।

খবরটা শুনে কেউ আশ্চর্য হইনি। সরকারী চাকরিতে বদলি হওয়া নতুন কিছু নয়।

তারপরও তার আগের ঘটনা শুনেছিলাম মন্দাকিনীর কাছে।

মণিকার সঙ্গে যতীনের পরিচয় বহু বছরের। দুজনে দুজনকে বোধহয় ভালও বাসত। এই ভালবাসা কতটা অকৃত্রিম তা বলা কঠিন। পেশাগত ভাবে মণিকার কাজ করতে হত পুরুষদের সঙ্গে। এই পুরুষদের অনেকেই মণিকার সঙ্গলাভ করলেও মণিকা অতি সতর্কতার সঙ্গে তাদের সঙ্গে চলাফেরা করত। এদের মধ্যে একজনকেও ঘর বাঁধার উপযুক্ত মনে করেনি মণিকা। যতীনও এই রকমই সঙ্গী তার, বহু দিনের পরিচয়ে একটু বেশি ঘনিষ্ঠ। মণিকার বাড়িতে যতীনের গতায়াত

মোটেই সুচক্ষে দেখত না তার ভাইয়ের স্ত্রী। তার আশঙ্কা ছিল তার ছেলে-মেয়েরা বড় হলে বিপক্ষে যেতে পারে। তাই তাগাদা দিয়ে ঢাকুরিয়া গিয়ে বাসা করেছে।

মণিকা বুঝেছিল তার আশেপাশের অনুগৃহীত জনরা তাকে মোটেই ভালবাসেনি কখনও, তারা নারীসঙ্গ লাভের আশায় আসে। এমন কি তাদের কেউ তাকে শ্রদ্ধা করে না, তাদের চাটুবাক্য এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিমিত্ত। মণিকা আর যতীনের সম্পর্ক ভাল ভাবেই জানত শ্রেয়সী। প্রথম প্রথম অনুযোগ করত তাতে কোন ফল না হওয়াতে চুপ করে গিয়েছিল। যেদিন শ্রেয়সী জানতে পারল তার গয়নার কিছুটা অংশ মণিকার গায়ে উঠেছে তখন আর স্থির থাকতে পারেনি। এ নিয়ে বহুবার বাদবিসম্বাদ হয়েছে, শ্রেয়সীকে দৈহিক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে।

ঘটনাটা শ্রেয়সী জীবিতকালেই মন্দাকিনীকে বলেছিল।

মন্দাকিনী যতীনকে ভাবে-ভঙ্গীতে অপ্রত্যক্ষভাবে শ্রেয়সীর জীবিতকালেই জানিয়েছিল, যতীন কোন উত্তর দেয়নি, স্বীকারও করেনি। অস্বীকারও করেনি।

মণিকা ও যতীনের সুযোগ এল শ্রেয়সীর মৃত্যুর পর।

মাথায় সিঁদুরের ছোপ হল একটা লাইসেন্স যেটা অপব্যবহার করার সুযোগ অনেকেই নিয়ে থাকে, হয়ত মণিকা এই সুযোগ নেবার অপেক্ষায় ছিল। তার চেয়ে বড় কথা হল, শ্রেয়সীর অর্থসম্পদ যেমন করেই হোক হাতিয়ে নেওয়া।

নৈকট্য মানুষকে চেনার সুযোগ দেয়। পুরুষ ও নারীর সম্পর্ক কতটা মধুর অথবা তিক্ত তখনই জানা যায় যখন তারা স্বামী-স্ত্রী-রূপে সম-স্বার্থের অংশীদার হয়। ঘনিষ্ঠতা একজনের স্বভাবচরিত্র অপরের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যা কখনও মধুর, কখনও তিক্ত, কখনও অম্লমধুর মনে হয়। যতীন মণিকাকে দু দিক থেকে চিন্তা করেছে, প্রথমত মণিকাকে বিয়ে করলেও তার ভরণপোষণের ব্যয়ভার নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না, দ্বিতীয়ত তার শেষজীবনের অবলম্বন হবে। আবার মণিকা চিন্তা করেছিল, প্রৌঢ় এই ব্যক্তিটিকে কব্জায় রাখতে পারলে তার উচ্ছৃঙ্খল জীবনের কলঙ্ক ঢাকা পড়বে; দ্বিতীয়ত, তার কোন সন্তান হবার সম্ভাবনা না থাকলেও তার সতীনের সম্পদ হাতিয়ে নিতে পারলে তার শেষ জীবন নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হবে।

শ্রেয়সীর গয়নার কিছুটা হস্তগত করলেও অনিলা ও অনিমা তাকে বাধা দিতে থাকে বার বার।

সবচেয়ে অসুবিধা সৃষ্টি করেছিল যতীন স্বয়ং।

মণিকা বার বার চাপ সৃষ্টি করছিল শ্রেয়সীর বাড়িটা তার নামে লিখে দেবার।

যতীনের মনেও সন্দেহ জেগেছিল, সে চিন্তা করেছে বাড়িটা হাতছাড়া হলে তার কিছুই থাকবে না, আর শ্রেয়সীর ইচ্ছানুসারে বাড়িটা পাবে তার দুই ছেলে অমর আর অমল। ছেলেদের বঞ্চিত করে বিমাতাকে বাড়িটা দেবার মত মনোভাব ছিল না যতীনের। বার বার বলেও যখন যতীনকে রাজী করাতে পারল না তখনই দেখা দিল দ্বন্দ্ব।

মণিকা অনেক ঘাট ঘুরে একটি ঘাটে নৌকো বেঁধেছে বেশ কিছু প্রাপ্তির আশায়। সে কোনমতেই বঞ্চিত হতে রাজি নয়। সর্বতোভাবে চেষ্টা করে যখন সে বিফল হল তখন সে ভেবে দেখল যতীনের মনে শূন্যতা সৃষ্টি করতে পারলেই কার্যসিদ্ধি হতে পারে। ছটি সন্তানের প্রৌঢ় বাবাকে বিয়ে করেছিল খেয়ালের বশে নয় স্বার্থসিদ্ধির আশায়, আশাহত মণিকা যতীনকে নিজের বশে আনতে যোগাযোগ করে পুরুলিয়াতে বদলি নিল। আশা করেছিল, যতীন তার কাছে যাবে, থাকবে, তখন তাকে দিয়ে কার্য উদ্ধার করবে।

মণিকা চলে গেছে পুরুলিয়াতে।

যতীনের ছেলেমেয়েরাও আর আসে না।

যতীন হয়ত শহরেই আছে, অথবা পুরুলিয়াতে মণিকার সঙ্গে ঘর করছে। কোন খবরই আমরা জানি না। জানার দরকারও কখনও হয়নি।

অমিয়া তার ছেলেকে নিয়ে সকালবেলায় স্কুলে যায়। পথে অনেক পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হয়। তারাই কখনও কখনও যতীনের বাড়ির খবর মন্দাকিনীকে শোনায়। মন্দাকিনী শোনে, কোন আগ্রহ দেখায় না। আমাকে মাঝে মাঝে তাদের কথা বলে বিশেষ অবহেলার সঙ্গে।

অনিমা সেদিন এসে বলল, বাবা হঠাৎ বাতের ব্যথায় পঙ্গু হয়ে গেছে। এবার অবসর নেবে।

মন্দাকিনী যেন চিন্তিত হলেন। তখনও অনিলার বিয়ে হয়নি। অমল কাজ খুঁজে বেরিয়ে কোন কাজ পায়নি। একমাত্র ভরসা শ্রেয়সীর বাড়িভাড়া আর পেনসনের টাকা। অমর আর সায়নী অবশ্য সংসার দেখছে। তাদের বড় বোঝা অমিয়া আর তার ছেলে।

তোদের মণিকামাসীকে খবর দিসনি ?

মণিকামাসী,—বলেই চুপ করে গেল অনিমা। পরে বলল, প্রায় দু বছর হল তার কোন চিঠিই আমরা পাইনি।

তোরা কোন খবর নিসনি ? সে বেঁচে আছে কি মরে গেছে তাও তো জানা

দরকার।

উনি মরবার মত লোক নন। বাবার ভীমরতি ধরেছিল, নইলে অমন লোককে কেউ ঘরে ঠাঁই দেয়। এ যেন খাল কেটে কুমীর ডেকে আনা। বাবা এখন বুঝছে।

তোরা সবাই ভাল আছিস তো?

মোটামুটি। আপনারা তো আমাদের বাড়িতে একবারও যান না।

খেদের সঙ্গে মন্দাকিনী বলেছিল, শ্রেয়সী মরার পর আর কোন আকর্ষণ নেই রে। তোর বাবার সঙ্গে দেখা হবে এই ভয়েই যাই না। মেজাজ ঠিক রাখতে না পারলে অযথা কুকথা বলে ফেলব, সেটা কি ভাল!

আপনাকে একটা কথা বলতে এসেছিলাম।

কি কথা?

বাবা তো নড়তে চড়তে পারছে না। সেজন্য আপনাকে আর পিসেমশাইকে একবার আমাদের বাড়িতে যেতে বলেছে, বিশেষ দরকার।

মন্দাকিনী এই আমন্ত্রণে উৎসাহ বোধ করেনি বরং বেশ কৌতুক অনুভব করেছিল। এতক্ষণ আমি দুজনের কথাবার্তা শুনছিলাম। এবার নজর দিলাম মন্দাকিনীর দিকে এই আমন্ত্রণের প্রতিক্রিয়া জানতে।

মন্দাকিনী হ্যাঁ-না কিছুই না বলে অনিমাকে বলল, তুই বস, আমি আসছি।

অনিমা খুব বোকা নয়। সে বুঝেছিল মন্দাকিনী এই আমন্ত্রণ গ্রহণ নাও করতে পারে সে জন্য বার বার আমার দিকে তাকাচ্ছিল। আমি এই গম্ভীর অবস্থাকে সহজ করে তুলতে বললাম, তুমি যাও, আমি তোমার পিসিমার সঙ্গে কথা বলে তাকে রাজি করে নিয়ে যাব।

অনিমা যাবার কোন চেষ্টাই করল না। ইতিমধ্যে মন্দাকিনী ফিরে এসে বলল, তুই বাড়ি যা অনিমা, আমরা বিকেলে যাব।

বাবা কিন্তু এখনই যেতে বলেছে।

বাড়ির কাজকর্ম শেষ না করে কেমন করে যাই। আমাদেরও তো বয়স হয়েছে। যেতে বললেই তো চলতে পারি না। তুই যা অনিমা, আমরা ঠিক যাব।

তা হলে আমাকে বসে থাকতে হবে। বাবা বলেছে, তোর পিসিমা আর পিসেমশায়কে সঙ্গে করে নিয়ে আসবি। একা ফিরে গেলে বাবা খুব রাগ করবে।

মন্দাকিনী আমার দিকে তাকিয়ে বলল, কি করব বল তো?

বললাম, যেতে হবে। খুব দরকার না হলে যতীন এভাবে তাগাদা দিত না। নাও কাপড়জামা বদলে নাও। আমিও প্রস্তুত হচ্ছি।

অনিমার সঙ্গে গিয়ে উঠলাম শ্রেয়সীর শোবার ঘরে। মেঝেতে মাদুর পাতা, তার ওপর ওয়াড়বিহীন বালিশে মাথা দিয়ে যতীন তখন শুয়ে ছিল। যতীনের মাথার কাছে শ্রেয়সীর সেই এনলার্জমেণ্টটা যেটা আমরা শ্রেয়সীর শ্রাদ্ধের দিন দেখে-ছিলাম। ফ্যানটা আস্তে আস্তে ঘুরছে। পায়ের কাছে একটা পিকদানি। আমাদের দেখেই যতীন উঠে বসার চেষ্টা করছিল। অনিমা ছুটে গিয়ে তাকে বসতে সাহায্য করল।

মন্দাকিনী যতীনের পাশে বসে জিজ্ঞাসা করল, এমন কি দরকার যে ডেকে পাঠিয়েছ। তোমার মেয়ে তো ঘোড়ায় জিন দিয়ে বসে ছিল, সুযোগ খুঁজছিল আমাদের নিয়ে ছুটতে।

অনেক কাজের জন্য দিদি। তার মধ্যে যে কাজটা বড় সেটাই আগে করতে হবে। দাদাবাবু আমার পাশে বসুন। পা দুটো এগিয়ে দিন। পায়ের ধুলোয় মাথায় দিন। দিদি আর আপনার পায়ের ধুলো মাথায় নেব বলেই ডেকেছি। আগে মাথায় ধুলো দিন তারপর অন্য কথা।

আমি ভাবলাম, এটাও বোধহয় যতীনের একটা অভিনয়। কিন্তু তার চেহারা দেখে মনে হল, না, এটা তার অভিনয় নয়। যতীন তার হাতখানা বাড়িয়ে আমাদের পায়ের ধুলো মাথায় নিতে নিতে বলল, অনেক পাপ করেছি দাদাবাবু, তার শাস্তি-ভোগ করছি। আমারও দিন শেষ হয়ে এসেছে। আপনাদের পায়ের ধুলো মাথায় নিলাম এবার যদি পাপ কিছু লঘু হয়।

মন্দাকিনী বলল, এটা তুমি বিশ্বাস কর? স্বীকার করছ পাপ করেছ? অনু-শোচনায় দগ্ধে দগ্ধে মরছ, এই তো পাপের শাস্তি। এটাই যথেষ্ট। তবে বড়ই দেরি করে ফেলেছ যতীন। এই পাপবোধ যদি শ্রেয়সীর জীবমান কালে তোমার মনে জাগত তা হলে তোমার সংসার সোনার সংসার হত।

যতীনের চোখ দুটো ছলছল করে উঠল।

হতাশভাবে যতীন বলল, এর কি কোন প্রায়শ্চিত্ত নেই।

ওসব শাস্ত্রকাররা বলতে পারে। আমি বিশ্বাস করি, তুমি যা করবে তার ফল তোমাকেই পেতে হবে। এটাই প্রায়শ্চিত্ত। মণিকার খবর কি? তাকে তো দেখলাম না। সে কোথায়? এমন সময় মণিকার উচিত তোমার কাছে

থাকা।

সে আর আসবে না দিদি। তার দরকার ছিল মাথার সিঁদুর দিয়ে সতীসাধ্বী হওয়া। তা হয়েছে। এরপর যে কাজ তার ছিল তা পূরণ করা সম্ভব হয়নি, তাই সে চলে গেছে, আর সে আসবে না। তার জীবনে আমার তো প্রয়োজন নেই, ছিলও না। সে আর আসবে না, গত দু বছর তার সঙ্গে কোন যোগাযোগও নেই।

আমি বললাম, ঠিক বুঝলাম না তোমার কথা।

বোঝবার কিছু নেই। মণিকা আমার জীবনে ছিল একটা কালান্তক যন্ত্রণা। সেই যন্ত্রণা থেকে রেহাই পেয়েছি। বলতে পারি সে স্বেচ্ছায় আমাকে রেহাই দিয়েছে। আমি ওর কথা ভাবি না। আমি আপনাদের ডেকেছি অনিলার জন্য। মেয়েটা লেখাপড়া শিখেছে, কাজকর্মও জানে। ভেবেছিলাম, ওর বিয়ে দিলেই আমার মুক্তি। আমার দেহের যা অবস্থা তাতে ভরসা পাচ্ছি না। তাই আপনাদের ডেকেছি, আমার আর শ্রেয়র যা কিছু আছে তা অনিলার জন্য রেখে যাব। দেখে-শুনে ভাল একটা পাত্রের সঙ্গে যাতে বিয়ে হয় তা দেখবেন।

আমি বললাম, তোমার ছেলেরা লায়েক হয়েছে, কাজকর্ম করছে, তারাই এটা করতে পারবে।

সবাই আমাকে পরিত্যাগ করেছে, করেনি অনিলা। শ্রেয়সীর শেষ চিহ্ন। ওর মত মেয়ের জন্যই মরতে পারছি না দাদাবাবু।

মন্দাকিনী বলল, আমরা অবশ্যই চেষ্টা করব। সব সময় তো মনে করলেই সে কাজ হয় না।

যতীন কাঁদো-কাঁদো ভাবে বলল, আমার অনেক অপরাধ। অনেক পাপ।

পুরনো কথা মনে করে কেন কষ্ট পাচ্ছ যতীন। তুমি যা করেছ তা বিচার করার কর্তা আমরা নই। মানুষ তার সমাজে বাস করছে আদিম কাল থেকে। সমাজ বিচার করছে। বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলছে। সেখানেই তোমার বিচার হবে। সেখানেই তোমার অতীত, তোমার সন্তান একটা অবক্ষয়িত সমাজের নমুনা। এই অবক্ষয়ের হাত থেকে বাঁচতে হলে পরিবেশকে সুস্থ করতে হলে যে মানসিকতার প্রয়োজন সেই মানসিকতা গড়ে তুলবে উত্তরপুরুষ, তখনই তোমার বিচার হবে, তোমাকে দণ্ড ভোগ করতে হবে।

যতীন কাঁদছিল একটা শিশুর মত।

বোধহয় প্রেয়সী সমাচারের পরিশিষ্ট এখানেই শেষ। উপসংহার এখনও স্থির

হয়নি। বিকৃত মানসিকতা, অবক্ষয়িত সমাজের ব্যাভিচার সব কিছু মিলে মিশে যে পাপের আবর্ত সৃষ্টি করেছে, সেই পাপের উৎকট দৃষ্টান্ত হল প্রেয়সী সমাচার। এর কাহিনীর উপসংহার লেখবার অবসর এখনও পাইনি।

যারা এই বিকারগ্রস্ত পরিবারের কাহিনী পড়বার সুযোগ পাবেন তাঁরা যেন এই হতভাগ্য পরিবারের জন্য এক বিন্দু অশ্রুপাত করেন এবং নতুন সমাজ গড়ে তোলার নির্দেশ দেন।